দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ ● মূল্য ৬·০০

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি

ধর্মবিতর্কের আড়ালে আসল সত্য কি ?

রাজীব গান্ধীর সরকার কি ১৯৮৮ তে টিকবে ?

● জমি বাড়ি নিয়ে কলকাতায় চাঞ্চল্যকর নকল মামলা

● নিরাশ্রিতা মেয়েরা কোথায় যাবে ?

● রাজু ভাটনগর : এক কুখ্যাত অপরাধীর জীবনান্ত

ওয়ান ওয়াল থিয়েটার : টালিগঞ্জে নতুন ক্রেজ

কলকাতায় রুশ উৎসব

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আপনার সন্তানকে
বুদ্ধিমান করে তুলুন
ওকে দিন
চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক
(ছয় খণ্ডে)
সাফল্য আর জনপ্রিয়তার নতুন ধারা সৃষ্টিকারী এক অপরিহার্য শিক্ষামূলক সিরিজ
এই বই শিশুর মস্তিষ্কে টনিকের মতো কাজ করে
যে-মুহূর্তে একটি শিশু চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনে জাগতে থাকে কৌতূহল। তার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবী সম্পর্কে জমা হতে থাকে নানান বিস্ময়। তার মনে 'কীভাবে' আর 'কেন' — এই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করে। সে এসব প্রশ্নের উত্তর চায়, কিন্তু সহজে পায় না। সঠিক সময়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেলে তার জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। তার মন হয়ে ওঠে আরও তীক্ষ্ণধী; উপলব্ধি করার ক্ষমতাও বেড়ে ওঠে, তাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। অন্যদিকে, প্রশ্নগুলির উত্তর না পেলে তার বুদ্ধি ভোঁতা হতে শুরু করে। তখন সে বিষয়টি না বুঝেই মুখস্থ করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
এই সিরিজে যে-১০৫০টি 'কীভাবে' এবং 'কেন'-এর উত্তর দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি
■ জিভ কীভাবে স্বাদ জানান দেয়? ■ রামধনু তৈরি হয় কীভাবে? ■ কীভাবে আমরা ঘটনা মনে রাখি? ■ কী ক'রে আমরা চশমা পরে পরিষ্কার দেখতে পাই?
বৈশিষ্ট্য
■ ইতোমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে।
■ স্কুলের অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়।
■ প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র।
■ অভিজাত গ্রন্থাগারগুলির পছন্দসই।
■ সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক তাদের সমালোচনায় প্রশংসাপ্রাপ্ত।
PRICE:
Paperback Student Edition: Rs. 24/- each
Postage: Rs. 4/- each
Full Set Rs. 144/- Postage Free
Hard Bound Gift Edition: Rs. 30/- each
Postage: Rs. 5/- each
Full Set: Rs. 180/- Postage Free
৬ খণ্ডের একটি সেটে আছে—
১৩০০ বড়ো সাইজের পৃষ্ঠা
১১০০ ছবি
৫,০০,০০০ শব্দ
১০৫০-এরও বেশি 'কীভাবে' এবং 'কেন' আর
সেটটি ভরা আছে একটি
গিফট বক্সে
Also available in English.
Six Vols. Price same
"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স
3,00,00,000
তিন কোটিরও বেশি
পাঠকের পছন্দ
New Addition
LETTER
WRITING
মূল্য 28/-
ডাক মাশুল
5/- অতিরিক্ত
It's really a good book to learn spoken English —Kapil Dev
কনভেন্ট স্তরের 'শুদ্ধ ও অনর্গল ইংরাজী' শেখাবার এমন বই —যা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যাকে সমাজের সর্বস্তরের এবং সব ভাষাভাষি লোক আপন করে নিয়েছে।
101 সাইন্স গেমস
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
Price Rs. 15/- Postage Rs. 4/- each
101 সাইন্স গেমস
যখন শিশুরা বিজ্ঞানের সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলি শিখছে অন্যদিকে তারা সঙ্গে সঙ্গে এও শিখছে রকমারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার বিধি যেমন ব্যারোমিটার, বৈদ্যুতিক চুম্বক, হেক্টোগ্রাফ, বাষ্প চালিত টারবাইন, ইলেকট্রোস্কোপ ইত্যাদি।
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
একটা মজার ব্যাপার কোন পার্টিতে, জলসায়, ঘরোয়া জমায়েতে অথবা ভ্রমণকালে কেড়ে নেওয়ার জন্য নতুন মজাদার হাত সাফাই-এর খেলা দেখিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দাও।
বাংলা হিন্দী
লার্ণিং কোর্স
Price 24/- Postage Rs. 4/
AVAILABLE at leading bookshops. A.H. Wheeler's and Higginbothams Railway Book Stalls throughout India or if not available ask by V.P.P. from:
PUSTAK MAHAL
Khari Baoli, Delhi-110006
Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110002.
VAN/PM/17/87
AVAIL 10% OFF at our Stall in CALCUTTA BOOK FAIR from 27-1-88 to 7-2-88.
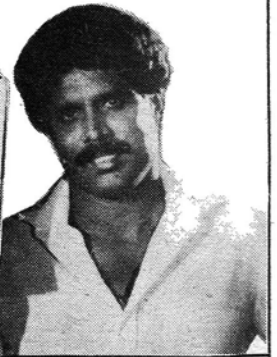
আলোকপাত

তৃতীয় বর্ষ ■ প্রথম সংখ্যা ■ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক: হাবিব আহসান
গুরুপ্রসাদ মহান্তি

সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
অঙ্গসজ্জা: অপূর্ব গোস্বামী
ভিসুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি

দিল্লি কার্যালয়:
কে·এল· তলোয়ার: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৯২৮৫
টেলেক্স: ০৩১৬১৭১৫ নিউজ ইন

বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮৯০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭ গ্রাম: মায়াকহানি
টেলেক্স: ০১১২৫৫৭ মায়া ইন

কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়
স্টিফেনস কোর্ট
ফল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯–৯০৩৫
টেলেক্স: ০২১৫১৭৩
ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক:
শুভাশিস মজুমদার

প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪২২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY for Dibrugarh, Silcher, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shillong, Kathmandu and Agartala 25 Paise·

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

খোঁজখবর পৃষ্ঠা ১৮

টালিগঞ্জ ক্লাব আর গলফ ক্লাবের জমি নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে জমি-বাড়ির মালিকানা বদলের স্বার্থে কিভাবে রুজু হয় নকল সব মামলা? কাদের ঘিরে আবর্তিত হয় আইনের এই খেলা? কিভাবে এর থেকে ফায়দা লোটেন অসাধু জমি-ব্যবসায়ীরা? এক চাঞ্চল্যকর রহস্যোন্মোচন।
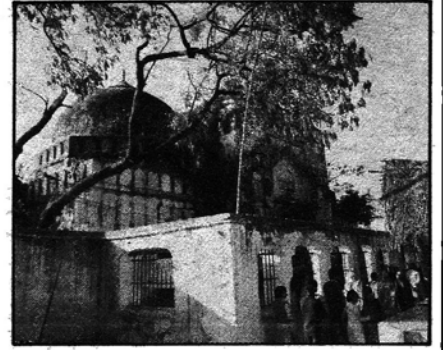
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ২৬

রাম জন্মভূমি এবং বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্ক এখন ধর্মীয় উন্মাদনায় পর্যবসিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির মৌলবাদিরা কিভাবে এর থেকে ফায়দা লুটতে চাইছেন? কেন বাবরি মসজিদের স্থাপত্যে মুসলিম ধর্মনিষিদ্ধ 'বরাহ'র মূর্তি স্থান পায়? রামের দেবত্বপ্রাপ্তির বয়স সম্পর্কিত সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের অভিমতই বা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিশ্লেষণের পাশাপাশি সরজমিন তদন্তরিপোর্ট।

সরজমিন পৃষ্ঠা ৫

রবীন্দ্রতীর্থ শান্তিনিকেতনে এখন জোর নকশালী হাওয়া। সি পি এম ঝাণ্ডাধারীদের মোকাবিলায় ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে মাওবাদী নকশালপন্থীরা। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রমহলের একাংশের এতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। স্থানীয় জনমানসেরই বা প্রতিক্রিয়া কি? নকশাল-সি পি এম রাজনীতির নেপথ্যপাট-বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে।

দেখতে দেখতে আমরা পেরিয়ে এলাম দুটি বছর। পাঠকদের সহানুভূতি আর শুভেচ্ছায় আমাদের এই দুটি বছরের অভিজ্ঞতার পাত্র ভরপুর। আমরা অভিভূত, ঋদ্ধও। বাংলার সংবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আমরা যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছিলাম, তাকে বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থানের রুচিশীল আর পরিণতমনস্ক পাঠককুল গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়। তাঁদের চাহিদা মেটাতে জীবন ও জগতের বৈচিত্র্য আর ঔত্যয়ের অনুপুঙ্খতাকে তাদের নিরলস পরিশ্রমে তুলে আনতে কসুর করেননি আমাদের প্রতিবেদকেরা। আলোকপাত করেছেন এযাবৎ অনালোকিত অনেক বিষয়-বৈচিত্র্যে।

এই বর্ষপূর্তি সংখ্যাটিতেও আমরা আমাদের পাঠকদের জন্য রেখেছি বৈচিত্র্যের আয়োজন। এরই মধ্যে, এই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি এক অনন্য সংযোজন। বর্তমান সময়ের এক জটিল ঐতিহাসিক গ্রন্থি বিমোচনের প্রয়াস করেছি আমি। রাম-জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের আড়ালের এযাবৎ অনালোকিত অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যের উন্মোচনে আমাকে ঘাঁটতে হয়েছে ইতিহাস আর পুরাতত্ত্বের এক বিস্তৃত অধ্যায়কে। সাম্প্রদায়িকতার যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এই ভারতব্যাপী চাঞ্চল্যের ইস্যুটিকে নিয়ে সেই ভ্রান্তিকে দূর করার প্রয়াসে আশা করি এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি অনেকটাই অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

জমি বাড়ি নিয়ে কলকাতার চাঞ্চল্যকর নকল মামলাগুলির এযাবৎ অজানা বিষয়ের ওপর কলম ধরেছেন সন্ধানী সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ থেকে আমাদের প্রতিবেদক এনেছেন একটি স্কুপনিউজ। আসাম বাংলার সীমান্তের শংকরদেব মন্দির ক্রমে হতে চলেছে উগ্রপন্থার কেন্দ্র।

প্রখ্যাত সাংবাদিক রঞ্জিত রায় আলোকপাত করেছেন একটি অমীমাংসিত সামাজিক সমস্যার ওপর। ধর্ষিতা সেইসব নিরপরাধ মেয়েরা, যাদের সমাজ দেয়না আশ্রয়, আর উদ্ধার–আশ্রমগুলি দেয়না নিরাপত্তা! এই মেয়েগুলি কোথায় যাবে? এ নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা বোধহয় হয়নি। আশা করি এই প্রতিবেদনটি সমাজসচেতন মানুষকে নতুন করে ভাবাবে।

রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে ১৯৮৮ সালটি কি বার্তা নিয়ে এসেছে? এই বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন আমাদের প্রতিনিধি। দক্ষিণী রাজনীতির নায়ক এম জি রামচন্দ্রনের মৃত্যুর পর তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখন জটিলতা। এম জি আর-এর ক্যারিসমা কিভাবে তামিল রাজনীতিকে এখন জড়িয়ে রেখেছে অমোঘ অনির্দেশ্যতায়, সে বিষয়ে পরিবেশিত আমাদের দক্ষিণী প্রতিবেদকের প্রতিবেদন।

আসামের রাজধানী পরিবর্তনের মত বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে আসামের জনতার প্রতিক্রিয়া আর বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটটিও উন্মোচিত হয়েছে এবার। উপজাতীয় উগ্রপন্থীদের মুহুর্মুহ আক্রমনের মুখে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার বাঙালিদের এক অংশও গড়ে তুলছেন পাল্টা বাঙালি সেনা। ত্রিপুরার রাজনীতির এই নতুন মোড়টির দিকেও আমরা করেছি অঙ্গুলিনির্দেশ।

টালিগঞ্জের সন্ত্রাস, হ্যাঁ যাকে বোধহয় সন্ত্রাসই বলা চলে–তা এই ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের ক্রমবর্ধমান প্রচলন। প্রতিষ্ঠিত সব নায়ক নায়িকারা কিসের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছেন এই নতুন নাট্য আঙ্গিকের দিকে! ভারতীয় ক্রিকেটদলে প্রথম আবির্ভাবেই সাড়া ফেলেছেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি, আর্শাদ আয়ুব, রমনের মত খেলোয়াড়েরা। এছাড়াও রয়েছেন অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেট অঙ্গনে তারুণ্যের সম্ভাবনার ওপরে আমরা করেছি অনুপুঙ্খ আলোকপাত।

আমাদের জয়যাত্রা এখন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। আপনাদেরই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি নতুনতর ও উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার দিকে।

আলোক মিত্র

দেবেন মাত্র টা.50 প্রতিমাসে 30. বছর বয়স থেকে, এবং পাবেন প্রতিমাসে টা.920* হিসাবে আজীবন বার্ষিক বৃত্তি 60. বছর বয়স থেকে, সেইসঙ্গে টা. 1,10,098* আপনার পরিবারের জন্য!

জীবন ধারা

এল আই সি'র নতুন ডেফার্ড অ্যানিউটি প্ল্যান

এবার এক অবিশ্বাস্য লাভজনক প্রকল্প যা আপনাকে সারাজীবনের স্থায়ী নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছে। রোজগার করার দিনগুলিতে নামে মাত্র টাকার কিস্তি জমা দিয়ে গেলে মোটা টাকা ফেরত পাবেন—12 মাসের চেক একই সঙ্গে পাবেন—আপনার অবসর গ্রহণের পরের বছরগুলিতে নিয়মিত আয় হিসাবে। এইসঙ্গে আপনার পরিবারের জন্য আরো পাবেন গ্রস ইন্সিওরেন্স ভ্যালু এলিমেণ্ট (গিভ), বোনাস এর সঙ্গে।

বার্ষিক বৃত্তি পেতে আরম্ভ করার আগেই মৃত্যু ঘটলে, আপনার দেওয়া প্রিমিয়াম ফেরত দেওয়া হবে। (যদি আপনি 3 বছর বা তার বেশীকাল কিস্তি দিয়ে থাকেন, তবে তার সুদও দেওয়া হবে।)

20 থেকে 55 বছর বয়স অবধি যে কেউ এল আই সির জীবনধারা প্রকল্পে যোগ দিতে পারেন। আকর্ষণীয় এই সুযোগের আরো বিশদ বিবরণের জন্য আপনার স্থানীয় এলআইসি ডিভিশনাল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বার্ষিক 1,200/- টাকার অবসরকালীন আয় যোজনা

নিকটতম বয়স (বছর)	স্থগিত সময় (বছর)	বার্ষিক প্রিমিয়াম (টাকা)	গিভ (টাকা)
25	30	65.20	11,964
25	35	38.90	11,958
30	25	110.70	11,964
30	30	65.20	11,958
35	20	193.80	11,964
35	25	110.60	11,958
40	15	355.90	11,964
40	20	193.70	11,958
45	10	724.40	11,964
45	15	355.80	11,958

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

জীবন বীমা করে নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় আসুন

* বোনাসের সাথে

daCunha/LIC/230/87/BN

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

শান্তিনিকেতনে নকশাল প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে!

১৯ নভেম্বর ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার। ঘড়িতে তখন সকাল প্রায় সাতটা। তখনও শীতের জড়তা আঁকড়ে আছে মুলুক গ্রামের ঘরে বাইরে। বীরভূমের মহকুমা শহর বোলপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মুলুক। সাত সকালে সেখানেই একটি জমায়েত। উদোক্তা গ্রামেরই সি পি এম নেতা সফিউর রহমান। জনতার প্রত্যেকেই রীতিমত সশস্ত্র। হাতে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম, বোমা এবং আরও সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। ঘটনাস্থল মুলুক বাস স্ট্যাণ্ডের নিকটবর্তী সি পি এমের অফিস প্রাঙ্গণ। হঠাৎ তারা পথ চলতি দু'জন নকশাল কর্মীকে আটক করে পার্টি অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর যায়। থানা কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেয় না। বলা হয়, আটক করেছে, মারধোর তো করেনি। ধীরে ধীরে

শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রাম মুলুকে ৪ জন নকশালপন্থীকে হত্যা করে সি পি এমের ঝাণ্ডাধারীরা, ফলে তার প্রতিবাদে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে নকশালরা ডাকলেন বন্ধ। বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু সমেত অধিকাংশ অধ্যাপক-ছাত্র বন্ধের সমর্থনে ক্লাস বর্জন করলেন। আরও তিন অধ্যাপককে নিয়ে প্রতিবাদ ময়দানে নামলেন অশোক রুদ্র। দুই মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক লড়াই-এর ফাঁকফোকরে নকশালরা কি শান্তিনিকেতনে পায়ের তলার মাটি পেয়ে গেল? নকশাল-সি পি এম রাজনীতির নেপথ্যপর্বের দিকে আলোকপাত।

নকশাল নিধনের প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মিছিল

বেলা বাড়ে। বাড়ে জমায়েতের লোক সংখ্যা। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আটক হওয়া এক ব্যক্তি কোনক্রমে পালিয়ে এসে আবার থানায় খবর দেয়। কিন্তু পুলিস তখনও যথারীতি নিষ্ক্রিয়। এদিকে সকাল ন'টা নাগাদ জমায়েতে প্রায় শ'তিনেক লোক জড়ো হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় অভিযান।

সফিউর রহমানের নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী আদর্শ পল্লীতে। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষই তখন মাঠের কাজে বাইরে। জিয়াউদ্দিন আর নির্মল ঘোষ নামে দু'জন নকশাল সমর্থক তাদের বাড়ির কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে। বিনা প্ররোচনায় মিছিলকারীরা তাদের সঙ্গে বচসা বাধায় একটি খাস জমি আর দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে। তারই মধ্যে অতর্কিত আক্রমণ। মিছিলকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মল ও জিয়াউদ্দিনের ওপর। নির্মলের বাবা সুধীর ঘোষ (৬৪) তখন বাড়িতেই ছিলেন। চারদিন
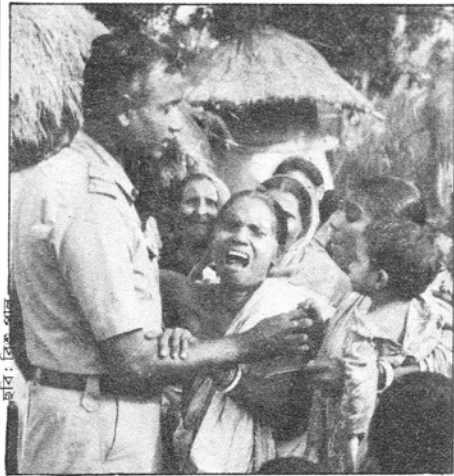
পুলিশ অফিসারের সামনে নিহত সুধীর ঘোষের স্ত্রী ও পুত্রবধূ

রোগভোগের পর সেদিনই তিনি একটু উঠে বসেছিলেন। ছেলেকে উদ্ধার করতে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন মিছিলের ওপর। কিন্তু সশস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে পিতা-পুত্র কেউই এঁটে উঠতে পারে না। দু'জনকেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী কালীতলার মাঠে–ভাঙা মন্দিরের পাশে। একই ভাবে সেখানে টেনে আনা হয় শেখ জিয়াউদ্দিন (৪০) এবং শেখ আবদুল মান্নানকে (২৬)। দাদাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে জিয়াউদ্দিনের দুই ভাই নূর আলি ও তৈয়ব আলি ছুটে যায় বাধা দিতে। তখন শুরু হয় তীরবর্ষণ। একটি তীর তৈয়ব আলির পেট ভেদ করে উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর ঠিক তখনই নূর আলির মাথায় পড়ে ধারালো টাঙ্গির কোপ। সেও আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি মাথায় নিয়েই আবদুল মান্নানের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন ছুটে যায় অকুস্থলে। সফিউর রহমানের পায়ে ধরে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়। কিন্তু তাকে ঝটকা দিয়ে ফেলে দেয় মিছিলের লোকেরা। সফিউর রহমানের বল্লমের ফলা ততক্ষণে মান্নানের গলায় বিঁধে গেছে। রক্তাক্ত মান্নানের মুখে রাবেয়া খাতুন পাশের খাদ থেকে এক আঁজলা জল এনে দিতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। স্ত্রীর চোখের সামনেই মান্নান খুন হয় পৈশাচিকভাবে।এবং এখানেই শেষ নয়। জিয়াউদ্দিনের বড় ছেলে খায়রুলের চোখের সামনেই সফিউর রহমান তার বাবার গলা কেটে নেন। বৃদ্ধ সুধীর ঘোষ তাঁর ছেলে নির্মলের চোখের সামনে খুন হন সফিউরের বল্লমের খোঁচায়। নির্মলও শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচে নি। মারাত্মক আহত অবস্থায় বোলপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯ নভেম্বরের অভিশপ্ত সকালে মুলুক গ্রামের রুক্ষ গেরুয়া মাটি লাল হয়ে উঠল চার চারটি মানুষের রক্তস্নানে। রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল তৈয়ব আলি, নূর আলি, শেখ আবু আর আবদুল হান্নান। তাদের সাথে তিনজন সি পি এম সমর্থককেও হাসপাতালে যেতে হল। আহতের মোট সংখ্যা ছয়। সফিউর রহমানকেও অবশ্য পার্শ্ববর্তী শিয়ান হাসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু ডাক্তাররা তার আঘাত গুরুতর নয় বলে সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ করে দেন। কিন্তু পরে আবার চাপ সৃষ্টি করে তাকে সিউড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বলে অভিযোগ।

নিহত চারজনই যুক্ত ছিলেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। এরা সকলেই নকশালপন্থী। সত্যনারায়ণ সিংহ গোষ্ঠীর সমর্থক। সম্প্রতি তারা সি পি এম ত্যাগ করে এই দলে যোগ দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ঝড় ওঠে মহকুমা শহর বোলপুরে। ফলে টনক নড়ে প্রশাসনের। খবর পেয়েই জেলা সদর সিউড়ি থেকে ছুটে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক কালীদাস চ্যাটার্জি। সঙ্গে পুলিস সুপার জয়দেব চক্রবর্তী। মহকুমা পুলিস অফিসার মিহির ভট্টাচার্যও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বেলা এগারটা নাগাদ বিরাট পুলিস বাহিনী গোটা মুলুক গ্রাম ছেয়ে ফেলে। শুরু হয় ধড়-পাকড়। একজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ ১০ জন সি পি এম সমর্থককে পুলিস গ্রেপ্তার করে। এফ আই আর করা হয় ৪০ জন সি পি এম সমর্থকের নামে। এরপর ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহগুলি পাঠান হয় সিউড়ি সদর হাসপাতালে। আশংকাজনকভাবে আহত দুই ব্যক্তিকেও সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। নতুন করে হাঙ্গামার আশংকায় গ্রামে বসে পুলিস পিকেট। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

নকশালদের অভিযোগ এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। আগের দিন রাতেই কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের গ্রামে আনা হয়। আউসগ্রাম থেকে দু'জন দাগী আসামী এসে আশ্রয় নেয় সি পি এম–এর লম্বু মামির ঘরে। গঙ্গারামপুরের তিনজন ছিল ওয়াহিদ শেখের বাড়িতে। রওশন শেখের বাড়িতে ছিল সুপুর ক্যাম্প থেকে আগত তিন সমাজবিরোধী, পরে তারা গ্রেপ্তারও হয়।

উত্তেজনা থাকলেও এরপর মুলুক গ্রামে আর কোন অঘটন ঘটে নি। কিন্তু তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বোলপুর শহরে। সেখানে নকশাল-পন্থীদের সব গোষ্ঠী এককাট্টা হয়ে আন্দোলনে নামে। নকশাল নেতা এবং বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শৈলেন মিত্র তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন: 'একেবারে বিনা প্ররোচনায় সি পি এম

বন্ধের দিনে বোলপুরে নকশালদের পিকেটিং

চারজন নকশালপন্থীকে খুন করে একটি পুকুর পাড়ে ফেলে দিয়েছিল। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তারা হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জেলায় নকশালপন্থীদের শক্ত সংগঠন ভাঙতে চায়। আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, পুলিস ব্যর্থ হলে আমরা নিজেরাই এর মোকাবিলা করতে সক্ষম–উই উইল ডিসাইড আওয়ার ওন কোর্স অব অ্যাকশন টু ফাইট দেম।'

বীরেন ঘোষ, প্রদীপ ব্যানার্জি, ধীরেশ গোস্বামী প্রমুখ নকশাল নেতারাও শৈলেনবাবুর সঙ্গে সরব হন। সংগঠিত হয় বিক্ষোভ মিছিল। পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষিত হয়। পরদিন (২০ নভেম্বর) শুক্রবার ডেডবডি ফিরে পেলে বোলপুর ও মুলুক গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরদিন ২১ নভেম্বর ডাক দেওয়া হয় ২৪ ঘন্টা বোলপুর বন্ধের।

ঘটনার পরদিন, অর্থাৎ ২০ নভেম্বর শুক্রবার। সকাল থেকেই বোলপুর শহর উত্তাল হয়ে ওঠে নকশালপন্থীদের পিকেটিংয়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তারা পথসভা করে। ছোট ছোট মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সি পি এম বিরোধী শ্লোগান দিয়ে। মিছিল হয় মুলুক গ্রামেও। অবশ্য পুলিস সজাগ থাকে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরদিন মুলুক গ্রামে পৌঁছলে একটি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ে অনেকেরই। তখন সকালবেলা। পুলিস অফিসারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদে ভেঙে পড়েন নিহত সুধীর ঘোষের স্ত্রী আশালতা দেবী। তাঁর বিধবা পুত্রবধূ ডলি ঘোষও একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্বামী ও শ্বশুরকে খুন করার কারণ জানতে চাইছে। দৃশ্যটি বড়ই করুণ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিস অফিসার-টিও বোধহয় নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন নি। মিনিট দুয়েক সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি কোনক্রমে সরে দাঁড়ালেন একটি গাছের আড়ালে।

বিরোধের সূত্রপাত একটি খাস জমির দখল নিয়ে। দক্ষিণ নারায়ণপুর মৌজায় সেই জমিটির দাগ নম্বর ৪১১। নকশালপন্থীদের অভিযোগ, নিজের দশ-বার বিঘা জমি থাকা সত্ত্বেও সি পি এম সমর্থক আবদুল হক সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ওই খাস জমিটি ভোগ করছেন। সুতরাং তাকে সেটি ছাড়তে হবে এবং পাট্টা দিতে হবে কোন ভূমিহীন চাষীকে। এই বচসাকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে আরেক দফা সংঘর্ষ হয়েছিল ২১ অক্টোবর, তাতে ১০জন আহত হয়। ৩ জন নকশাল, ৭ জন সি পি এম। অভিযোগ, আগের রাতেই সফিউর রহমান ও আখতারের নেতৃত্বে নকশালদের বাড়ি ঘর লুঠ করার হুমকি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তা থানায় জানিয়েও পুলিসের সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। পরদিন সকাল আটটায় একটি সশস্ত্র সি পি এম মিছিল নকশালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই ঘটনারই বদলা নিতে ১৯ নভেম্বর পাল্টা আক্রমণ বলে নকশাল নেতাদের অভিযোগ। মুলুক গ্রামটি আগে ছিল সি পি এম–এর শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু খাস জমি বিলিবন্টন এবং পঞ্চায়েতের নানা

নকশাল নেতা শৈলেন মিত্র

ছবি: বিশু পাল

নকশাল নেতা এবং বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শৈলেন মিত্র তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন: 'একেবারে বিনা প্ররোচনায় সি পি এম চারজন নকশালপন্থীকে খুন করে একটি পুকুর পাড়ে ফেলে দিয়েছিল। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তারা হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জেলায় নকশালপন্থীদের শক্ত সংগঠন ভাঙতে চায়।'
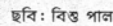
দুর্নীতি নিয়ে পার্টিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের আরেকটি বড় কারণ নাকি সি পি এম নেতা সফিউর রহমানের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ। তাঁর নাকি দুটি স্ত্রী। এছাড়াও আরও দু'জনকে রক্ষিতা হিসাবে রেখেছেন বলে অভিযোগ। সফিউর রহমানের এই বহু পল্লবিত পরিবারের ভরনপোষণ চালাতে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করা হত বলে নকশাল নেতা শৈলেন মিত্র আমাদের জানিয়েছেন। ফলে দলেরই কিছু লোক এই অনাচার মানতে পারছিল না। এসব নানা কারণে পার্টিতে ভাঙন ধরে। আর সেই ফাটল দিয়ে পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলে নকশালপন্থীরা। প্রতি মঙ্গলবার বিশিষ্ট নকশাল নেতারা গ্রামে আসতে শুরু করেন। চলে মিছিল, মিটিং, দেওয়াল লিখন। ধীরে ধীরে আদর্শপল্লী, কালীডাঙ্গা, ঘোষপাড়া ও জোলাপাড়ায় নকশালপন্থীদের মজবুত সংগঠন গড়ে ওঠে। শুরু হয় আন্দোলন। খাস জমি, বর্গা ও মজুরি নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধে। বলাবাহুল্য এসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সি পি এম ত্যাগী নির্মল ঘোষ, জিয়াউদ্দিন, আবদুল মান্নান প্রমুখ স্থানীয় নকশাল নেতারা।

এবং শুধু মুলুক গ্রামেই নয়, মাস দুয়েক আগে বোলপুর থানার বাহান্নরগ্রামে খাস জমি বিলি করতে গিয়ে নকশাল কর্মী ক্ষুদিরাম দাস (৪৮) খুন হয় সি পি এম–এর হাতে। ২৫ অক্টোবর নকশালদের একটি প্রতিবাদসভাও তারা পণ্ড করে এস ডি ও-কে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে। এর আগে ২২ জুন ইলমবাজার থানার হাঁসড়া গ্রামে পুলিসের সামনেই সি পি এম নকশালদের সভা ভাঙে। ২৫ মার্চ নকশাল নেতা শৈলেন মিত্র ও বীরেন ঘোষ আক্রান্ত হন। সুতরাং বেশ কিছু দিন ধরেই বোলপুর এলাকায় সি পি এম–এর সঙ্গে নকশালপন্থীদের শক্তি পরীক্ষা চলে আসছে। বহু চেষ্টা করেও সি পি এম বোলপুর পৌরসভা কব্জা করতে পারে নি। বামফ্রন্টেরই শরিক দল সি পি আই–এর সাথে হাত মিলিয়ে নকশালরাই সে ক্ষমতা ভোগ করছে।

১৯ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড সেই চাপা আগুনে ঘি নিক্ষেপের মত ঘটনা। তিনজন কর্মীর মৃত্যু হলেও রাজনৈতিক লড়াইয়ে নকশালপন্থীরাই আসল ফায়দা তুলে নিয়েছে। কারণ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পর সি পি এম কার্যত কোণঠাঁসা। ২০ নভেম্বর সকাল থেকেই বোলপুর হয়ে ওঠে মিছিলনগরী। চৌরাস্তার মোড়ে বিরাট অবরোধ তৈরি করে নকশালপন্থীরা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তারা পথসভা করে। বাসে উঠে যাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখেন নকশাল নেতা বীরেন ঘোষ। পরদিন বোলপুর বন্ধে সাড়া দেবার আবেদন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে প্ররোচনা সৃষ্টি করে সি পি এম আবার নকশালপন্থীদের খুন-খারাপির পথে ঠেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে দুপুর নাগাদ পোস্টমর্টেম হয়ে চারটি মৃতদেহ বোলপুরে ফিরে আসে। বিশাল মিছিল বেরোয় মৃতদেহ নিয়ে। বোলপুর শ্রীনিকেতন রোডের মোড়ে মৃতদেহ নামিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। তারপর সন্ধ্যার মুখে মিছিল পৌঁছে মুলুক গ্রামে। সেখানে জিয়াউদ্দিন ও মান্নানকে কবর দেওয়া হয়। পরে দাহ করা হয় নির্মল ও সুধীর ঘোষকে। কোন বিশৃংখলা ঘটে নি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এদিন পুলিস সুপার জয়দেব চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

পরদিন ২১ নভেম্বর নকশালদের ডাকে

বোলপুর বন্ধ। সি পি এম যথারীতি এই বন্ধের বিরোধিতা করে। পথসভা হয়। বন্ধে সামিল না হতে আবেদন জানানো হয় জনসাধারণের কাছে। কিন্তু বামফ্রন্টেরই দুটি শরিক দল আর এস পি ও সি পি আই সক্রিয়ভাবে বন্ধ সমর্থন করে। সি পি আই-এর জেলা সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য ও বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণপদ সিংহ রায় মুলুক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দেন। আর এস পি ইউনিয়নগুলি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে বন্ধের সমর্থনে। বন্ধ সমর্থন করেন বোলপুরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও। ঐতিহ্যশালী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এই হত্যাকাণ্ডে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। বাউলের দেশ বীরভূম। বাউলসম্রাট পূর্ণদাস বাউলও দোষীদের দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তি দাবি করে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য পুলিসের ডিরেক্টর জেনারেল নিরুপম সোম বোলপুর ছুটে আসেন। আসেন বর্ধমান বিভাগের ডি আই জি, জেলা শাসক এবং পুলিস সুপার। ২৪ ঘন্টার বোলপুর বন্ধ অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়। কোন অঘটন ঘটে নি। বন্ধ ছিল স্বতস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক। কোন গাড়ি-ঘোড়া চলে নি। দোকান-পাটও বন্ধ ছিল। রাস্তায় ছিল পুলিসি টহল। তারই মাঝে নকশালপন্থীরা পিকেটিংও করে। ক্লাস চলাকালীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্বভারতীও বন্ধ হয়ে যায় উপাচার্যের জরুরি নির্দেশে। পরে এ ব্যাপারে উপাচার্য ড: নিমাইসাধন বসুকে প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বভারতী বন্ধ কি নকশালদের হাঙ্গামার ভয়ে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব দেন, বিশ্বভারতীতে হাঙ্গামার কোন ভয় নেই। এখন প্রশ্ন উপাচার্যর ক্লাসবন্ধের নির্দেশ কি তাহলে সমর্থন? আমাদের কাছে খবর আছে, শান্তিনিকেতনের কিছু অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী নকশালদের মিছিলে যোগও দিয়েছিলেন। বন্ধের বিরোধিতায় সি পি এম সেদিন অবশ্য রাস্তায় নামে নি। এই নিয়ে নকশালদের ডাকে দ্বিতীয়বার বোলপুর বন্ধ সফল হল। আগের বন্ধ ছিল ১৯৮২ সালের ২৮ মার্চ–এবং সি পি এম–এর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে।

এর দিন দুয়েক পর বামফ্রন্ট সরকারের সমবায় মন্ত্রী এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ভক্তিভূষণ মণ্ডল বোলপুরে আসেন। তিনিও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন তীব্র ভাষায়। মুলুক গ্রামে গিয়ে নিহতদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনাও দিয়ে আসেন। ইলম-বাজারের ডাকবাংলোয় তাঁর সঙ্গে স্থানীয় নকশাল নেতাদের একটি বৈঠক হয়। বলা বাহুল্য, ভক্তিভূষণ মণ্ডল বীরভূমের লোক। পার্শ্ববর্তী বিধানসভা কেন্দ্র দুবরাজপুর থেকে তিনি নির্বাচিত।

২৫ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রতনকুঠির মাঠে জনসভা হয় পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ–এর উদ্যোগে। তাতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র। সভার অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান শ্যামল সরকার, অধ্যাপক সমিতির নেত্রী ডক্টর অপরাজিতা দেবী প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। বক্তাদের ভাষণে এই নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়।

এদিকে রাজনৈতিক দাবার গুটি হাত থেকে চলে যাচ্ছে দেখে ২৬ নভেম্বর সি পি এম বোলপুরে একটি মিছিল করে তথাকথিত রাজীব বিরোধিতার ধুয়ো তুলে। অথচ বিভিন্ন বক্তার ভাষণে মুলুক গ্রামের কথাই প্রাধান্য পায়। হাজার দুয়েক লোকের এই সমাবেশে অধিকাংশই এসেছিল বাইরে থেকে। স্থানীয় নকশাল নেতাদের অভিযোগ, সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সি পি এম–এর জেলা সম্পাদক সুনীল মজুমদার প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করেন। তাঁর প্ররোচনাতেই মিছিলের লোক পার্শ্ববর্তী সর্বানন্দপুর গ্রামে গিয়ে ফের নকশালদের ওপর হামলা করে। দু'জন নকশালপন্থী গুরুতরভাবে আহত হয় তাদের লাঠি, রড ও টাঙ্গির আঘাতে।

২৮ নভেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা মুলুক গ্রামে গিয়ে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয় অধ্যাপক শ্যামল সরকারের সভাপতিত্বে।

মুলুক গ্রামের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে সি পি এম যথেষ্ট বিপাকে পড়েছে তা তাদের আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে নকশালপন্থীরা এই আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে আসতে চাইছে। শান্তিনিকেতন বোলপুরের ঢেউ ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও নবদ্বীপে। সেখানে নকশালপন্থীরা হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেওয়াল লিখনই শুধু করে নি, করেছে পথসভা, এমন কি ধর্মঘট পর্যন্ত।

অন্যদিকে এই ঘটনা সম্পর্কে সি পি এম মুখ খুলেছে অনেক পরে। ঘটনার দিন স্থানীয় সি পি এম নেতারা ছিলেন নীরব। এমন কি পরদিনও জেলা সম্পাদক সুনীল মজুমদার বা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য প্রশান্ত মুখার্জি এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের কাছে কোন মন্তব্য করতে রাজি হন নি। বলেছেন ঘটনার বিশদ খবর তাঁরা তখনও জানেন না। অথচ ২০ নভেম্বর কলকাতার সব ক'টি দৈনিক সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। জেলা পুলিসকে উদ্ধৃত করেই তারা জানায়, সি পি এম সমর্থকদের আক্রমণে চারজন নকশালপন্থী নিহত হয়েছে। সি পি এম–এর মুখপত্র 'গণশক্তি'–তেই শুধু এ ব্যাপারে কোনও খবর নেই। এবং শুধু ২০ নভেম্বরই নয়, ২২ তারিখ পর্যন্ত 'গণশক্তি' এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ২০ নভেম্বরের পর প্রতিদিনই অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্ব সহকারে মুলুক হত্যাকাণ্ডের খবর ও ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। 'গণশক্তি' মুখ খোলে ২৩ নভেম্বর। ওইদিন 'গণশক্তি'তে শেষ পৃষ্ঠায় একটি ছোট্ট খবর বেরোয়। বলা বাহুল্য বিকৃত খবর। চারজন নিহত হবার ঘটনাটি বেমালুম চেপে গিয়ে 'গণশক্তি' অভিযোগ করে, সি পি এম–এর এক কৃষক মিছিলের ওপর কংগ্রেস ও নকশালপন্থীরা যৌথভাবে আক্রমণ চালায়। এতে সি পি আই (এম) নেতা সফিউর রহমান আহত হন এবং মিছিলের আরও চারজন আহত হন। নিহতের কোন খবর সেখানে নেই।

সি পি এম–এর এই নীরবতা বিস্ময়কর। ঘটনার দিনই রাজ্য পুলিস সূত্রে কলকাতায় বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছে যায়। সি পি এম মন্ত্রী এবং নেতারা ঘটনাটি জেনে যান নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন সি পি এম নেতা এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। এমন কি 'গণশক্তি'র রিপোর্ট অনুযায়ী নকশালপন্থীদের হাতে সি পি এম সমর্থকরা আক্রান্ত হলেও দলের নেতারা নকশালপন্থীদের নিন্দা করে কোন বিবৃতি দেন নি। পক্ষান্তরে ঘটনার দিন থেকে বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলি সি পি এম–কে আক্রমণ করে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এসব ব্যাপারে সি পি এম নেতারা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানাতে অভ্যস্ত। এমন কি সি পি এম সমর্থকরা সামান্য আহত হলেও 'গণশক্তি' সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর প্রকাশ করে। কিন্তু তাদেরই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯ নভেম্বর সি পি এম সমর্থকরা আক্রান্ত হলেও সে খবর প্রকাশ করতে 'গণশক্তি'কে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমন কি থানায় তারা কোন এফ আই আর দায়ের করে নি।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৬জন ধরা পড়েছে। সকলেই সি পি এম সমর্থক। এদের মধ্যে ১৩ জনকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। বাকি ২৩ জন পরে আত্মসমর্পণ করে আদালতে। নকশালদের এফ আই আর–এ অবশ্য ৪০ জনের নাম আছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর জেলা প্রশাসন এবং পুলিস বিভাগ এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। নকশালপন্থীরা যাতে বদলা নিতে আবার খুনের রাজত্বে ফিরে না যায়, সেজন্য তাদের মনে আস্থা জাগাতে প্রায় সব ব্যবস্থাই তাঁরা নিয়েছেন। এই ভূমিকা প্রশংসনীয়, এমন কি নকশালপন্থীরাও এখন পুলিস ও প্রশাসন সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্যও করছে না। মুলুক হত্যাকাণ্ডের পর আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। বীরভূম জেলায় সি পি এম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নকশালপন্থীরা তলে তলে মজবুত সংগঠন গড়ে তুলছে। অন্তত শান্তিনিকেতন এলাকায় তাদের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই বেড়ে উঠছে সি পি এমের বিকল্প হিসাবেই।

নীলকণ্ঠ চৌধুরী

এইতো এসে গেছে, এসে গেছে খৈতান! 100% খৈতান!

এখন খৈতান এনেছে আপনার সুবিধার জন্য নানারকম সর্বাধুনিক গৃহকর্মের উপকরণ! ইলেকট্রিক আয়রণ থেকে গীজার, কিচেন মেশিন থেকে রুমহিটার, এমন কি ওয়াশিং মেশিনও! প্রত্যেকটিই তৈরী করেছে খৈতান–100%।

ঠিকই ধরেছেন–বাজারে অনেক নামী দামী কোম্পানী আছে যাদের পরিচয় শুধুমাত্র লেবেলেই। তারা রাম, শ্যাম যদুর তৈরী জিনিষের উপর নিজেদের মোহর চাপিয়ে বাজারে চালাচ্ছে। কিন্তু খৈতানের প্রতিটি সামগ্রীই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোয়ালিটির উপর কড়া নজর রেখে সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নিজেদের আধুনিক ফ্যাক্টরীতে তৈরী।

খৈতানের সমস্ত সামগ্রীই সারাদেশে ২৩০০টিরও বেশী ডীলারের দ্বারা বিক্রীত। এবং যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে, তৎক্ষনাৎ আফটার সেলস্ সার্ভিস হাজির।

তাই, এর পরের বার যখন গৃহকর্মের উপকরণ কিনবেন তখন 100% এর কমে রাজী হবেন কেন? খৈতানই কিনুন আর ষোল আনা উসুল করুন।

নামই যথেষ্ট

Rediffusion/C/K/7

অন্যরূপে মা সারদা

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দেড়শ বছরেও শ্রী শ্রী ঠাকুর সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আবার রামকৃষ্ণ জানতে হলে মা সারদাকে জানতে হয়। জয়রামবাটির যে মহিয়সী নারীর মধ্যে ভারতের আবহমান আত্মা, চিরন্তন অধ্যাত্মরূপ এবং বিশ্বামাতৃত্বের যে পূর্ণ প্রকাশ তাঁরই প্রণম্যরূপকে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গীতে দেখিয়েছেন আমাদের আমন্ত্রিত প্রতিবেদক প্রণবেশ চক্রবর্তী।

'জানবে তোমাদের একজন মা আছে'– সুখে দুঃখে সঙ্কটে বিপদে এই আশ্বাস বাণী তিনি রেখে গেছেন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য। তিনি আবার বললেন, 'পাতানো মা নয়, আসল মা।' আসলে তিনি চিরকালের মা–সর্বজনের জননী সারদা।

জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখার্জির মেয়ে সারু, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী সারদামণি, বিশ্বজয়ী নরেন্দ্রনাথের 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদা আজ তাঁর অমৃতপ্রভায় সর্বজনের মা। আজ যখন নারীমুক্তির নামে আন্দোলন দেখি, তখন শুধু ভাবি, পোষাকের মুক্তি, দেহের মুক্তি এবং বহিরাঙ্গের মুক্তিতেই সব আন্দোলনের সমাধান! অন্তরের মুক্তি, চিত্তের মুক্তি, হৃদয়ের উদারত্ব–সেটা কোথায়?

এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে তাকাই সেই গ্রাম্যবধূ এবং অবগুণ্ঠনবতী জননী সারদামণির দিকে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কন্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরনী–তবু তিনি সকল সংস্কারের উর্ধ্বে। হৃদয় তার আকাশের মতই উদার। তাই মুসলমান ডাকাত আমজাদকে তিনি আদর করে খাওয়ান এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা হয়েও মুসলমান উচ্ছিষ্ট কুড়োতে দ্বিধা করেন না। ভগিনী নিবেদিতাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং নারী শিক্ষার পথটি করে তোলেন প্রশস্ত।

প্রকৃতপক্ষে, আজ যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, তার নেপথ্যে রয়েছে সেই মাতৃত্বের অপার স্নেহস্পর্শ–যার ফলে সঞ্জীবিত হয়েছে সহস্র সহস্র সন্তানের জীবন।

যিনি 'সতের মা, অসতের মা' যিনি 'ভালোর মা, মন্দেরও মা'। সেই জননী সারদামণির অমৃতসমান জীবনকথার বৈচিত্রময় ঘটনা ধারায় বারবার দেখি তিনি যেমন সবলের মা তেমনি দুর্বলেরও মা, আর্ত-পীড়িত-অবহেলিতের মা, আবার শোকে দুঃখে জর্জরিত মানুষের জীবনে একমাত্র আশার আলো। তিনিই বরাভয়দায়িনী জননী। দুঃখের আঁধার রাত্রি যাঁদের জীবনে অনন্ত বাস্তব, বঞ্চনার অভিঘাতে যন্ত্রণা বিদ্ধ জীবন যাঁদের–তাঁরাই এই 'সত্যিকারের মায়ের' কাছে পেতে পারেন নিরাপদ ও নির্ভয় আশ্রয়। শুধু সেদিন নয়, শুধু তাঁর সমকাল বা ক্ষণকালের মানুষই নয়, চিরকালের মানুষ সেই মাতৃত্বের জীবন–জাগানিয়া স্পর্শে বেঁচে উঠতে পারে, প্রাণ-মন সমর্পণ করে শুনতে পারে সেই শাশ্বত আশ্বাস: 'মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।'

তিনি 'আছেন' বলেই জগতসংসারের তাপিত ও পীড়িত মানুষ আজও নতুন আশ্বাসে বেঁচে আছে, যেমন বেঁচে ছিলেন সেদিন। জননী সারদামণির নরদেহ ত্যাগের পাঁচদিন বাকি। রোগ-জর্জর দেহ নিয়েও তিনি অপরিমেয় দিব্যশক্তিতে তখনও মানুষের প্রাণে জ্বালিয়ে চলেছেন নিত্যনতুন আশার আলো। সেদিন অন্নপূর্ণার মা এসেছেন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে মাকে দেখতে। কাছে গিয়ে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "মা, আমাদের কি হবে?' করুণা বিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে সেদিনও অভয় দিয়ে মা থেমে থেমে বললেন: 'ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?' একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বললেন: 'তবে একটি কথা বলি–যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগত তোমার।' আর্ত-পীড়িত দুঃখী মানুষের জন্যই তাঁর এই পৃথিবীতে আসা, তাঁদের জন্যই সংসারের যাবতীয় দুঃখকষ্টের সমুদ্রমন্থন করে সবটুকু বিষ ধারণ করেছেন নিজের দেহে–আর তাই বিদায় নেওয়ার আগে শোনালেন অমোঘ বার্তা: জগত তোমার। কিন্তু এই সঙ্কট কালে সেই বার্তা কি আমাদের মনে প্রবেশ করেছে?

আমরা তাঁকে বুঝি বা না বুঝি–তবু জানি, 'তিনি আমাদের মা।' সকলের মা। শ্রেণীবিচার নেই, জাতিবিচার নেই, নেই গোত্রবিচারও। বরং যে সন্তান দুর্বল–তার দিকেই মায়ের টান বেশী। স্বামী সারদেশানন্দ লিখছেন: মায়ের বাড়িতে কুলি, মজুর, গাড়িওয়ালা, পালকি বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যেই আসুক, সকলেই তাঁর পুত্রকন্যা, সকলেই ভক্তগণেরই মতো স্নেহ–আদর পায়। এখানে শুধু জিনিসপত্র ও টাকাকড়ির আদান প্রদান নয়, স্বার্থপর সাংসারিক রীতির উর্ধ্বে নিঃস্বার্থ প্রেমের ব্যাপার, সকলেই তা জানে

সকলেই মায়ের সন্তান, যে-কোন উপলক্ষেই আসুক, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, স্নেহাদরে জলখাবার, মুড়ি–গুড় না হলে অন্তত একটু প্রসাদী মিষ্টি, জল পাবেই। আর সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি–যা ইহ-পরকালে আর ভুলতে পারবে না, যদি বা বিস্মরণ হয়, দুঃখ কষ্টে পড়লেই মনে হবে অভয়াকে, আর মনে পড়বে তাঁর অভয়বাণী, কৃপাদৃষ্টি

ময়নাপুরের অতি সাধারণ সেই মেয়েটির জন্মও তাই সার্থক। মাতৃস্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডাকারী স্বামী সারদেশানন্দের অনুসরণে জানতে পারি: শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি রচয়িতা অক্ষয় কুমার সেনের জন্মস্থান ঐ ময়নাপুর গ্রাম। তখন তিনি অসুস্থ। নিজে মাতৃদর্শনে জয়রামবাটী যেতে পারেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের সেবায় কিছু কিছু জিনিস পাঠাতেন। সেবার একটি 'নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মেয়ের' হাতে অক্ষয় কুমার সেন মায়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন। মা তাকে স্নেহ সমাদর করে বিশ্রাম ও আহারের পর স্বগ্রামে ফিরে যেতে বললেন। তেল মেখে স্নান করে পেট ভরে প্রসাদ

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাহসিনীর স্বপ্ন

কর্মব্যস্ত ববিতা

অশোকা স্টুডিও

কুড়ি বছর বয়সের এক সুন্দরী তরুণী ববিতা। দিল্লীর অশোক স্টুডিও-তে এক সকালে তার রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলা হয়েছিল। কেন? কে হত্যা করেছিল তাকে? ববিতা-র সৌন্দর্য, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস তাকে রক্ষা করতে পারল না। এক বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটল তার জীবনে।

ববিতা, স্টুডিও তে যাবার আগে

১৯ জানুয়ারি ১৯৮৭। দিল্লির বিকাশপুরী-স্থিত একটি ফটো তোলার দোকানে একটি মেয়ের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম ববিতা। স্টুডিওটা সকালের দিকে ববিতা একা একাই দেখাশোনা

করত। বেলার দিকে তার মা শ্রীমতী কৃষ্ণা চাওলা স্টুডিওতে আসতেন। মা ও মেয়েতেই চালাত দোকানটা।

ববিতার বাবা ইন্দ্রজিৎ সিংহ চাওলা দেশবিভাগের সময় পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে দিল্লিতে চলে আসেন। দিল্লিতেই থাকাকালীন তিনি বিয়ে করেন। তারপর নানাভাবে উপার্জনের চেষ্টা করতে করতে অবশেষে মোতীবাগে একটা ফটো তোলার স্টুডিও খুলে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ সিংহ ফটোগ্রাফিটি খুব ভালো বুঝতেন। নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন ফটোগ্রাফি নিয়ে। ঐ এলাকায় তার 'অশোক স্টুডিও'-র নাম ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৭০ সালে তিনি কিছু মেয়েকে ফটোগ্রাফি শেখাতে শুরু করলেন। পরবর্তীকালে বেশ কিছু যুবকও তার কাছে ফটোগ্রাফি শেখে। ইন্দ্রজিৎ সিংহের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে দিল্লিতে পেশাদার ফটোগ্রাফার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। নিজের স্ত্রী কৃষ্ণাকেও তিনি ফটোগ্রাফিতে পারদর্শী করে তোলেন।

তার স্টুডিওর কাছাকাছি ছিল মোতিলাল নেহেরু কলেজ। নিজের দুই মেয়ে মীনু এবং ববিতাকে তিনি ঐ কলেজে ভর্তি করে দেন। দুই মেয়েই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বাবার কাছে ফটোগ্রাফি শিখতে থাকে। বড় মেয়ে মীনু তো অল্প সময়ের মধ্যেই ফটো তোলায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দ্রজিৎ সিংহ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাসতিনেক স্টুডিওটা চালাল দুই বোনে মিলে। মীনু পড়াশোনা ছেড়ে দিল। ববিতাও চমৎকার কাজ শিখে গেছে। ১৯৮৫ সালে সে-ও পড়াশোনা ছেড়ে বাবার কাজে সাহায্য করতে থাকল।

পশ্চিম দিল্লিতে ডি·ডি·এ· কলোনি বিকাশপুরীতে ইন্দ্রজিৎ সিংহ ১৯৮৩-র গোড়ার দিকে একটা জনতা ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন। বিকাশপুরী অঞ্চলে তখনো জনসমাগম তেমন হয়নি। ১৯৮৬-র মে মাসে ইন্দ্রজিৎ সিংহ তার নতুন কেনা ফ্ল্যাটটিতে

ববিতার বাবা ইন্দ্রজিৎ সিংহ

মা, কৃষ্ণাদেবী

অভিযুক্ত সুবে সিং

আরেকটি স্টুডিও খুললেন। সেখানে ববিতা এবং তার মা কৃষ্ণা দেবী বসতে শুরু করলেন। সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ববিতা বাস ধরে পৌঁছে যেত বিকাশপুরী। স্টুডিও খুলে ঝাড়পোঁছ করে কাজকর্ম শুরু করে দিত। তারপর এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মা এসে পড়তেন। তখন ববিতা মাকে কাউন্টারে বসিয়ে ডার্করুমে নিজের কাজে মনোনিবেশ করত। এভাবেই চলছিল বেশ। ১৯শে জানুয়ারি ১৯৮৭। মোতীবাগে 'অশোক স্টুডিও'তে বসে ইন্দ্রজিৎ সিংহ নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন সকাল সাড়ে দশটা। বাড়ি থেকে স্ত্রী কৃষ্ণা দেবীর হঠাৎ একটা ফোন পেলেন তিনি। বিকাশপুরী থেকে বাবল নামে একটি ছেলে নাকি ফোন করে কৃষ্ণা দেবীকে জানিয়েছে, বিকাশপুরীতে তাদের স্টুডিওতে একটা গণ্ডগোল হয়েছে, ববিতা ভীষণ চোট পেয়েছে।

হতভম্ব ইন্দ্রজিৎ সিংহ সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন সেখানে। গিয়ে দেখলেন, তার প্রিয় কন্যা ববিতা-র রক্তাপ্লুত মৃতদেহ স্টুডিওর মধ্যে
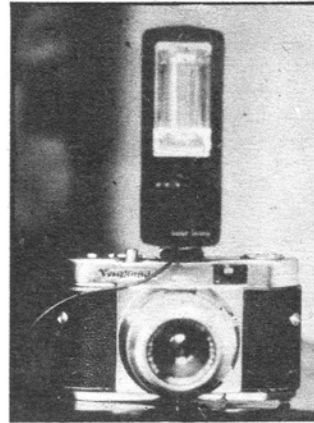
উদ্ধারকৃত ক্যামেরা

পড়ে আছে। কোনো দুর্বৃত্ত ছুরি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে গেছে তাকে। পুলিশে খবর গেল। বিকাশপুরী থানার অফিসার এম·আর· মেহেমী এবং আরো কয়েকজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী দ্রুত স্টুডিওতে এসে পৌঁছোলেন। স্টুডিওর চেহারা এবং ববিতার শরীরে আঘাতের ধরনগুলি দেখে পুলিশ নিশ্চিত হল যে দুর্বৃত্তের সঙ্গে ববিতা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই করে গেছে। ইন্দ্রজিৎ সিংহ পুলিশকে জানালেন, দামী ক্যামেরাটি খোয়া গেছে। ববিতার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতে কিছু ছিঁড়ে আসা চুল পাওয়া গেল। পুলিশ এ সমস্ত কিছুই পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গেল। ববিতার মা, বাবা, দিদি, ছোট ভাই কান্নায় ভেঙে পড়লেন সকলে।

পুলিশ-কুকুর নিয়ে আসা হল। ক্রাইমটীম এসে সব দেখল। কিছুই বোঝা গেল না। কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। ববিতার বাবা ইন্দ্রজিৎ সিংহের বয়ান অনুযায়ী পুলিশ ভা·দ·বি· ৩০২/৩৯৭/৩৪ নম্বর ধারায় কেস লিখে নিল। ইন্দ্রজিৎ সিংহ কারুর ওপরই সন্দেহ প্রকাশ করলেন না। ফোনে যে বাবল নামের ছেলেটি প্রথম খবর দেয়, তার সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ সিংহ বললেন, ছেলেটি ভালো, খান্না ইলেক-ট্রিক্যালস-এ কাজ করে। স্টুডিও এবং ফ্ল্যাটে ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং-এর কাজ ঐ ছেলেটিই করেছিল।

পুলিশ নানাদিক দিয়ে খোঁজখবর করেও কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে ববিতা-র পোস্টমর্টেম রিপোর্ট গেল। তাতে বলা হল, শ্বাসনালী কেটে ফেলার জন্যই ওর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর পূর্বে ববিতার ধর্ষিতা হবার সম্ভাবনা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নাকচ করা হয়েছে। প্রাথমিক শোকের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে দু'দিন পর কৃষ্ণা দেবীও পুলিশের কাছে বিবৃতি দিলেন। এখন একটা তথ্য পুলিশের হাতে এল। কৃষ্ণা দেবী জানালেন, ১৭ জানুয়ারি সকালে ববিতা যখন একা স্টুডিও তে কাজ করছিল, তখন একটি যুবক নাকি দোনলা বন্দুক কাঁধে নিয়ে ফটো তুলতে এসেছিল। কৃষ্ণা দেবীকে পরে ববিতা একথা জানিয়ে বলেছিল, ওর নাকি ছেলেটাকে দেখে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। একা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফটো তুলতে ববিতা ভয়ই পেয়েছিল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত কিছু ঘটেনি। কিন্তু পুলিশ ভেবে দেখল, যে ক্যামেরাটা খোয়া গেছে, তার মধ্যে যে রোলটা ছিল তাতে ঐ যুবকের ফটো রয়েছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ফের বাবল নামের ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে ভালভাবে জেরা করতে শুরু করে।

প্রচণ্ড জেরার মুখে পড়ে বাবল এবার পুলিশের কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য উপস্থিত করে। যুবকটির বিবৃতি অনুযায়ী জানা গেল, সে ঐ বিকাশপুরীর এইচ ব্লকের পার্কে জুডো ক্যারাটে শিখতে যায়। সেখানে তার আলাপ হয় সন্তোষ কুমার নামে আরেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে। ভরতপুরে তার

বাড়ি, থাকে বিকাশপুরীর এইচ ১/১১ নম্বর ফ্ল্যাটে। সন্তোষ কুমার মতিলাল নেহেরু কলেজের বি·এ· ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। সন্তোষ কুমার আবার বাবলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় সুবেসিংহ নামে আরেক বন্ধুকে। সুবেসিংহ এইচ ব্লকেই থাকে। টেলিফোনে চাকরি করে সে। ওরা তিনজন প্রায়ই ববিতাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানারকম মুখরোচক গল্প করত। ইলেক-ট্রিকের কাজকর্ম বাবলই ববিতাদের স্টুডিও এবং ফ্ল্যাটে করেছিল, ফলে ববিতার সঙ্গে ভালো আলাপ হয়ে গিয়েছিল তার। এটা সুবেসিংহ এবং সন্তোষ কুমার ঈর্ষার চোখে দেখত।

১৯ জানুয়ারি সকালে ন'টা নাগাদ সুবেসিংহ এবং সন্তোষ বাবলের বাড়িতে এসে তাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। সন্তোষের কাছে চাকু দেখে বাবল ভয় পেয়ে যায়, বুঝতে পারে, ওরা কোনো বদ মতলবে বেরিয়েছে। বাবল শরীর খারাপ বলে ওদেরকে এড়িয়ে যায়। তখন ওরা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর বাবলের মনে হয়, ওরা ববিতার কাছে যায়নি তো! ববিতা এ সময়টায় একা থাকে। সে ছুটে স্টুডিওতে পৌঁছায়। কাউকে দেখতে পায় না। ববিতা হয়তো ভেতরে কাজ করছে ভেবে সে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। এসময় সেখান থেকে সন্তোষ এবং সুবেসিংহ দ্রুত বেরিয়ে উত্তর মুখে ছুটতে থাকে। বাবলও স্টুডিওর ভেতরে ঢুকে ববিতাকে খোঁজে। তখনই সে দেখে, ববিতা পড়ে আছে, তার দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ববিতার মা-কে বাবল ফোন করে।

এবার পুলিশ সন্তোষ এবং সুবেসিংহকে খুঁজতে থাকে। দু'জনেই তখন ফেরার। ২৩ জানুয়ারি সুবেসিংহ তিসহাজারী কোর্টে আত্মসমর্পণ করে। ইন্সপেকটর মেহেমী কোর্টে আবেদন জানালেন, সুবেসিংহকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাস্টডি রিমাণ্ডে পাঠানো হোক। ৩১ জানুয়ারি, তিনদিনের জন্য সুবেসিংহ কে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠানো হল।

জেরার মুখে পড়ে সুবেসিংহ জানাল, ববিতাকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে তারা একটা পরিকল্পনা করে। ফটো তোলার জন্য ববিতা যখন একা স্টুডিও'র মধ্যে ঢুকবে, তখন তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করা হবে, এবং সেই অবস্থার ফটো তুলে রেখে ববিতাকে সারাজীবন ব্ল্যাকমেল করা যাবে। সকালের দিকে ববিতা স্টুডিওতে দু'আড়াই ঘন্টা একা থাকে, সে সময়টাতে কাজ হাসিল করতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, একা একা কোনো যুবকের ফটো তোলার জন্য ববিতা রাজী হবে তো। যদি বলে, মা না এলে হবে না? এটা পরীক্ষা করার জন্য সুবেসিংহ জনৈক প্রতিবেশীর একটা দোনলা বন্দুক চেয়ে নিয়ে ১৭ জানুয়ারি সকালে ববিতার বিকাশপুরীস্থিত 'অশোক স্টুডিও'তে ফটো তুলতে যায়। সে খুব খুশী হয় এই দেখে যে ববিতা একা ফটো তুলতো আপত্তি করেনি।
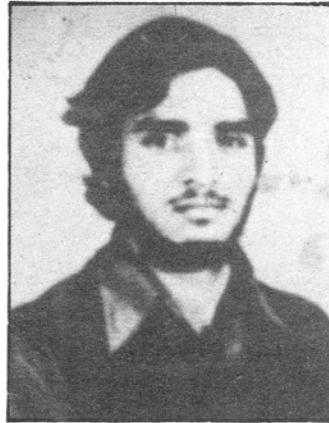
সন্তোষ কুমার

ঘটনার দিন সকালে সন্তোষ এবং সুবেসিংহ প্রথমে বাবলকে সঙ্গে নেবার জন্য ওর বাড়ি যায়। বাবল বলে ওর শরীর খারাপ। তখন ওরা দুজনেই ববিতার স্টুডিওতে যায়। সন্তোষ ববিতাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা চাকু নিয়েছিল সঙ্গে। যাই হোক, সন্তোষ ফটো তুলবে বলে ববিতার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যায়। সুবেসিংহ কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই ভিতর থেকে মারপিটের আওয়াজ আসতে থাকে। সুবেসিংহ ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখে স্টুডিও'র দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মিনিট দশেক পরে সন্তোষ দ্রুত বেরিয়ে আসে, ওর হাতে ববিতার ক্যামেরা। দুজনে দৌড়ে মেন রোডে এসে বাস ধরে মদনগীর চলে যায়। সেখানে তিনদিন সন্তোষের এক বন্ধুর বাড়িতে ওরা লুকিয়ে থাকে।

জেরার মুখে পড়ে সুবেসিংহ জানাল, ববিতাকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে তারা একটা পরিকল্পনা করে। ফটো তোলার জন্য ববিতা যখন একা স্টুডিও'র মধ্যে ঢুকবে, তখন তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করা হবে, এবং সেই অবস্থার ফটো তুলে রেখে ববিতাকে সারাজীবন ব্ল্যাকমেল করা যাবে।

সুবেসিংহের নির্দেশমত পুলিশ দক্ষিণ দিল্লির খানপুরে' অজন্তা স্টুডিও থেকে ববিতার ক্যামেরাটি উদ্ধার করে। স্টুডিওর মালিক জানায় যে সন্তোষ ওটা ঠিক করতে দিয়েছিল। সুবেসিংহের কথামত জানা যায় যে, ওর মধ্যে নিজের ফটো আছে বলে সুবেসিংহ ফটোর রোলটা জোর করে বের করতে গিয়ে খারাপ করে ফেলে।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ইন্স-পেকটর এম·আর মেহেমী সদলবলে ভরতপুর পৌঁছে সেখানে সন্তোষের বাড়ি থেকে সন্তোষকে গ্রেপ্তার করে আনেন। সন্তোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ববিতাকে জোর করে সে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল, ঠিক তখনই ববিতা ক্যামেরা ছেড়ে সন্তোষের দিকে রুখে দাঁড়ায়। সন্তোষ কোনভাবেই ববিতাকে কাবু করতে না পেরে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ববিতা তার চুলের মুঠি প্রচন্ড জোরে ধরে রেখেছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় সুবেসিংহ ঢুকতে পারছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সন্তোষ ববিতার গলায় ছুরি বসিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মোতিলাল নেহেরু কলেজের শৌচাগার থেকে সন্তোষের কথামত পুলিশ সন্তোষের রক্তমাখা কাপড় ও ছুরিখানা উদ্ধার করে। বাবল অবশ্য ছাড়া পেয়ে যায়। এভাবেই শেষ হয়ে গেল কুড়ি বছর বয়সী একটি তাজা যুবতীর জীবন।

পুলিশ কর্তা মেহেমী

ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব

বিশেষ রচনা ১১ পৃষ্ঠার পর

পেয়ে ময়নাপুরের 'মুটে মেয়েটি' পরমানন্দিত। বেলা গিয়েছে দেখে মা তাকে অবেলায় চলে যেতে নিষেধ করে রাত্রেও বিশ্রাম করে যেতে বললেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়েটির বয়স হয়েছিল—বৃদ্ধাই বলা চলে। ম্যালেরিয়ার রোগী—অনেক দূর থেকে হেঁটে বোঝা বহন করে এনেছে। খুব ক্লান্ত। তার উপর আবার জ্বর হয়েছে।

মা ভোর রাত্রেই ওঠেন—বরাবরের অভ্যেস। দরজা খুলেই বুঝলেন অসুস্থ মেয়েটি নিজের অজান্তেই বিছানা নোংরা করে ফেলেছে। কি উপায়? অন্যেরা ঘুম থেকে উঠে টের পেলে তাঁর দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ হবে। শেষ পর্যন্ত মিষ্টি কথায় প্রবোধ দিয়ে চুপিচুপি জলপানির জন্য মুড়ি গুড় হাতে দিয়ে বললেন: 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে বিদায় নিলে মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করলেন।

এই আমাদের মা। অবহেলিতের মা। আর্ত—পীড়িতের মা। সকলের মা। তাই তিনি গোবিন্দেরও মা।

জয়রামবাটিতে মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার পর স্বামী জ্ঞানানন্দ মায়ের জন্য দুটি ভালো গাই-গরু কিনে আনেন। সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশাই গরুর খরচ বহন করেন। ঘটনাচক্রে এই গাই—গরু দেখাশোনার জন্য গোবিন্দকে নিয়োগ করা হল। গোবিন্দকে কেউ বলে রাখাল, কেউ বলে বাগাল। অল্প বয়সে মা-বাপ মারা যাওয়ায় খুবই দুঃখের মধ্য দিয়ে গোবিন্দ বড় হয়েছে। তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে মায়ের বাড়িতে এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাইনে সামান্য, কিন্তু খাওয়া-পরা পাবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। নয়—দশ বছরের বালক নিজের কাজকর্ম ভালই করে এবং মায়ের স্নেহ আদরে বেশ সুখেই তার দিন কাটে। কিছুদিন পরেই তার শরীরে খোস পাঁচড়া দেখা দিল, চিকিৎসা-ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হল। কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হল না।

একদিন রাত্রে গোবিন্দের ভীষণ যন্ত্রণা। অসহায় বালক খোস পাঁচড়ার যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। আর সে সহ্য করতে পারছে না। সেদিন রাত্রে কোনরকমে তাকে রাখা হল। পরদিন ভোর হতে না হতেই মা তাকে বাড়ির ভিতর ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর নিজের হাতেই শিলনোড়াতে নিমপাতা—হলুদ বাটতে শুরু করলেন। বিস্মিত গোবিন্দ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। মা কিছুটা বাটেন, আর গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলেন, কিভাবে সেটা লাগাতে হবে। মাতৃহীন বালক মাতৃস্নেহের অপার করুণাঘন স্পর্শে যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। 'উভয়ের মুখ দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া কে বুঝিবে—নিজের ছেলে নয়? "আত্মৌম্যেন সর্বত্র সমং" দেখা, "পরকে আপন করা" শিক্ষা দেবার জনাই তো তুমি এসেছ, মা।'

আবার ভুবন মোহন গুহের মতো মানুষ তিনিও তো 'অহেতুক কৃপার' মাধুর্যে ফিরে পেয়েছেন নতুন জীবন। তখন নিতান্তই সাধারণ যুবক, কলেজের ছাত্র তিনি। সেটা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তিনি ও তাঁর এক বন্ধু কলকাতার চেতলা থেকে রওনা হলেন জয়রামবাটি। যাওয়ার সময় মায়ের জন্য কি নিয়ে যাবেন? তিনি লিখছেন: 'এক পুকুরের পাড়ে কে যেন আমরুলির বাগান করে রেখেছে, এত শাক। আমরা সেই শাক তুলে, ধুয়ে, কলাপাতায় মুড়ে মায়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম।'

জয়রামবাটিতে গিয়ে পৌছালেন দুই বন্ধু। যেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি লিখছেন: 'দেখলাম, শ্রীশ্রীমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের মাকে এই প্রথম দর্শন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আগে মায়ের কোন ছবিও দেখি নাই, এমনকি, তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী বলেও জানতাম না।' তবুও মা এই একান্ত অপরিচিত সাধারণ দুটি কলেজের ছাত্রকে সেদিন বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন। ভুবন মোহন গুহ লিখছেন: 'দীক্ষার পর মা মুড়ি ও কিছু ভাজা খেতে দিলেন—'বাবা এদেশে তো কিছু পাওয়া যায় না, মুড়ি খাও, পরে অন্ন প্রসাদ পাবে।' ...আজ স্তম্ভিত হই, যখন ভাবি, যে মায়ের কথা কখনও আগে শুনিনি, তাঁর ছবিও দেখিনি, দীক্ষা কি তাও জানি না—তাঁর কাছে দূর-দুর্গম রাস্তা সঙ্গীবিহীন পেরিয়ে কেন উপস্থিত হলাম। শুধু মনে হয়—আমরা তো তাঁর কাছে যাইনি, তিনি নিজেই অপার করুণায় আমাদের তাঁর পায়ে টেনে নিয়ে জন্ম সার্থক করে দিয়েছেন।' এমনি কত নাজানা, কত অচেনা মানুষদের কাহিনী—যাঁরা নিজেদের অবহেলিত বা শোকার্ত জীবনে ফিরে পেয়েছেন নতুন করে বেঁচে ওঠার, মানুষ হয়ে ওঠার আশ্বাস। ডাকাতবাবা বা আমজাদের কাহিনী তো সর্বজন—পরিচিত, বহু আলোচিত। কিংবা বিষ্ণুপুর স্টেশনের এক সাধারণ বিহারী কুলি—যে কিনা মাতৃদর্শনে অভিভূত হয়ে সারদামণির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল জানকীমাকে, যাকে মা এক পলকের পরিচয়েই স্থান দিয়েছিলেন নিজের পদপ্রান্তে—সেসব ইতিবৃত্তও আজ আর অজানা নেই। তবুও কি সব জানা হয়ে গেছে? এখনও কত অজানা ঘটনা রয়েছে মানুষের স্মৃতির ভাণ্ডারে—তাঁর সন্ধান রাখেন কতজন?

শান্তি নিকেতনের পূর্বপল্লীর ডঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল সেরকমই এক অকথিত কাহিনী জানিয়েছেন। ডঃ মণ্ডলের বড় দাদা বিজয় মণ্ডল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডঃ মণ্ডলের এক দাদা ভূদেব চন্দ্র মণ্ডল লিখছেন: এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাঁর মা মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। তিনি কোনমতেই পুত্রশোক ভুলতে পারছিলেন না। সেই যন্ত্রণার কাহিনী নিজেই বলেছেন, 'আমি নিজেকে কোনমতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। শেষে তীর্থে যাওয়া মনস্থ করলাম। জগন্নাথ দর্শনের জন্য আমি শ্রীক্ষেত্র যাবার কথা স্থির করলাম। শ্রীক্ষেত্র মানসে আমি বিষ্ণুপুর স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি, এমন সময়ে দেখলাম, অদূরে সারদা মা। তিনি কাছে আসেন এবং বলেন, মা, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' এই অন্তরস্পর্শী সুধাবচনে পুত্রহারা জননীর বুকে যেন শোকের সাগর উত্তাল হয়ে উঠল। জগতজননীকে পুত্রশোকাতুরা এই জননী নিজ দুঃখের কথা বললেন। জগতজননী সমস্ত শুনে বললেন: 'আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।' পুত্রহারা জননী বললেন: 'আমার গুরু তো আছেন: আমি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত, আপনার মন্ত্র আমি কি করে নেব? আমি তা তো নিতে পারব না।' একথা শুনে মা সারদা বললেন, 'তা হোক, তুমি গুরুর মন্ত্র আগে জপ করবে, তারপর আমার মন্ত্র জপ করবে।'

তার পরের ঘটনা বিজয় মণ্ডলের জননী নিজেই বলছেন, 'তখন বিষ্ণুপুর স্টেশনে একান্তে একটি গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে মা সারদা আমাকে মন্ত্র দেন। এর বেশ কিছুদিন পর আমার শোক অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। সারদা মা আমার বাড়িতে আসেন আমার খোঁজ নিতে। আমি পাদ্য—অর্ঘ দিয়ে তাঁকে ঘরে বসাই এবং তাঁর সেবা করি।' ভূদেবচন্দ্র বলছেন: 'মায়ের কাছে একথা শুনতে শুনতে সারদা মা যে কত করুণাময়ী ছিলেন এবং পরের দুঃখে যে তাঁর প্রাণ কতখানি বিগলিত হত, সেকথা সহজেই বুঝতে পারি।'

এরকম আরও কত প্রাণস্পর্শী ঘটনা, কত প্রাণ জাগানিয়া কাহিনী। ভক্ত ভৈরব গিরীশচন্দ্র বা পদ্মবিনোদের প্রতি অপার করুণার কথা আজ সর্বজনজ্ঞাত, যেমন সর্বজনজ্ঞাত সেই কাহিনীও, যেখানে মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে শুধু মাতৃ সম্বোধনে বদ্ধ হয়ে এক দুশ্চরিত্রা নারীর হাত দিয়ে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ন পাঠাতেও দ্বিধা করেননি।

এই যেমন একদিকের জীবন্ত ছবি, অন্যদিকে তেমনই 'মূক যারা দুঃখে-শোকে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'—সেই চিরকালের অবহেলিত মানুষও মাতৃসন্নিধানে এসে ফিরে পেয়েছে নিজের অপহৃত সম্মান, ফিরে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এমনই কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একদিন মা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুলতলায় চৌকির উপর বসে আছেন, এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে নালিশ করল, তার উপপতি হঠাৎ তাকে ত্যাগ করেছে। মেয়েটির এই উপজাতি দুঃখের কাহিনী শুনে শ্রী শ্রী মা ঐ ডোমকে ডেকে আনলেন। তারপর স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, 'ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে। নরকেও স্থান পাবে না।' মায়ের কথায় লোকটির মন গলল এবং সে মেয়েটিকে নিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ জাতি-বর্ণ, দোষগুণ সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। যে তাঁর কাছে এসে পড়ত, চাইত আশ্রয়—মা তার দোষ বা দুর্বলতা জানলেও তাকে অকাতরে স্নেহ করতেন, আশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন, শোকে-

দুঃখে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাতেন এবং অপরকে ওরকম করতে শেখাতেন। তাঁর সেই অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হত, দস্যুও পরিণত হত ভক্তে।

জয়রামবাটীর কাছেই শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তারা একসময় তুঁতের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুঁতে চাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ তুঁতে চাষী নিরুপায় মুসলমানরাই চুরি-ডাকাতি আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত জননী সারদামণির উদার ভাব এবং অপার করুণায় সেই কুখ্যাত 'তুঁতে ডাকাতদের' জীবনেও দেখা দেয় পরিবর্তন। গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে বলে: মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে।'

এই যে সামাজিক রূপান্তর—একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমিত হলেও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়নি। কিংবা এই মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি কোন মন্ত্রবলেও। এর পিছনে ছিল জননীর অপার উদার ভাব—যা মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটাতে প্রস্তুত করেছে ক্ষেত্রভূমি। বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে বলল: 'মা ঠাকুরের জন্য এগুলি এনেছি, নেবেন কি?'

মা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: 'খুব নেব বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বইকি?'

মায়ের জনৈকা ভক্ত সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন: 'ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?

মা সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে কলাগুলি তুলে রাখলেন এবং মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্টি দিতে বললেন। সে চলে গেলে মা সেই ভক্তটিকে তিরস্কার করে গম্ভীরভাবে বললেন, 'কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।'. তিনি বলতেন, দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।'

মা তা জানতেন বলেই আজ তিনি বিশ্বজননী। তাই 'সাতবেড়ে গ্রামের লালু জেলের' গান শোনানোর আবদার অতি সহজেই প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে পারেন তিনি। আবার জয়রামবাটীর চৌকিদার অম্বিকাকেও নিজের দাদার আসনে গ্রহণ করতে পারেন একান্ত আপনজন হিসেবে। 'জীবই শিব'—এই তত্ত্ব ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে তিনি নিজের জীবনে সপ্রমাণ করেছিলেন। আর সেইজন্যই চিরকালের অবহেলিত মানুষের সুপ্ত ও ম্রিয়মাণ হৃদয়ে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন দেবত্বের সম্ভাবনা। তাই দেখি প্রচণ্ড জল ঝড়ের মধ্যেও শিহড় গ্রামের সেই পাগলটা সাঁতার কেটে ভয়াবহ নদী পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে মায়ের জন্য একবোঝা সজনে শাক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

মায়ের আর একজন দীক্ষিত ভক্ত—জাতে যুগী, তাই তার চলা-ফেরায় বড়ই সঙ্কোচ। এটা মায়ের চোখেও পড়েছে। একদিন তিনি ঐ যুগী ভক্তকে ডেকে বললেন, "তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ করছ? —তাতে কি বাবা? তুমি যে ঠাকুরের সন্তান, ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।' এখানেই শেষ নয়, সেই কুণ্ঠিত ভক্তের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলার জন্য বললেন, দীক্ষাদানকালে তিনি তো কি জাতি এ প্রশ্ন করেননি। জাতবিচার করেননি। এ থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত, তিনিও মায়েরই ঘরের ছেলে।

এরকম কত ঘটনা। একবার মহাষ্টমীর দিন ভক্তরা সবাই শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিচ্ছেন। মায়ের নজরে পড়ল শুধু একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। মা তাঁকে ডাকলেন, তাঁর কাছ থেকে জানলেন, বাড়ি তাঁর তাজপুরে, জাতিতে তিনি বাগদি। তাই, ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। যিনি দুর্বলের বুকে সাহস সঞ্চার করতেই এসেছিলেন, যিনি বেদনা—জর্জর বুকের পাঁজরে বজ্রের শক্তি সঞ্চার করতেই মানবী—বেশে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি তো জাতপাতের সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙে চুরমার করার ব্রত পালন করেই আজ বিশ্ব-জননী। মা সেই বাগদিকে ভিতরে এসে পায়ে ফুল দিতে বললেন। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করলে।ন তিনি প্রণাম করলেন। চরণ-পূজা করে তাঁর প্রাণের আর্তি পূর্ণ হল।

করুণাময়ী জননীর অপরূপ জীবনকথার পাতায় পাতায় দুঃখীজনের নিত্য আনাগোনা। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চারদিকে নানা সঙ্কটের কালো ছায়া, প্রচণ্ড সঙ্কট জামা-কাপড়েরও। এই সঙ্কটের করালগ্রাস থেকে নিভৃত পল্লীজীবনও মুক্ত নয়। সেদিন সকাল দশটার সময় দেশড়া গ্রামের বৃদ্ধ হরিদাস বৈরাগী এলেন মায়ের কাছে। হরিদাসের গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। এমনকি গিরীশচন্দ্রের মতো একজন খ্যাতনামা মানুষও এই বৈরাগীর গুণগ্রাহী। হরিদাসকে মা তেল মেখে স্নান করতে বললেন। স্নানান্তে করলেন প্রসাদের ব্যবস্থা।

কথায় কথায় সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মায়ের কাছে নিবেদন করলেন: তাঁর পরিধেয় বস্ত্র নেই। শ্রীমা সকালে স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি উঠানে শুকোতে দিয়েছিলেন। কাপড়টি একেবারেই নতুন—মাত্র দু একদিন মা পরেছেন। বৃদ্ধের বস্ত্রাভাবের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাপড়টি উঠোন থেকে তুলে এনে তাঁকে দিলেন। হরিদাস এই অপ্রত্যাশিত মাতৃস্নেহে বিহ্বল হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই স্নেহের দান মাথায় ঠেকিয়ে বিদায় নিলেন।

বাগবাজারে 'উদ্বোধন' কার্যালয়—যা এখন 'মায়ের বাড়ি' বলেই সর্বজনে পরিচিত—সেই উদ্বোধনের সাধারণ একজন কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের করুণাধারায় অবগাহন করে অক্ষয় জীবনের অধিকারী। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে। পূর্ববঙ্গে নিজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন সবাই ছিল—যাদের ভরণপোষণের জন্যই তিনি কলকাতা শহরে সেদিন অনশনে অর্ধাশনে পথে পথে ঘুরছিলেন। তাঁর ভাগ্য ছিল ভাল, জীবন হয়েছিল ধন্য। তিনি মায়ের বাড়িতে একটা কাজ পেয়ে গেলেন। এমনই ভাগ্যবান ছিলেন তিনি যে, মায়ের ফাই-ফরমাস যেমন খাটেন, তেমনি পান জননী সারদার স্নেহাদর।

হঠাৎ একদিন খবর এল কীর্তিনাশা পদ্মা চন্দ্রবাবুর বাড়িঘর সব গ্রাস করেছে। তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—মাথা গোঁজারও স্থান নেই। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে চন্দ্রবাবু দিশেহারা হয়ে পড়লেন—কি করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। পাগল হওয়ার যোগাড়। আহারনিদ্রা ভুলে গেলেন। খবরটা একসময় জননী সারদার কানেও পৌঁছল। মা প্রিয় সন্তান চন্দ্রের বিপদের কথা জেনে বিষম ব্যথিতা হলেন এবং একান্ত গোপনে চন্দ্রকে তিনশ টাকা দিয়ে বললেন: 'দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস।' স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সে সময় তিনশ টাকার অর্থমূল্য বহুগুণ বেশী ছিল।

এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বামী সারদেশানন্দ বলেছেন: মায়ের সেই অহেতুক কৃপার কথা ভক্তি বিগলিত চিত্তে চন্দ্রদা বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। এরকম কত বিচিত্র ঘটনা যে উদ্বোধনে ঘটত, তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন স্বভাবের বহু সন্তানকে স্নেহশৃঙ্খলে বদ্ধ করে স্বল্প পরিসর উদ্বোধনের বাড়িতে যে অদ্ভুত সমাবেশ মা সৃষ্টি করেছিলেন, তা দেখে মনে হয় 'সর্বস্য হৃদি সংস্থিতে' মহামায়া। তিনিই আবার লিখছেন: উদ্বোধনের কর্মচারী ঝি চাকর বামুন সকলেই মায়ের সন্তান—মায়ের স্নেহের সম-অধিকারী, তাদেরও সকলের জন্য মায়ের সমান ভাবনা।

কার জন্য ভাবেননি মা? যার জন্য কেউ ভাবে না, কেউ ভাবেনি—সেই অসহায় অনাথের জন্যও মাতৃবক্ষের পাঁজর ভেদ করে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। 'বহুজনসুখায়', 'বহুজনহিতায়' আজ যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, সেই আন্দোলনের মূল ভাবটিও মা তাঁর নিজের জীবনেই প্রমূর্ত করে দিয়েছেন। বহু মানুষের দুঃখের অনল নিজের বক্ষে ধারণ করেছেন অক্লেশে, সেই সঙ্গে তাদের জীবনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন প্রাণের প্রদীপ। যেমন সেদিন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনে।

স্বামী ঈশানানন্দজী সেদিনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন: সকালে কিছু আনাজপাতি, পূজার ফুল ইত্যাদি নিয়ে বেলা ৯টা নাগাদ কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী পৌছে শুনলাম, মা বাঁড়ুজ্যেদের বাড়িতে গেছেন। সময়টা হচ্ছে ১৩২৪ সনের (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাস। কিছুক্ষণ পরে মা সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, বাঁড়ুজ্যেদের একটি অনাথা বিধবার (রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) কানের মধ্যে ঘা হয়েছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। অথচ ভদ্রমহিলার থাকার মধ্যে আছে কেবল একটি

নাবালক ছেলে। কে চিকিৎসা করবে, দেখবেই বা কে? সময়মতো চিকিৎসা না হওয়ায় কানের ভিতর ঘা পচে গিয়ে বড় বড় পোকা হয়েছে, দুর্গন্ধে কেউ কাছেও যেতে পারে না।

এ সহায়হীন বিধবার জন্য আর কেউ না থাকলেও মা সারদা আছেন। তাই তিনি সকালে নিমপাতার জল গরম করে নিয়ে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করে গেলেন এবং পিচকারি দিয়ে ঘা ধুইয়ে ফিরে এলেন।

স্বামী ঈশানানন্দ বলছেন: বেলা অনেক হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে ঠাকুরপূজা সেরে আমাকে প্রসাদ ও জল খেতে দিলেন এবং স্ত্রীলোকটির অবস্থার কথা সব জানিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা তো কোয়ালপাড়া আশ্রমে মাঝে মাঝে অসহায় রোগীদের রেখে সকলে সেবা-শুশ্রূষা কর। কেদারকে বলে তোমরা যদি বাঁড়ুজ্যেদের বিধবা বউটিকে নিয়ে গিয়ে সেবা কর তো তার বড় উপকার হয়। দেখবার কেউ নেই। যত্নের অভাবে ঘায়ের দুর্গন্ধের কাছে কেউ যায় না। নাবালক ছেলেটিরও কী কষ্ট, বাবা।'

মায়ের ওই বুকভরা যন্ত্রণা যেন স্বামী ঈশানানন্দের প্রাণে গিয়েও আঘাত করল। তিনি আর দেরি না করে তখনই কোয়ালপাড়া চলে গেলেন। তারপর কেদার মহারাজের কাছে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে কেদার মহারাজ বললেন পালকি ঠিক করতে। কিন্তু পালকি না পাওয়ায় একটা গরুর গাড়ি ঠিক করা হল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঐ গরুর গাড়ি নিয়ে স্বামী ঈশানানন্দ জয়রামবাটী রওনা হলেন। পথ যদিও বেশী নয়, কিন্তু সেযুগে সেই সংক্ষিপ্ত পথও ছিল দুর্গম। নদী পার হয়ে শিরোমণিপুর শিহড় ঘুরে যখন তিনি জয়রামবাটী পৌছালেন, তখন সকাল হয়ে গেছে।

তাঁদের দেখে মা-সারদা খুব খুশী হলেন, বললেন, তোমরা বেশ করে মুড়ি খেয়ে বউটিকে নিয়ে রওনা হও। তা না হলে কোয়ালপাড়া পৌছাতে রাত হয়ে যাবে।

সেযুগে তো গ্রামাঞ্চলে স্ট্রেচার ছিল না। তাই একটা তক্তা যোগাড় করে তাতে রোগীকে শুইয়ে এনে গরুর গাড়িতে তোলা হল। মা সারদা একটু গরম দুধ নিয়ে এলেন, রোগিনীকে খাওয়ালেন-তারপর সেই শাশ্বত জননীর কন্ঠে ধ্বনিত হল আশ্বাসবাণী, সান্ত্বনার কথা। অবশেষে জানালেন বিদায়।

শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা—জলকাদায় একেবারে ভয়াবহ। সেই সাত-আট মাইল রাস্তা পার হয়ে কোয়ালপাড়া আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে পৌছেই গ্রামের এক ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তিনি এসে সম্ভবমতো ওষুধ দিয়ে ঘা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মাথার ভিতর পর্যন্ত ঘা, নাক-মুখ দিয়েও বড় বড় পোকা বেরিয়ে আসছিল, দুই কান দিয়েই পুঁজ-রক্ত পড়ছে—খুবই দুর্গন্ধ।

এও যেন সেবাধর্মে দীক্ষিত সেই নবীন সন্ন্যাসীদের এক পরীক্ষা ক্ষেত্র, ভাবীকালের সেবাব্রত পালনের পটভূমিকা। কোয়ালপাড়া আশ্রমের সন্ন্যাসী কর্মীরা দিনরাত এই নতুন পূজা—অনুষ্ঠানে আত্ম নিয়োগ করলেন। আর্ত-পীড়িতের মধ্যেই শুরু হল ঈশ্বর সাধনা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সব চেষ্টাই বিফল হল। সেই অনাথা রমণী যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন।

সেটা ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। শীতকাল। সেদিন স্বামী সারদানন্দ পুরী থেকে জয়রামবাটীতে মাকে একটি পত্র দিয়েছেন—মা সেই পত্রটি শ্যামবাজারের প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়কে পড়তে দিলেন। পত্রটি বড়—তিন—চার পৃষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সেসময় উড়িষ্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র খুলে ক্ষুধার্তের অন্নদান—সেবার ব্রত পালন করছিল। স্বামী সারদানন্দ ঐ পত্রে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মানুষের দুঃখকষ্টের প্রাণস্পর্শী বিবরণ যেমন দিয়েছেন তেমনি মিশন সীমিত সাধ্য নিয়ে কিভাবে সেবাব্রত পালন করছে, তারও বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেইসঙ্গে মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যাতে মানুষের অসহনীয় দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

তিনি ঐ পত্রে আরও লিখেছেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের ব্যাপক অভাবের তুলনায় মিশনের সাহায্য অতি সামান্য। কিভাবে এর প্রতিবিধান হবে, সেটাই একটা সমস্যা।

স্বামী ঈশানানন্দের লেখা অনুসরণে দেখি, মা ঐ চিঠি পড়া শুনছেন আর অবিরাম চোখের জল ফেলছেন এবং বলেছেন: ঠাকুর লোকের দুঃখ কষ্ট আর দেখতে শুনতে পারিনে। তাদের দুঃখজ্বালার অবসান কর।'

তারপরই প্রবোধবাবুকে বলছেন: 'প্রবোধ, শরতের দিল দেখলে? যেন বাসুকি। যেখানে জল পড়ে, শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে। শরতের মতো অমন দিলদরিয়া লোক, জীবের দুঃখে এত প্রাণ-কাঁদা—সকলকে পালন করছে, অন্নদান করছে যেন পালন কর্তা। ঠাকুর, রাশ ঠেলে দাও, সকলকে দেবার জন্যে তার দুহাত ভরে দাও।'

জীবের দুঃখে আত্মহারা, দুঃখীজনের আর্তনাদে দিশেহারা মা সারদা আপনমনে এইকথা বলছেন, আর চোখের জল দুহাত দিয়ে মুছছেন।

কারণ তিনি যে দুঃখী জনের মা। জগতের মা। সবাকার মা।

তাইতো দেখি তাঁর অপার অনন্ত করুণাধারায় অবগাহন করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে কত অভাজন। দুর্গাপুরী দেবীর অনুসরণে আমরা জানতে পারি সেই ভাগ্যবান সাপুড়ের বৃত্তান্ত:

সেদিন একদল সাপুড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে জয়রামবাটীর পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে তারা এসে পৌছাল মায়ের বাড়ির কাছেই। ডুগডুগির শব্দ মায়ের কানেও গিয়েছে—তিনি নিতান্তই একটি বালিকার মতো সাপের খেলা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাপুড়েদের ডাকাবেন কাকে দিয়ে? কাছে-পিঠে কেউ তো নেই। শেষপর্যন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে সাপুড়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। সাপুড়েরা খেলা দেখালে কত নেবে—তা ঠিক না করেই তিনি ওদের বললেন: তোমরা ভালো করে খেলা দেখাও, আমি তোমাদের খুশী করে বখশীশ দেব।

ডুগডুগির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের মানুষ এসে ভিড় করল সাপের খেলা দেখতে। বাঁশী বাজিয়ে মনের আনন্দে সাপুড়েরা অনেক খেলা দেখাল। খেলা শেষ হলে মা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দুটি টাকা, একটা কাপড় এবং মুড়ি-গুড় খেতে দিলেন।

মাতৃস্নেহ ধন্য সাপুড়েরাও খুবই অভিভূত। বিদায়কালে ওদের দলপতি মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল। মাও কোন সঙ্কোচ না করে সেই সাপুড়ে সন্তানদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

এই দৃশ্য দেখে মায়ের এক ভাতৃবধূ রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন: 'সাপুড়েকে টাকা দিয়েছ, কাপড় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ, এই তো বেশ, ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু!'

জননী সারদা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবো নি? তোমাদের এ কেমনতর কথা!'

সেই যে আশীর্বাদ—যা জাতিগোত্রের কোন বন্ধন মানেনি, যা ডাকাত আমজাদ থেকে শুরু করে এক অন্ত্যজ সাপুড়ের মাথায়ও হয় অঝোরে বর্ষিত। সেই চিরকালের এবং অনন্তকালের আশীর্বাদ আজও গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতোই করুণাধারায় প্রবাহিত। দুঃখী জনের জীবনে, আর্ত—পীড়িতের যন্ত্রণায়, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া হতাশা—জর্জর প্রাণে সেই আশীর্বাদই নতুন করে বেঁচে ওঠার একমাত্র আশ্বাস।

বাংলা ১৩২৭ (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) সালের সেই ৪ শ্রাবণ আকাশের মেঘে মেঘে সঞ্চারিত হয়েছিল বাষ্পরুদ্ধ অশ্রুধারা—মা তাঁর নরদেহ ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত। স্নেহের কাঙাল যে অসংখ্য মানুষ, ভালবাসার ভিখারি যে হাজার হাজার প্রাণ—সেদিন সবাই সবকিছু হারাবার আশঙ্কায় রুদ্ধবাক।

কিন্তু মা—চিরকালের মা, সকলের মা সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবের কথা সেদিনও বিস্মৃত হননি। তাই বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন আগেই চিরকল্যাণময়ী মা অতি করুণার্দ্র কন্ঠে মহাকালের বুকে ছড়িয়ে দিলেন আশীর্বাদের ফুল, বললেন, 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।'

আর আছে বলেই তো দুঃখী ও আর্ত মানুষ আজও দুঃখের সমুদ্র ডিঙিয়ে বেঁচে ওঠার দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়, যেখানে জননী করুণাময়ীর আশীর্বাদই তাদের একমাত্র সম্বল।
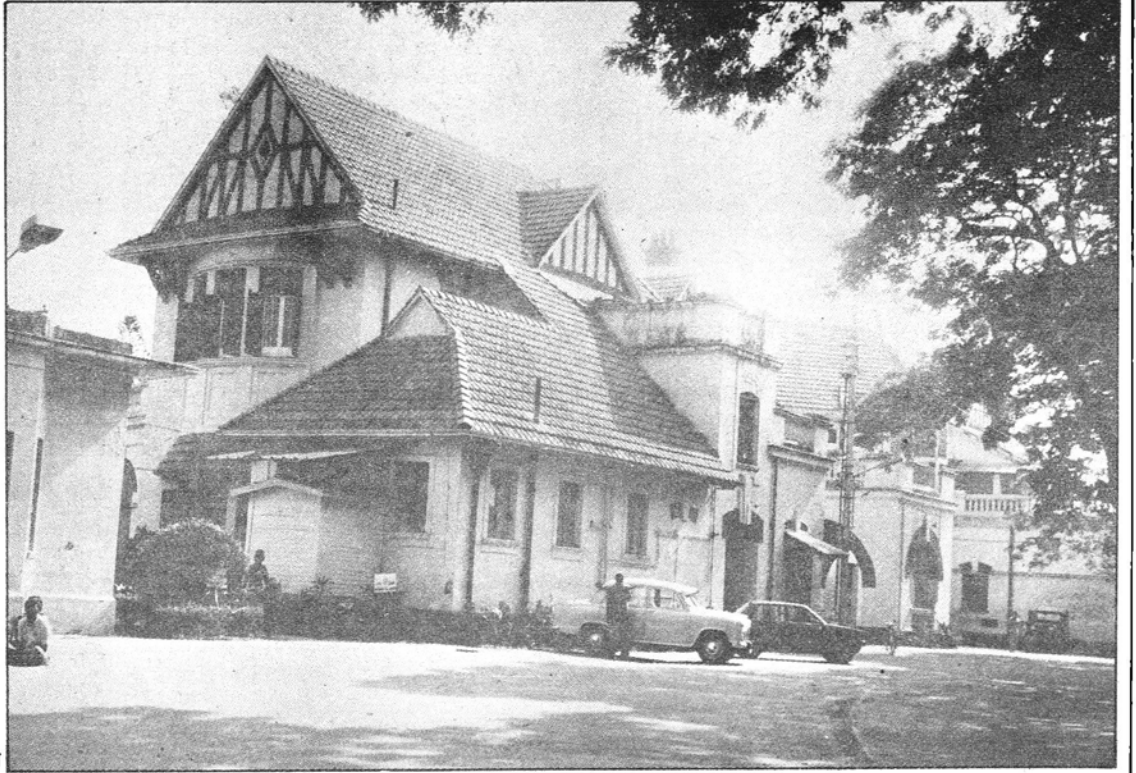
টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব

জমিবাড়ি নিয়ে কলকাতায় চাঞ্চল্যকর নকল মামলা

শুধু কুদঘাট, ইস্টার্ন বাইপাস কিংবা লেকগার্ডেন্সেই নয় কলকাতার অভিজাত অঞ্চলেও জমি-বাড়ির মালিকানা বদল করতে রুজু হচ্ছে 'নকল মামলা'। কিভাবে এই সমস্ত বেআইনী মালিকরা আইনীসিলমোহর পেয়ে যাচ্ছে? আইনজ্ঞ ও প্রাক্তন এম·পি·শক্তি সরকার কি করে বেআইনী মৌরুসীপাট্টার শিকার হলেন? স্বনামধন্য টালিগঞ্জ ক্লাব ও গল্ফ ক্লাব জমি জবরদখল করে আছে? জমিজিরেৎ নিয়ে এইসব 'নকল মামলা' কিভাবে চলে? সমাজের উচ্চতর ক্ষেত্রে নজর এড়ানো হোয়াইট কলার ক্রাইম নিয়ে নতুনতম আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমায় বলেছিলেন—মানুষের আদি উল্লাস কী জানেন শ্যামলবাবু? নরহত্যা! নরহত্যা!

পঁচাশির কাছে বয়স। দুধসাদা কোঁকড়া চুল। টিকালো নাক। শীতের সকালে মিনিবাসের বিভীষিকাময় ট্রামরাস্তা দিয়ে নিজের মনে ধীরে সুস্থে সাইকেল চালিয়ে গড়িয়া থেকে হরিশ মুখার্জী রোডে যান-যান ফার্ন রোডে—মাথায় ঠাণ্ডার ভয়ে প্যাচানো থাকে চাদর। তাঁর সরু সাইকেল টায়ারের পেছনে বিশাল টায়ার দোতলা ট্রলি বাস পথ না পেয়ে ফোঁস ফোঁস করে। শিবপ্রসাদ কিছুই শুনতে পান না। চাপাও পড়েন না।

আরেকদিন শিবদা বললেন, যে ট্যাঁড়স, টমেটো, কলা, ফুলকপি খাচ্ছেন—তার সব ক'টির বুনো-ভ্যারাইটিও আছে।

কি রকম?

বনে আম, জাম, ট্যাঁড়স, কাঁঠাল—সবই আপনা আপনি জন্মায়। ওগুলো যদি আমি আপনি খাই তো পাগল হয়ে যাবো। আমি আপনি যেসব আম জাম কাঁঠাল খাচ্ছি—এসবই মানুষের হাতে পড়ে কয়েক বার জন্মে সংস্কৃত হয়েছে। তাই খেয়ে আমরা পাগল হইনি। ভাল আছি। যদি বুনো আম খেতাম তো দেখতে হত না।

টালিগঞ্জ ক্লাব

বুনো ফল সভ্য হয় কি করে?

আপনা আপনি জন্মে। তাদের পরাগে বাতাসে ভেসে আসা অন্য রেণু লেগে বুনো ফল-ফলাদির দোষ কেটে গিয়ে নিরাপদ আম কাঁঠাল চ্যাঁড়স জন্মায়। তাই আমরা খাই।

ফলের বুনো ভ্যারাইটি আমায় অনেক ভাবিয়েছিল। মানুষের বেশির ভাগই তো বুনো ভ্যারাইটি। অন্য চিন্তা—অন্য ভাবনার রেণু কতটাই বা আলাপ আলোচনায় ভেসে এসে বেশির ভাগ মানুষের চিন্তাভাবনায় মেশে?

শিবদা বেটে আমগাছের সঙ্গে লম্বা আমগাছের মিলন ঘটিয়েছেন। ইটালির ফুলকফির সঙ্গে বাংলার ফুলকফি মিলিয়ে ইটকফি তৈরি করেছেন। খেয়েছি। খুবই ভাল।

মানুষের বেশির ভাগই আজও বুনো। ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র—যতই মানুষের ওপর চুনকাম করুক না কেন—বেশির ভাগ মানুষের গা চুলকোলেই দেখা যাবে—মানুষের আদি উল্লাস বেরিয়ে পড়েছে। মানুষকে নিধনের জন্যে মানুষের উল্লাস।

এই নিধনের ঝোঁক কোত্থেকে আসে মানুষে? দখলের জেদ থেকে।

মানুষ কি দখল করতে চায়? কি দখলে রাখতে চায়—?

মানুষ দখল করতে চায় নারী। মানুষ দখলে রাখতে চায় রক্ত। অনেক আগে সে রক্ত চেটে খেতো। আর সে দখল করতে চায়—জমি। সারাটা পৃথিবীর ইতিহাস আজও নারী, রক্ত আর জমিকে দখলে রাখার প্রাণপণ আয়োজনকে ঘিরে গড়ে উঠছে।

মানুষ দখল করতে চায় নারী। মানুষ দখলে রাখতে চায় রক্ত। অনেক আগে সে রক্ত চেটে খেতো। আর সে দখল করতে চায়-জমি। সারাটা পৃথিবীর ইতিহাস আজও নারী, রক্ত আর জমিকে দখলে রাখার প্রাণপণ আয়োজনকে ঘিরে গড়ে উঠছে।

রক্ত মানুষ দখলে রাখতে পারে নি। বারবার তাতে অন্য রক্তের স্রোত মিশেছে। অনভিপ্রেত স্রোতই বেশি। নারীই বা পারলো কোথায়! পারলে—মহাযুদ্ধ বা মহাকাব্য—কোনটাই লেখা হত না। আর জমি?

সে কথায় আসছি এবারে।

মানুষ আটঘাট বেঁধে দলিল করে। পাছে জমি হাত বদলায় সহজে। আসলে কিন্তু মানুষই জায়গা বদলায়। জায়গা-জায়গায় থাকে।

মানুষের এই আদি উল্লাস—জমির জন্য মানুষের এই আদিম স্পৃহার লোভ আর আর্তির গলিখুঁজি ধরে এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে। এই খেলায় যার আদত কোন দখলই নেই—সে দখল নেয়। দখল দেয়। মুদ্রার বদলে।

তার আগে বলা দরকার—কি ভাবে সবচেয়ে সহজে এই কলকাতায় জমি পাওয়া যায়। বাড়ি পাওয়া যায়। নিখরচায়। নিরাপদে।

গড়িয়া থেকে ডানলপ—বাইপাস থেকে বেহালা—কোথাও এখন মাথা খুঁড়লেও এক কাঠা জমি পাওয়া কঠিন। পাওয়া যাবে না কেন? তিন চার লাখ টাকা থেকে কমসে কম এক লাখ টাকা কাঠায় গলি—ঘুঁজিতে জায়গা পাওয়া যায়। এক কাঠার দাম লাখ সওয়া লাখ।

এইসব জায়গা কিনে কারা বাড়ি করতে পারে। যারা লটারি পায়। যারা কোলে মার্কেটে আলুর কারবারি। কিংবা যারা ব্যাংকে দাদন দেবার কর্তা

আবার স্বনির্ভর হয়েছে মাঝি পরিবার

লক্ষ্মণ মাঝির বিধবা স্ত্রী কমলা দেবী সর্পাঘাতে স্বামীর মৃত্যুর পর ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স এর সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাবদ পেয়েছেন এককালীন ৩০০০ টাকা। গাই-গরু কিনে সেই টাকায় আবার তিনি আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

যে কোন সময়েই ঘটতে পারে প্রাণঘাতী একটি দুর্ঘটনা। আগুন, বিদ্যুৎ, জলে ডোবা, বাড়ী ভেঙেগ্ পড়া, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘুর্ণিঝড়, পশু, বা পোকামাকড়ের কামড়, বিষক্রিয়া, আত্মহত্যা, খুন, রেল বা পথ দুর্ঘটনায় সংসারকে অকূলে ভাসিয়ে মারা যেতে পারেন গ্রীব পরিবারের উপার্জনশীল মানুষটি। সহায় সম্বলহীন হতভাগ্য পরিবারটিকে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী। পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১১ টি রাজ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় তাঁরা রূপ দিচ্ছেন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প'র।

মৃত ব্যক্তির বয়স যদি ১৮-৫৫ এর মধ্যে হয় ও পরিবারের মোট বাৎসরিক আয় যদি ৫০০০ টাকার নীচে হয়, তবে এই প্রকল্প দ্বারা মৃতের পরিবার উপকৃত হবেন।

দুর্ঘটনার ৯০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বিডিওকে জানান, তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাবদ পরিবারটিকে দেবেন এককালীন ৩০০০ টাকা।

এই অনুদান যথাযথ কাজে লাগান।

সহজেই পাওয়া যায় এই অনুদান, কোন প্রিমিয়াম না দিয়েই।

ASP/NIC-1/87 BEN

হিসেবে উপরি পায়–তারা পারে। আর পারে লোহার কারবারি। বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। লঙ্কার কারবারি। কিংবা কোন কোম্পানী।

কিন্তু আমার আপনার মত গেরস্থ? না, আমরা পারি না।

তাহলে আর কারা পারে?

যারা সুন্দরবনে বানভাসীর দরুন কলকাতায় ভেসে আসে–তারা পারে। যারা দ্বারভাঙায় খেতে পেতো না–তারা পারে। কারণ, তারা কলকাতায় এসেই মানিকতলা মেন রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, গালিফ স্ট্রীটের গায়ে প্ল্যাস্টিকের ছাদ দিয়ে ঝুপড়ি তুলে ফেলে। তারা রাতারাতি রেশন কার্ড পেয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলে গণতন্ত্রের গোকুলে একচাপে বাড়তে থাকে। ভোটও দেয় তারা একচাপে। কে ঘাঁটাবে তাদের!

তারপর রাস্তা পরিষ্কার করতে–কিংবা নতুন রাস্তা বের করতে তাদের উচ্ছেদের কথা উঠলেই পুনর্বাসনের কথা এসে যায়। তখন শহর কলকাতার ফাঁকে-ফোকরে অতি দামী জায়গায় টেনামেন্ট ওঠে। ফ্ল্যাটবাড়ি, জলের ট্যাংক, রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো লাগানো নতুন বসতিতে নিয়ে গিয়ে তাদের তোলা হয় প্রায় পায়ে ধরে। মন্ত্রী থাকেন। থাকে পুলিশ ভ্যান। এম এল এ। টাকা আসে কেন্দ্র আর রাজ্য থেকে।

এখন কলকাতায় বাড়ি ঘর পাওয়ার নিখরচা রাস্তা এটাই। চলে আসুন গল্ফ ক্লাবের গায়ে। চলে আসুন লেক গার্ডেন্সে। ঠিক এফ সি আইয়ের গুদামের গায়ে এদের ঘরবাড়ি দেখুন। অনেকেই অবশ্য ওখান থেকে উঠে যাচ্ছেন। মোটা টাকা সেলামী নিয়ে ওরা আবার রাস্তায় ঘর বাঁধছে। কিংবা গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা যাবে–টালিগঞ্জ ফাঁড়ির মুখে–পাতাল রেলের ক্ষতিপূরণের টাকায় ওদের জন্যে পাঁচতলা বাড়ি হয়েছে। প্রায় কেউ সেখানে থাকে না। টাকা দিয়ে অন্যরা সেসব ফ্ল্যাট পেয়েছে। এখানে জমির দাম–কাঠা অন্তত তিনলক্ষ টাকা। এরা সবাই ছিল নিকারিপাড়া বস্তিতে। সে বস্তির লোকজন কোন দুঃখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটে থাকবে!

১৯৩৬ সনে সোনার ভরি পঁয়ত্রিশ টাকা। গড়িয়াহাটের মোড়ে জমির কাঠা ছিল তখন পঁয়ত্রিশ টাকা। পুরনো কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলেই জানা যায়। এখানে জায়গা এখন সোনার চেয়েও দামী। এর চেয়েও দামী জায়গা লালবাজারের ফুটপাথে যেখানে পুরনো পুরনো সব পাঁচতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে। ওখানে একবার বাঈজীদের গান শুনতে গিয়ে বাড়ির মালিকের খোঁজ করেছিলাম। শুনলাম মল্লিকরা মালিক। পর পর ছ'খানা বাড়ি মিলিয়ে ভাড়া এগারোশো। ওরা ভাড়া নিতে আসেন না তিরিশ বছর। ভাড়াটেরাই বাড়ি সারায়। ট্যাক্স দেয়।

দেখা যাচ্ছে–এই কলকাতাতেই অমূল্য জায়গায় বাড়ি থাকলেও ভাড়া নেয় না মালিক। আবার ও পাড়াতেই এখন নতুন মালিক এসেছে; যে
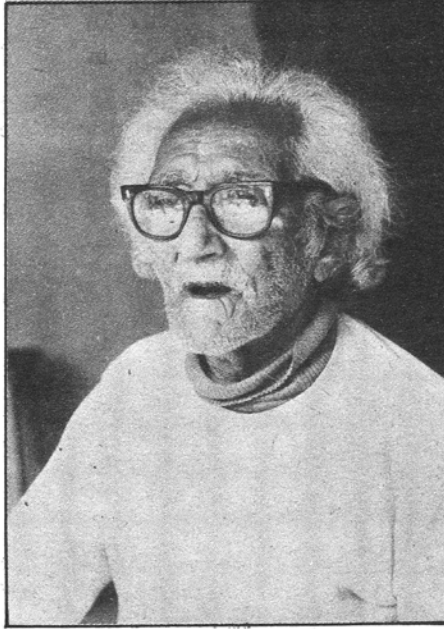
উদ্ভিদবিজ্ঞানী **শিব বন্দ্যোপাধ্যায়**

দিনে পুরনো বাড়ি ভেঙে রাতে মিস্ত্রি দিয়ে ঘর তোলে–ছাদ ঢালাই করে। ভোরে সেই মিস্ত্রি মজুর গ্রেফতার হলে মালিকের পোষা উকিল দুপুরবেলা তাদের জামিনে ছাড়িয়ে আনে।

সত্যিই কলকাতা কমলালয়।

নইলে এখানে যে আদৌ মালিক নয়–সে কী করে নানান নথিপত্র তৈরি করে আদালতের কাঠগড়ায় আইনের প্রয়োজন মিটিয়ে সাজানো মামলা আপসে লড়ে মালিক হয়ে যায়?

কথাটা শুনতে খটকা লাগে। কিন্তু সত্যি। যে মালিক নয়–সেও মালিক হয়ে যাচ্ছে। বেআইনীভাবে নয়। রীতিমত আইন মাফিক।

১৯৩৬ সনে সোনার ভরি পঁয়ত্রিশ টাকা। গড়িয়াহাটের মোড়ে জমির কাঠা ছিল তখন পঁয়ত্রিশ টাকা। পুরনো কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলেই জানা যায়। এখানে জায়গা এখন সোনার চেয়েও দামী। এর চেয়েও দামী জায়গা লালবাজারের ফুটপাথে, যেখানে পুরনো পুরনো সব পাঁচতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে।

এমন একটা বেআইনী ব্যাপার কী করে আইনী সিলমোহর পায়?

যদি ব্যাপারটা দেখতে চান তো চলে আসুন কুদঘাটে। কিংবা যাই চলুন ইস্টার্ন বাইপাসে।

তারই বা কী দরকার। কলকাতার বুকের ওপর হাজার হাজার বিঘার দামী জমির মালিক হয়ে বসে আছে দু'টি ক্লাব–যারা ইজারা অনুযায়ী মালিকানার সময় পেরিয়েও এখনও মালিক।

কিরকম?

১৮২৯ আর ১৮৩৩-এ কলকাতার দুটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। একটি টালিগঞ্জ ক্লাব। অন্যটি গল্ফ ক্লাব। যারা শত বছরের জন্যে ইজারা দিয়েছিলেন–তারা কবে মরে গিয়েছেন। তাদের বংশধারা লতায় পাতায় এখন এক এক গুষ্ঠী। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বংশধররা কোনদিনই একত্র হতে পারবে না। তারা অনেকেই জানেও না–তাদের দাবির জায়গা লিজ পিরিয়ড পার করে দিয়েও ক্লাব দুটি সে জমিতে গ্যাট হয়ে বসে আছে। অথচ তারা ওখানকার মালিকই নয়। লিজ রিনিউ হয়নি। দিব্যি কলকাতার ধনী সম্পন্নরা ওখানে গিয়ে গল্ফ খেলছেন–সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে–হচ্ছে মেড ফর ইচ আদার কম্পিটিশন।

ব্যাপারটা প্রথম আমার চোখে আনেন–জনতা আমলের এম পি আইনজ্ঞ শ্রী শক্তি সরকার। তিনি এক সন্ধ্যায় এই ক্লাবের দিকে তাকিয়ে বললেন জানেন–এসব জমি আমাদের।

কিরকম?

আমাদের কর্তারা লিজ দিয়ে গেছেন। লিজের একশো বছর মেয়াদ কবে ফুরিয়ে গেছে। অথচ এখনও ওরা বসে আছে। দিব্যি ক্লাব চলছে।

এত দামী জমি। লিজ রিনিউ হয়নি?

না। কে রিনিউ করবে? একশো বছরে ফ্যামিলি বাড়তে বাড়তে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারপরেও তো পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে।

এই পঞ্চাশ বছরে আপনারা একবারও দাবি করেননি?

করবো কি করে? এক জ্ঞাতি হয়তো আমেরিকায় সেটেল করেছে। আরেক জ্ঞাতি হয়তো হিমালয়ের গুহায় ঢুকে সাধু হয়ে বসে আছেন। কোন জ্যাঠার নাতি বিয়ে করে ঘরজামাই। জানি না–আমাদের কি আছে? কি নেই? কে এতগুলো লোককে জড়ো করে হাইকোর্টে নালিশ ঠুকবে?

তাও তো বটে!–ব্যাপারটা সত্যিই কঠিন। অথচ সম্পত্তির দাম এখনকার বাজারে না হোক তিনশো কোটি টাকা দামের তো হবেই।

শক্তিবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন, তা তো হবেই।

কাগজপত্তর আছে?

কিছু আছে আমার কাছে। বাকিটা কার কাছে আছে জানি না। কিম্বা এই দেড়শো বছরে হারিয়েও যেতে পারে। তখন তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি–এদিকটায় পাতাল রেল হবে।

ধরুন শ্রীমতী শেফালী ঘোষের স্বামী কুদঘাটে ১৯৪০ সনে পঞ্চাশ টাকা কাঠা জমি কেনেন ১৬ কাঠা ৮০০ টাকায়। ১৯৮৭ সনে তিনি তিন ছেলের মা। ছেলেরা সবাই বিদেশে। কেউ কোনদিন ফিরবে না। তারা ভবানীপুরের বাড়িতে মা শেফালী ঘোষকে মাসে মাসে ডলার পাউণ্ড পাঠায়। আর কুদঘাটের সেই ১৬ কাঠায় এক কয়লার দোকানী গোলা বানিয়ে মাসে মাসে তেইশ টাকা দিয়ে আসে ভবানীপুরে শেফালী ঘোষের হাতে। বুড়ি এখন চোখে কম দেখেন। ১৯৪৭ সন থেকে জায়গার ভাড়া পান তেইশ টাকা। যে ভাড়া নিয়েছিল—সেই লক্ষ্মণ সিং বেঁচে নেই। তার বড় ছেলে ভরত সিং এসে ভাড়াটা দিয়ে যায়।

ভরত ভাড়ার জায়গায় পাকা ঘর তুলেছে। ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। টিউবয়েল বসিয়েছে। সব সময় ২ লরি কয়লা মজুত রাখার মত বড় গোলা তার।

এবার ১৯৮৬ সালে পর্দা উঠলো।

কুদঘাটে প্রোমোটার অসীম দত্তকে এনে জায়গাটা দেখালো মিহিরদা। ইনি পাড়ার দাদা। অসীমের জায়গা পছন্দ। আশিটা পর্যন্ত ফ্ল্যাট উঠতে পারে। জায়গার দাম পড়বে ৩২ লক্ষ টাকা।

মিহিরদা বলল, জায়গা আমি করে দিচ্ছি। মাস ছয়েক সময় দিন।

আমারও ৩২ লাখ টাকা জোগাড়ের জন্য ফ্ল্যাটের প্রার্থীদের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিতে হবে।

অত অ্যাডভান্সে এখুনি যাবার দরকার নেই। আপনি বিশ হাজার টাকা ছাড়ুন তো এখন।

বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি মিহির। কিন্তু দেখো—টাকাটা যেন মার না যায়।

কে মারবে? ব্যাপার তো আপনার আর আমার ভেতর।

বেশ তো। তুমি সব সরল করে ফেল।

সরল করবো বলেই তো টাকাটা নিচ্ছি।

বেশ বেশ।

এরপর কয়লার দোকানী ভরত সিং আর মিহিরদার দীর্ঘ সিটিং চললো। সিটিংয়ের পর ভরত বলল, বুড়ির কী হোবে মিহিরদা?

সে ভাবনা তো আমার।

শেষে যদি হাজতে যাই?

কি করে যাবি! এই মিহিরদা আছে না। কবে বুড়ির স্বামী এ জায়গা কিনেছিল—সবাই ভুলে মেরে দিয়েছে। তখনকার লোকজন কেউ আর বেঁচে নেই।

দলিল?

আলিপুরে গিয়ে দলিলের রেকর্ডের পাতা ক'খানা হাপিস করাবো।

আরও উঁচু জায়গায় তো কপি আছে দলিলের।

সে তো বুড়ির কাছেও অরজিনাল দলিল আছে। আসল কথা হচ্ছে—তুই আরও তিন বছর ভাড়া দিয়ে যাবি। এদিকে যা করবার আমি করবো। তুই তো ফোকটে তিন লাখ টাকার একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছিস।

পাবো তো মিহিরদা?

আলবৎ পাবি। তবে এখন আমার সঙ্গে আপসে মামলা লড়বি।

মামলা শুরু হল আলিপুরে। ভরত সিং বনাম মিহির। একখানা নকল ওকালৎনামা দেখালো মিহির কোর্টে। শেফালি ঘোষের দেওয়া ওকালৎনামা। মামলা উচ্ছেদের। ভরত উচ্ছেদ হল ছ'মাস পরে। প্রকাশ্যে কয়লার গোলা ভেঙে দিল মিহির থানা থেকে পুলিশ এনে। কোর্টের অর্ডার থাকলে টাকা জমা দিলে পুলিশ আসে।

এবার মিহির লরি ইঁট ফেলে জমির চারদিকে দেওয়াল দিল। সবাই জানলো, মস্তানী করে মিহিরের পয়সা হয়েছে। তাই জমিটা কিনেছে।

বাড়িও উঠলো। সাতাত্তরটা ফ্ল্যাট। আটতলা বাড়ি। নিচে গ্যারেজ, কো অপ স্টোস। ওপরে ফ্ল্যাটের মালিকরা। ছাদে অ্যান্টেনার জঙ্গল।

ওদিকে একটা বুড়ি শেফালি ঘোষ মাসে মাসে ভরতের কাছ থেকে তেইশ টাকা করে ভাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। ছেলেরা চিঠি লেখে—মা এবার তুমি চলিয়া এসো। ওখানে একা কি করিবা? এখানে নাতি নাতনীর সঙ্গে তোমার সময় ভালই কাটিয়া যাইবে।

মিহিরের ভাগ্য ভাল। বুড়ি একদিন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে উঠে বসলো। দিল্লি—তেহেরান—ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে লণ্ডন। হিথ্রোতে বড় বউমা এসে রিসিভ করলো।

যেখানে বুড়ি ওঠে না বিমানে? সেখানে কি হয়?

বুড়ি উকিল ডাকায়। উকিল মামলা সাজাতে সাজাতেই কাগজের কপি নিতে নিতে ছত্রিশ হাজার টাকা ফরসা। ছেলেরা বিলেতে বসে মায়ের চিঠি পায়। সামনে সমূহ বিপদ। তোমাদের বাবার কেনা জায়গা বেহাত। টাকা পাঠাও। মামলা।

ছেলেরা কিছুকাল পাঠায়। তারপর টাকা আসে না। আসে চিঠি; মা আমরা ভাবিয়া দেখিলাম—মামলায় কাজ নেই। তুমি মামলাটি বেচিয়া দিয়া চলিয়া এসো।

ও মামলা কে কিনবে! কেননা—সব মামলাতেই কথা একটি। দখল কার? জমি জায়গা কাগজেরও নয়—টাকারও নয়। দাপটের। ওরফে দখলের।

আর যেখানে মামলা চালায় ফ্যামিলি উকিল? সেখানে তিনি নিশ্চয় পরামর্শ দেবেন—কতদিন মামলা লড়বেন মা! আপনার বয়সে কুলোবে না। তার চেয়ে মিউচিয়ালই ভাল।

মিহিরদা হাওয়া। ফ্ল্যাট মালিকরা আর প্রোমোটার মিলে লাখ দুয়েকে মিউচুয়াল করে নেয়। মাথা পিছু বোঝাটা ভাগ করে।

মিহিরদা কোথায়।

তিনি নগদ পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আসানসোলে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা ফেঁদেছেন। আসবেন কি! নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। বেশি বয়সে বিয়ে। ফ্যামিলি নিয়েও ব্যস্ত।

এইভাবে না—মালিক মালিক সেজে আপসে মামলা লড়ে অন্যের জায়গা হামেশা দেওয়াল দিয়ে ঘিরছে। কোর্টের অর্ডার দেখিয়ে করপোরেশনে গিয়ে ট্যাক্স জমা দিয়ে এসে রসিদখানা ফটো করে বাঁধিয়ে রাখছে। সে ফটো জমি কেনাবেচার ঘরের দেওয়ালে সব সময় টানানো থাকে।

এই করে বাড়ি উঠেছে লেক রোডে। কুদঘাটে। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে। ডানলপে। আরও কোথায় কোথায় উঠছে—যা উঠেছে তা ভাল করে বলতে পারবেন করপোরেশন, ব্যাংকশাল কোর্ট, আলিপুর, হাইকোর্ট, বার লাইব্রেরি।

রেজা খাঁয়ের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের মামলা টেকে নি। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জমির দলিল জাল করার মামলা হেস্টিংস ফাঁসিকাঠ অব্দি ঠেলে তোলেন। অবশ্য হেস্টিংসের মামলাটাই নাকি ছিল জাল!

এখন বেআইনী চোদ্দতলা ভাঙার আদেশ হাইকোর্টে দিলেও ভাঙাভাঙি আটকে যায়। সুপ্রীম কোর্ট থেকে বাড়িওয়ালা কী এক আদেশ নিয়ে আসে।

সেখানে সূক্ষ্ম জালিয়াৎ, প্রবল ঝুঁকিবাজ মস্তান তো একাজ করে পার পেয়ে যাবেই।

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

এইভাবে না-মালিক মালিক সেজে আপসে মামলা লড়ে অন্যের জায়গা হামেশা দেওয়াল দিয়ে ঘিরছে। কোর্টের অর্ডার দেখিয়ে করপোরেশনে গিয়ে ট্যাকস জমা দিয়ে এসে রসিদখানা ফটো করে বাঁধিয়ে রাখছে। সে ফটো জমি কেনাবেচার ঘরের দেওয়ালে সব সময় টানানো থাকে।

চার্লস শোভরাজকে তিহার জেল থেকে বের করে আনার প্ল্যান, রাজ বব্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তাঁকে অপহরণের চেষ্টা, অমিতাভ বচ্চনকে অপহরণের পরিকল্পনা, লক্ষ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ আদায়, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রিয় রাজনীতি-বিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, এই সব ঘটনার নায়ক যে লোকটি, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সেই অপরাধ-চূড়ামণি অবশেষে নিহত। উত্তর-

রাজু ভাটনগর : এক কুখ্যাত অপরাধীর জীবনান্ত

প্রদেশের তিন শহরের পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণে প্রকাশ্য দিবালোকে শেষ হয়ে যায় এই অন্ধকারজগতের কুখ্যাত সন্ত্রাস। সুশিক্ষিত, সুদর্শন আর অতিমাত্রায় স্মার্ট এক যুবক, গত এক দশক ধরে ছিল সর্বভারতীয় পুলিশমহলের ত্রাস। ধরা কিন্তু পড়েছিল মাত্র একবার, দিল্লিতে। তিহার জেলের কঠিনতম সুরক্ষাবেষ্টনীও তাকে আটকে রাখতে পারেনি। নিজে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে মুক্ত করে চার্লস শোভরাজ আর তার সহযোগীদেরও। আর এই তিহারেই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ সুনীতার। সুনীতা ক্রমে হয়েছিল তার প্রেমিকা থেকে স্ত্রী।

রাজু ভাটনগরের অপরাধ-কৌশলের প্রধানতম অস্ত্র ছিল তার আকর্ষণীয় চেহারা আর মোহক ব্যক্তিত্ব। দলের সহযোগীরাও ছিল শিক্ষিত তরুণেরা। তার অপরাধ-কৌশলের সবচেয়ে পরিচিত ব্যাপারটি ছিল মুক্তিপণ আদায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, অপহৃতরা বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারত না

জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক

রাজু ভাটনগর
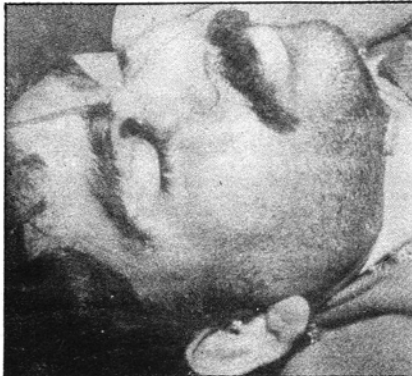
শিক্ষিত সুদর্শন তরুণদের নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দল গড়ে তুলেছিল সে। অপহরণ মারফৎ লক্ষ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ আদায় করেছে। তিহার জেল থেকে উধাও করেছে শোভরাজকে। পুলিশকে এড়িয়ে এড়িয়ে অবশেষে শেষ হল তার জীবননাট্য শোচনীয়ভাবে।

কে তাদের অপহরণ করেছে। কারণ রাজুর অপহরণের কৌশল-টিই ছিল প্রথমে ব্যক্তিত্ব দিয়ে মুগ্ধ করে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, তারপর সহযোগীদের দিয়ে অপহরণ করানো।

এই পর্যায়ে তার হাতেখড়ি কানপুরের ডাঃ মিনি জালোটার অপহরণ দিয়ে। ডাঃ মিনি জালোটা, কানপুরের এই প্রভাবশালী মহিলা ডাক্তার, পুলিশ না জানানোর আগে বুঝতেই পারেননি—সেই সুদর্শন যুবকই রয়েছে তার অপহরণের পেছনে।

উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর জেলার রাঠ তহশীলের ছোট্ট একটা গ্রাম বধৌলিয়া। রাজুর জন্ম সেখানেই। বাবা রামকৃষ্ণ ভাটনগর।

পড়াশুনোয় রাজু বরাবরই ভাল। রাঠ থেকে সে স্কুলের পড়া শেষ করে দাতিয়াতে আসে উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু এখানেই তার ভাগ্যচক্র অন্যদিকে ঘুরে যায়। অপরাধজগতের সঙ্গে তার যোগা-যোগের সূত্রপাত ঘটে এখানেই। ইতিমধ্যে সে অবশ্য ইন্টার (উচ্চ মাধ্যমিক) পাশ করে যায়। নম্বর ছিল ভাল। বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়ে যায় সে।

দাতিয়ার সন্নিহিত এলাকাগুলি তখন সুরেশ সোনীর নামে কাঁপত। সুরেশ কিন্তু ছিল শিক্ষিত, আইনের ডিগ্রীধারী। তার দলের সদস্যরাও ছিল পড়াশুনো জানা তরুণেরা।

১৯৭৬ সাল ছিল রাজু ভাটনগরের বি এস সি ক্লাসের শেষ বছর। সুরেশ সোনীর সঙ্গে তার এসময় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সুরেশ সোনী সে সময় জেল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। বি এস সি পরীক্ষা দেওয়ার পর রাজুও সুরেশের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই দলের কোড নম্বর মধ্যপ্রদেশ আর উত্তরপ্রদেশের পুলিশের খাতায় ছিল 'সী—১৬'। ১৬ জন শিক্ষিত তরুণের এক দল। সুরেশ সোনী মূলতঃ লুঠপাটই করত। ১৯৭৩—এ কুলপাহাড়ের এস এস পি কে হত্যা করে সে বড়সড় অপরাধে হাত পাকায়।

১৯৭৭ সালে সুরেশ সোনী ধরা পড়ে কানপুরে। এর পর থেকেই রাজু নিজে নেতৃত্বের দিকে এগোনো শুরু করে। সোনী জেলে থাকায় ধীরে ধীরে সে নেতৃত্ব দখল করে নেয়।

এস এস সিং, লখনউয়ের এস·পি·

সুনীতা, রাজুর স্ত্রী
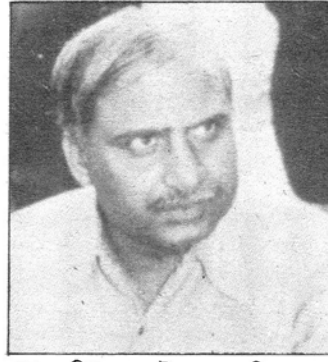
কলেজ ছাত্রদের জুটিয়ে গুণ্ডামি করা, সুরেশ সোনীর লোকজনদের নিয়ে লুঠপাট—এসব ছোটখাট ব্যাপারের দিন বদলে গেল এবার। তার কার্যপদ্ধতি গেল বদলে। এবার সে মূলতঃ অপহরণের দিকটিই বেছে নিতে থাকে। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়।

কানপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র কৃপারাম গুপ্তকে অপহরণ করে, দশহাজার টাকার মুক্তিপণ আদায় করে নতুন পথে এগোয় রাজু। কানপুর ডি এ ভি কলেজের ছাত্র মনোজ কুমার আগরওয়ালকে অপহরণ করে আদায় হয় ২৫ হাজার টাকা। পুলিশ তার টিকিটিও ছুঁতে পারে না।

এরপরই সে যে অপহরণের ঘটনাটি ঘটায় সেটি ডাক্তার মিনি জালোটার অপহরণ। সংবাদশীর্ষে তার নাম আসা শুরু হয় এই ঘটনার পর থেকেই। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ রেকর্ডে এই ঘটনাটিকে এ—২৮১-এই বিশেষ কোড নম্বর দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮—এর ঘটনা এটি। রাজু জানতো যে ডাক্তার মিনি জালোটার ড্রাইভার কোনও সময়ে সোনীর গাড়ি চালাত। সে ড্রাইভারটিকে বেশ মোটা রকমের ঘুষের টোপ গেলায়। ড্রাইভারের সাহায্যে রাজুর দল অপহরণ করে মিনি জালোটাকে। এক মাস পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখে তারা। এক লক্ষ টাকার মুক্তিপণ চাওয়া হয়। ডাঃ জালোটা কানপুরের প্রখ্যাতা মহিলা ডাক্তার। একমাস ধরে কানপুর ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য সংবাদপত্রে ছাপা হয় ঘটনাটি। রাজুর নাম বিখ্যাত হয়ে পড়ে। টাকাটা সে আদায় করে, এরপর ডাঃ মিনি জালোটাকে ছেড়ে দেয়। তারপর কানপুর থেকে উধাও হয়। পুলিশ তার কোনও সন্ধানই পায় না।

এরপর রাজু তার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয় গোয়ালিয়রকে। এখানে সে অপহরণ করে মোহন আর রাজকুমার নামের দুই ভাইকে। আদায় হয় ২০ হাজার টাকা। গোয়ালিয়র পুলিশের মুখে যেন কালি লেপে দেয় এই ঘটনা। রাজু কিন্তু এই ঘটনার পরই গোয়ালিয়র ছেড়ে চম্পট দেয়। এরপর সে ঝাঁসির কাছে জালৌন—এ এসে অপহরণ করে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামসুন্দর পুরওয়ারকে। তার মুক্তির দাবিতে স্থানীয় এলাকায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। উত্তরপ্রদেশের তৎ-কালীন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং—কেও পড়তে হয় প্রচণ্ডতর বিক্ষোভের মুখে। রাজু কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল না, এরই মধ্যে অপহরণ করেছিল জ্ঞান সিং নামের জনৈক ব্যক্তিকে। পুলিশ কোনও ক্ষেত্রেই সফল হয় না রাজুকে ধরতে। রাজু কিন্তু দুটি ক্ষেত্র থেকেই ৫০ হাজার টাকা করে নিয়ে অপহৃতদের মুক্তি দেয়।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সম্মানে প্রচণ্ডতর আঘাত লাগে। রাজনৈতিক মহল থেকেও চাপ আসতে থাকে রাজু ও তার দলকে গ্রেফতার করবার। রাজু উত্তরপ্রদেশকে আর নিরাপদ মনে করে না। সে দিল্লিকে এরপর তার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়।

দিল্লিতে গিয়েই সে একটা গাড়ি কেনে। দিল্লিতে তার পরিচয় হয় ব্রজমোহন গুপ্ত—র সঙ্গে। ব্রজমোহন বেশ বড়মাপের ব্যবসায়ী। রাজু লোকের সঙ্গে মিশতে পারত আশ্চর্যভাবে। তার কথাবার্তায় সপ্রতিভ ভাব, জীবনযাপনের বিলাসিতা এসব সহজেই তাকে ব্রজমোহনের আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। ব্রজমোহন তাকে কোনও প্রভাবশালী পরিবারের বলে ধরে নেয়। রাজু শুরু থেকে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল। দিল্লিতে এসে তার রাজনৈতিক পরিচিতির বহর আরও বাড়ে। ব্রজমোহন রাজুর এই রাজনৈতিক প্রভাব দেখে তার প্রতি বেশি করে আকৃষ্ট হয়। রাজু ব্রজমোহনকে বলে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং—এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁকে বলে সে মধ্যপ্রদেশের যে জেলায় চাই সেই জেলার রান্নার গ্যাসের হোলসেল ডিলারশিপ ব্রজমোহনকে পাইয়ে দেবে। ব্রজমোহন যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে ওঠে।

হঠাৎই একদিন এসে সে ব্রজমোহনকে বলে, 'চলো মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং দিল্লিতে আছেন এখন। তোমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।' রাজুর সঙ্গে ব্রজমোহন রাজুরই গাড়িতে করে রওনা হয়। গাড়িতে আরও এক যুবক বসে ছিল। রাজু জানায় সে তার বন্ধু বিজয়। ইণ্ডিয়া গেটের কাছে আসতেই পেছনের সিটে বসা যুবকটি ব্রজ-মোহনের মুখে একটা ক্লোরোফর্মে ডোবানো রুমাল চেপে ধরে। তারপর তাকে নিয়ে যায় এক গোপন ডেরায়।

পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও রাজু বা তার দলের কোনও খোঁজ পায় না। ১৫০ দিন পর্যন্ত ব্রজমোহন গুপ্তকে আটকে রাখে রাজুর দল। ২ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ চেয়েছিল তারা। আদায় হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ৩০ মে ১৯৮১ ব্রজমোহনকে তারা ছেড়ে দেয়। পরে জানা যায় দিল্লির ইস্ট অফ কৈলাসের এক ফ্ল্যাটে ৫০ দিন পর্যন্ত আটকে রাখে তারা ব্রজমোহনকে। ফ্ল্যাটটি মাস তিনেক আগে ১৪০০ টাকা ভাড়ায় নিয়েছিল রাজু।

এই ফ্ল্যাটটির সূত্র ধরেই ১০ জুন পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় রাজু ভাটনগরকে। তার নতুন কেনা ফিয়াট কার সহ। রাজুকে এতদিন যারা রাজনৈতিক আশ্রয় দিচ্ছিলেন, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন

৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

আপনার কেয়ো-কার্পিন চুলের এই স্টাইল দেখে কেউ চোখ ফেরাতে পারবেন না

শিখে নিন কি করে এই স্টাইলে চুল বাঁধবেন :

মাঝখানে সিঁথি কাটুন। রঙীন ফিতে দিয়ে দু'ধারে দু'টি পোনিটেল করুন।

দু'টি পোনিটেলই দু'ভাগে ভাগ করুন। এক ভাগ যেন অন্য ভাগের চেয়ে একটু মোটা হয়।

মাথার দু'ধারে পোনিটেলের মোটা ভাগটি দিয়ে দুটি গোল খোঁপা করুন। পিন দিয়ে লাগান।

পোনিটেলের সরু ভাগটিতে রঙীন ফিতেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে নিন। এবার ফিতে শুদ্ধ চুল গোল খোঁপার চারধারে ঘুরিয়ে আটকান।

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করুন কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না।

এবার আপনি যেমন খুশী চুল বাঁধুন, আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাবে।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's® দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

DMHO-15

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি ধর্মবিতর্কের আড়ালে আসল তথ্য কি ?

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

হিন্দু মৌলবাদীদের সমাবেশ!

মন্দির না মসজিদ?

রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছে, সেই বিতর্কের মূলসূত্রটি একটি প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রচলিত বিশ্বাস হল, মোগলরা যখন এদেশ জয় করে তখন অযোধ্যায় বাদশারা তিনটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এই মন্দিরগুলি হল জন্মস্থান মন্দির, স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতা–কা–ঠাকুর। এর ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল, তিনটি মন্দিরই ভগবান রামচন্দ্রের মহিমায় মহিমান্বিত। রামকে হিন্দুরা ভগবান বিষ্ণুরই এক অবতার বলে মেনে থাকেন। জন্মস্থান মন্দির, যা রাম জন্মভূমি বলেই অধিক প্রচলিত, সেখানে ভগবান রাম জন্মেছিলেন বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। আর স্বর্গদ্বারকে রামের স্বর্গে পৌছবার প্রবেশপথ বলে হিন্দুরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। এবং ত্রেতা–কা–ঠাকুর মন্দিরে তিনি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। এই মন্দিরে তিনি নিজের এবং সীতার মূর্তিস্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে তোলা।
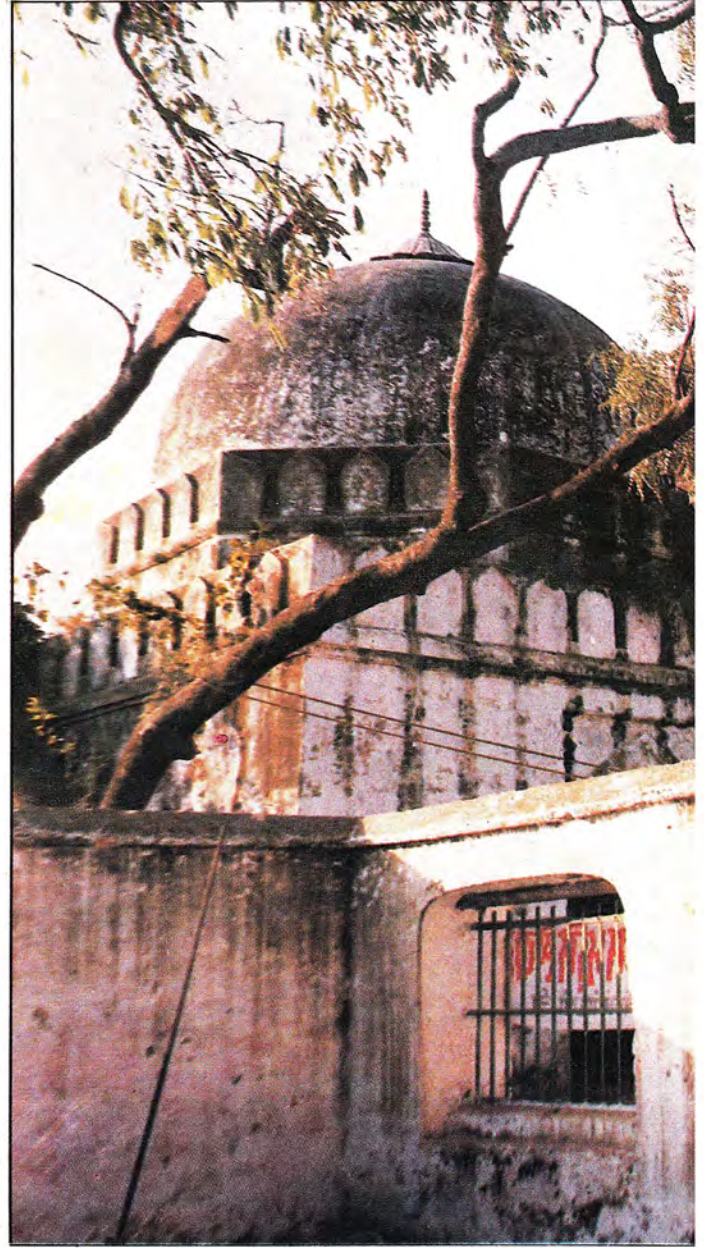
প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই রাম জন্মভূমি মোগল সম্রাট বাবর ধ্বংস করেন। সালটি ছিল ১৫২৮ খৃস্টাব্দ। এবং সেই সময়ই বাবরের নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়। আর স্বর্গদ্বার ধ্বংস করেন ঔরঙ্গজেব। সেইসঙ্গে ত্রেতা–কা–ঠাকুরের মন্দিরের জায়গায় ঔরঙ্গজেব অথবা তাঁর অনুগামীরা আরেকটি মসজিদ তৈরি করেন। এই

বাবরি মসজিদ এবং রামজন্মভূমি বিতর্ক এখন জাতীয় প্রেক্ষাপটে ঝোড়ো হাওয়া। এই হাওয়ায় আগুনের ফুলকি ভাসিয়ে দিয়ে জাতীয় সংহতিতে সাম্প্রদায়িক অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে চাইছে দুই মৌলবাদের পুরোহিতরা। কবে থেকে জন্ম এই বিতর্কের? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি কিভাবে এই ইস্যু নিয়ে ধর্মীয় সুড়সুড়িতে কাজ হাসিল করতে চাইছে? বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতা সাহাবুদ্দিন বলেছেন রামের দেবত্ব প্রাপ্তির বয়স মাত্র চারশ বছর? ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব কি বলে? কেন বাবরি মসজিদের স্থাপত্যে মুসলিম ধর্মনিষিদ্ধ বরাহ'র মূর্তি আঁকা? কেনই বা কসৌটির ১৪টি পিলারে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনের সঙ্গে হিন্দুদেবতা হনুমানের মূর্তি? সেযুগে মন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসকরা কি মসজিদও ভাঙতেন? কিভাবে মৌলবাদী হিন্দুনেতারা জবরদস্তি মসজিদে রামের ছবি টাঙিয়ে দিল? সাম্প্রদায়িক ইন্ধন-যজ্ঞে প্রতিদিন এখানে ডাকযোগে এসে পৌঁছানো হাজার হাজার টাকা কোনপথে খরচ হচ্ছে? ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিলালেখ, ভাস্কর্য ও মুদ্রাপরিচিতির প্রেক্ষাপটে অনেক অজানা ও অকথিত তথ্যপ্রমাণের সহায়তায় ভারতের সর্বাধিক সাম্প্রদায়িক বির্তকের নেপথ্যে আসল সত্যের সন্ধান সরজমিনে করে এনেছেন আলোকপাতের প্রধান সম্পাদক আলোক মিত্র।

মুসলিম মৌলবাদ, জামা মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে
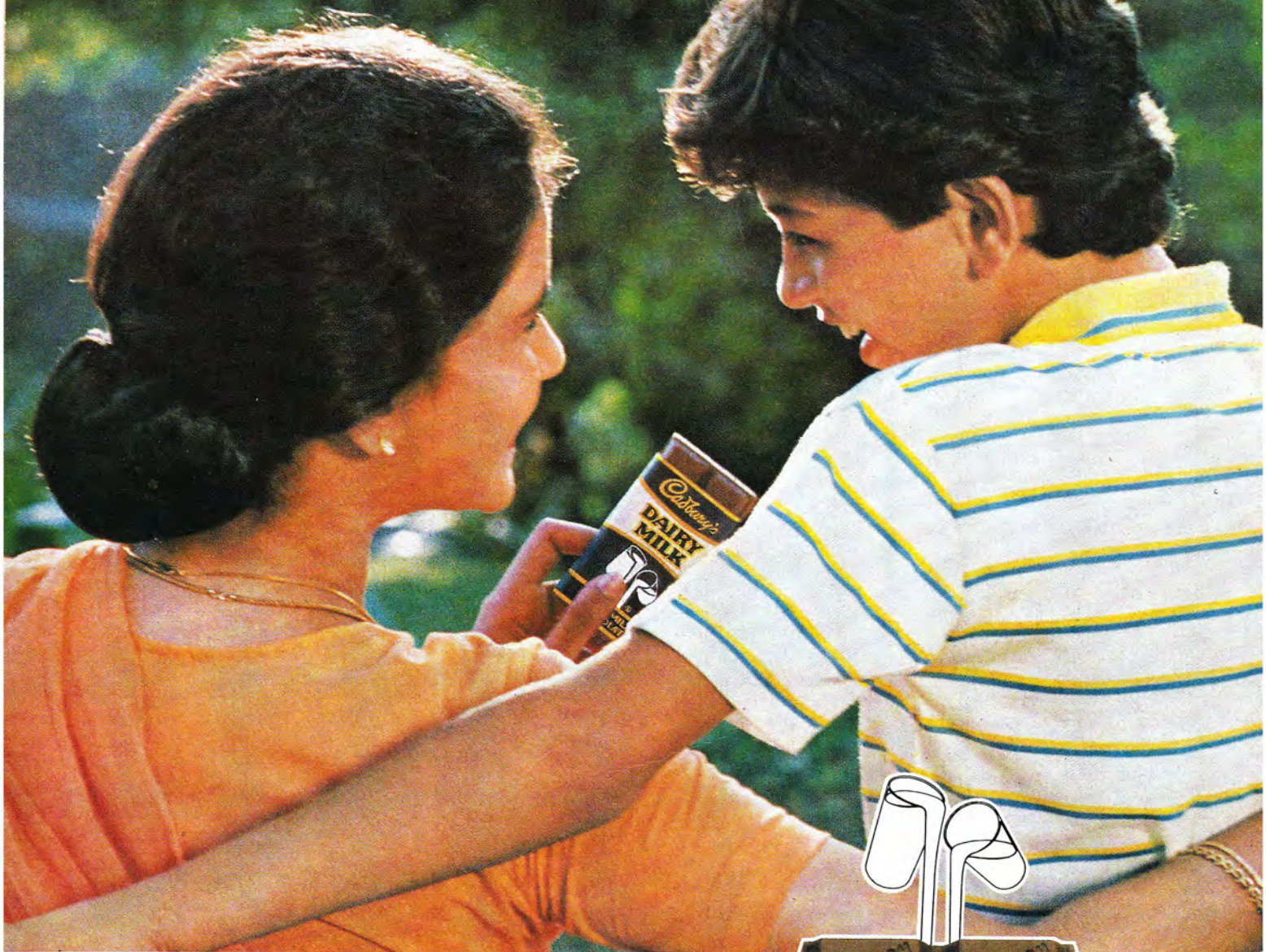
ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক

তোমার ত' চাই
সবার সেরা—এ জিনিষটাই

ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক। তাজা ডেয়ারী দুধ দিয়ে তৈরী। আসল,
খাঁটি আর সরে ভরা।
তৃপ্তিভরা স্বাদের জন্য এই চকলেটের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আন্তর্জাতিক।
ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক। চকলেট তৈরীতে যারা অগ্রণী
এ তাদের অবদান।

Cadbury's
DAIRY
MILK
®

প্রচলিত বিশ্বাসকে বর্তমানে রীতিমত শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে তথ্যানুসন্ধানীর দল। তাদের বক্তব্য, এই বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়? এক্ষেত্রে কি সত্যি কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি আছে যে, যেখানে রাম জন্মেছিলেন, সেখানেই বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সত্যিই কি ওই মসজিদটি বাবরের নির্দেশেই তৈরি হয়েছিল? যদি তা না হয়, তবে কি এ বিষয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করা সম্ভব? আসুন, আমরা আমাদের তথ্য যাচাই করি…

বাবরের মসজিদ?

দেখা যাচ্ছে এই ধর্মস্থানে বাবরের মসজিদ প্রতিষ্ঠার ঘটনাটি চাউর হতে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দিকে। প্রচার হতে থাকে যে মোগল বাদশা রামের পবিত্র জন্মস্থান রাম জন্মভূমি ধ্বংস করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূলে ছিল তৎকালীন বৃটিশের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি। শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে তারা এই নীতির আশ্রয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। স্থানীয় জনসাধারণকে বিভক্ত করে তারা প্রচার করতে থাকে যে মোগলেরা অযোধ্যার হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছে। এই ব্যাপারটা

বিতর্কিত 'কসৌটি' পিলারের ভাস্কর্য

প্রচার করে তারা একদিকে যেমন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কাছে 'সহানুভূতিশীল' হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করে, অন্যদিকে বৃটিশদের পূর্ববর্তী মোগলেরা ছিল হিন্দু ধর্ম তথা সংস্কৃতির প্রধানতম শত্রু, এটিকেও চিহ্নিত করা হয়।

এই নীতি কার্যকর করতে বৃটিশেরা নানা পন্থা অবলম্বন করে। এই কাজে যারা সাহায্য করেন এমনই এক ঐতিহাসিক হলেন জন লেডেন। বাবরের স্মৃতিকথার অনুবাদ 'মেমোয়ারস অফ জহির–উদ–দিন মুহম্মদ বাবর, এম্পায়ার অব হিন্দুস্থান' (এটি মূলে পার্সিতে লেখা) প্রকাশিত হয় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। লেডেন লিখছেন যে, বাবর ১৫২৮ সালে পাঠানদের মোকাবিলা করার জন্য অযোধ্যার ওপর দিয়ে পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। (এটা বলাই বাহুল্য যে পাঠানরা মুসলমান। সুতরাং এটা বলা ঠিক হবে না যে, বাবরের শত্রুতা ছিল শুধু মাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে)। এই ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, 'হিন্দু বিরোধী' বাবর অযোধ্যা দিয়ে যাবার সময় রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও লেডেন তার লেখায় ঠিক এই কথা কোথাও বলেন নি।

আশ্চর্যের বিষয়, বৃটিশদের সেই প্রচারের ঢক্কা নিনাদের রেশ আজও রয়েছে। কেউ কিন্তু একবারও বলছেন না যে অযোধ্যাতে মুসলিম প্রতিপত্তির সূচনা হয়েছিল ১০৩০ খৃষ্টাব্দেই। আশ্চর্যের কথা, মন্দির ধ্বংস তথা মসজিদ নির্মাণ করার ব্যাপারে বাবরই নাকি পথিকৃৎ, যিনি অযোধ্যায় মুসলিম প্রতিপত্তির ৫০০ বছর পরে অযোধ্যাতে প্রবেশ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মুসলমান (তুর্কি) শাসক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে কাছাকাছি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন দিল্লির কুতুবমিনার সংলগ্ন মসজিদ, আজমীরে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নামের মসজিদ, গুজরাটের সোম মন্দির।

শাহী ফরমান!

মন্দির না মসজিদ? জৌনপুরের অটালা মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, অওয়ধে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সূচনা ঘটে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে। সঈদ সালার মাসুদের স্মৃতিকথা 'মীরাট-ই-মাসুদি'তে লেখা রয়েছে যে, সালার মাসুদ 'অওয়ধে' একরকম বিনা বাধাতেই ঢোকেন এবং সেখানে বেশ কিছু দিন কাটান। তারপর ১০৮০ খৃষ্টাব্দে, সুলতান ইব্রাহিমের আমলে তুর্কি বাহিনী 'অওয়ধ' অভিযান করে। ওই অভিযানে নেতৃত্ব দেন হাজিব তাঘাৎগিন। তিনি গঙ্গা পার হন এবং সালার মাসুদের রাজত্বের পর তিনিই হিন্দুস্থানের মধ্যে অনেকটা ঢুকে পড়তে সক্ষম হন। আবার ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে, মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ-বিন-সাম, যিনি সাবাহ-উদ-দিন ঘোরি নামেই সমধিক পরিচিত, তিনি কান্যকুব্জ দখলের পরে অওয়ধ নিজের অধীনে আনেন। অনেকের মতে, হয় তিনি নিজে অথবা তাঁর সেনাপতি অওয়ধ দখল করেন। কাজেই বাবরই যে সম্ভাব্য মন্দির ধ্বংসকারী এটা যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

বাস্তবিক, 'বাবরনামা' পাঠ করলে মনে হবেই যে বাবর ধর্মে মুসলমান হলেও সর্ব ধর্মের ব্যাপারে তাঁর সহিষ্ণুতা ছিল। ১৯২২ সালে প্রকাশিত এ এস

বেভেরিজ কর্তৃক অনূদিত 'বাবরনামা' থেকে জানা যায় যে, মোগল সম্রাট বহু মন্দিরে গিয়েছেন এবং তাদের স্থাপত্যের প্রশংসা করেছেন। এবং গোটা বাবরনামাতে কোথাও হিন্দু মন্দির ধ্বংসের সামান্যতম ইচ্ছেটুকুও প্রকাশ পায় নি। এতে কোথাও সামান্যতম প্রমাণও নেই যে তিনিও অযোধ্যায় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। আরও মজার ব্যাপার, ওই স্মৃতিকথায় কোথাও লেখা নেই যে বাবর বাস্তবিকই অযোধ্যায় গিয়েছিলেন।

বাবরের স্মৃতিকথার অনুবাদক জন লেডেনের মতে, বাবর ১৫২৮ সালের ২৮ মার্চ অযোধ্যায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনূদিত বাবরনামার সঙ্গে যখন আসল বাবরনামা (লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত) মেলানো হয়, তখন বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। মূল বাবরনামার বাবরের ২ এপ্রিল থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের কার্য সম্বলিত পাতাগুলি খোয়া গেছে। এই লুপ্ত পাতাগুলির ব্যাপারে জন লেডেন নিজে বেমালুম কলম চালিয়ে বসলেন যে, বাবর তখন অযোধ্যাতে ছিলেন। বাবর তখন বাস্তবিক কোথায় ছিলেন সেটা রহস্যই।

লেডেন ভূগোল সম্পর্কেও আনাড়ির মত আচরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাবর ঠিক কোথায় তাঁর সামরিক ছাউনি ফেলেছিলেন সে সম্পর্কেও তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। বাবর তথা লেডেনের কথানুযায়ী, 'অউধ' থেকে
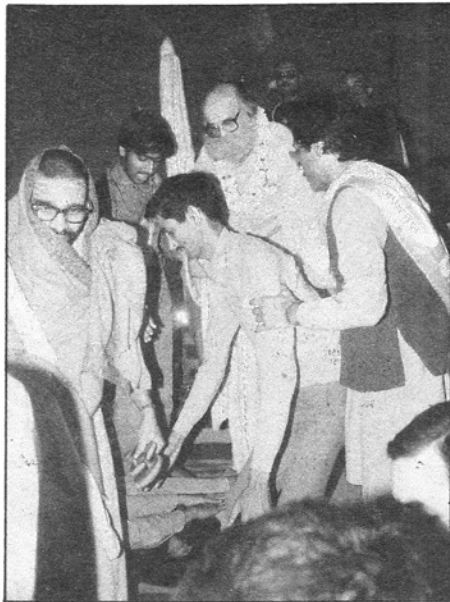
শঙ্করাচার্যদের আগমন, হিন্দু মৌলবাদের পরাকাষ্ঠা

সেই স্থানের দূরত্ব ছিল চার থেকে ছ'মাইল। বাবর লিখছেন: শনিবার ৭ম রজব (মার্চ ২৮, ১৫২৮) আমরা অওয়ধ–এর ২ বা ৩ ক্রোশ উত্তরে অবতরণ করেছি। ঘাগরা এবং সির্দা (সারদা) সংযোগলস্থল (জহির-উদ-উদীন মুহাম্মদ বাবরের স্মৃতিকথা)।' লেডেন আরো লিখছেন যে বাবর সেরবা নদী ও ঘাগরা নদীর সংযোগস্থলে সামরিক ছাউনি ফেলেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় লেডেন ঘাগরা নদীর ফেরিঘাটকেই নদী বলে ভুল করেছেন। ঘাগরা আর সেরবা নদীর সংযোগস্থল কথাটি ভুল। কারণ সেইসময় ওই নামে কোন নদী ছিল না (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। আসলে এই বন্দরটি অযোধ্যা থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অথচ লেডেন ভেবেছিলেন বাবর অযোধ্যার খুব কাছেই ছাউনি ফেলেছিলেন।

একই ধরনের ভৌগোলিক বিভ্রান্তি দেখা যায় অন্যান্য বৃটিশ ঐতিহাসিকদের বেলাতেও। যেমন, উইলিয়াম এরস্কিনের লেখা 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া আণ্ডার দ্য ফার্স্ট সোভারিনস অফ দ্য হাউস অব তৈমুর, বাবর অ্যাণ্ড হুমায়ুন' (দুই খণ্ডে লণ্ডন থেকে ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত)। এছাড়া এইচ এম ইলিয়টের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া: অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস' ভল্যুম ৪, ১৮৭৩। এগুলিতে লেডেনের মতই লেখা হয়েছে যে, বাবর ঘাগরা ও সেরবা'র সংযোগস্থলের নিকট থেকে ৪ অথবা ৬ মাইলের দূরেই ছাউনি খাটিয়েছিলেন। তবে লেডি অ্যানেৎ সুসানা বেভেরিজের লেখা ১৯২২ সালে প্রকাশিত–'বাবরনামা'তে এ ধরনের ভুল চোখে পড়ে না।

লেডি বেভেরিজ লিখছেন, মোগল সম্রাট বাবর 'সারবা' ও 'ঘাগরা'র সংযোগস্থল থেকে চার থেকে

এই মানচিত্রটি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে ১৫২৮ খৃস্টাব্দের উল্লিখিত দিনে বাবর কোথায় ছিলেন!
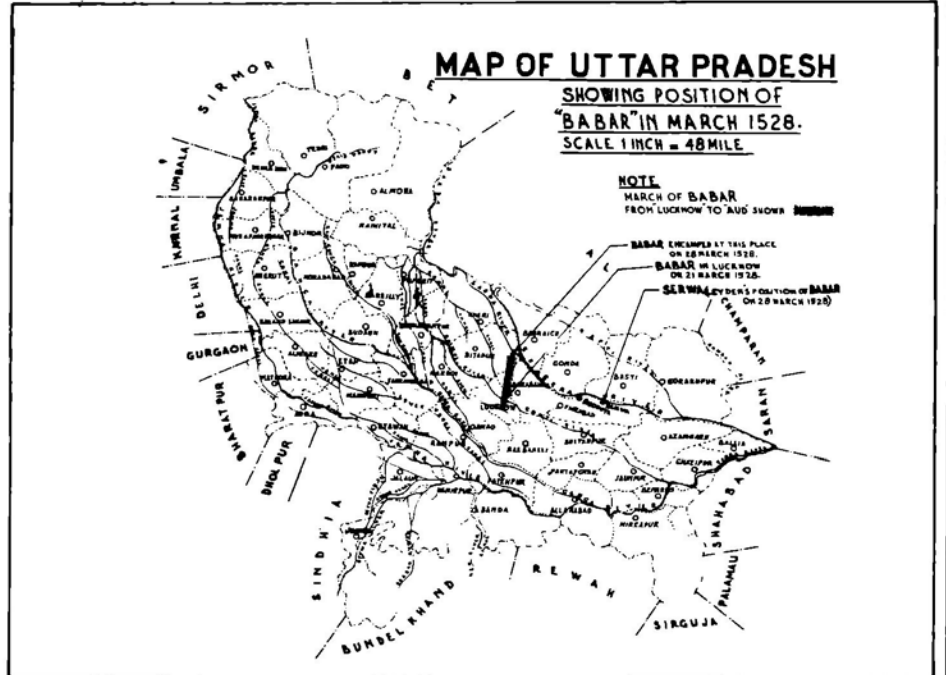
সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, মসজিদের দাবিতে সোচ্চার
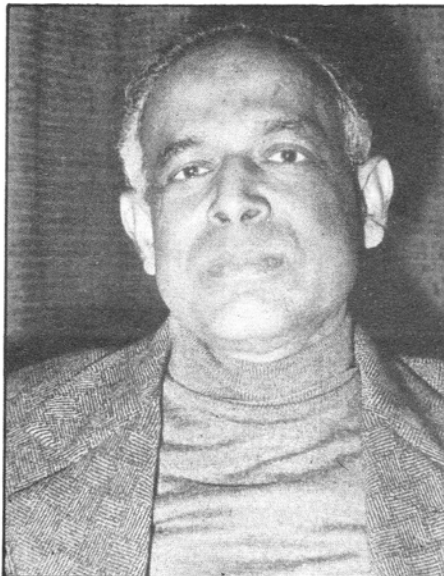
পাঁচ মাইল দূরে ছাউনি ফেলেন। অর্থাৎ সেরবা ও ঘাগরা নদীর সংযোগস্থলের ব্যাপারটি ঠিক নয়।

বাবরের জীবনীতে উল্লিখিত 'অউধ' নামক জায়গাটিকে বহু বৃটিশ ঐতিহাসিক অযোধ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন এ থেকে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক গোমতী থেকে ঘাগরা পর্যন্ত এলাকাটি যে মুসলমান শাসকেরা 'অউধ' বলতেন এবং অউধ মানে যে অযোধ্যা শহর নয়, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। বাবরের লেখায় ঠিক কোন নদীর নাম লেখা হয়েছে তা নিয়েও বেশ সন্দেহ রয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপিটি এক্ষেত্রে দায়ী। নদীর নাম 'সিরদা' দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে 'দাল' (পার্সি পাণ্ডুলিপির অক্ষরটি) কে 'ওয়াও' বলে লেখা হয়েছে। ভুলটা এখানেই হয়েছিল।

বেভেরিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাবর যে সংযোগস্থলের উল্লেখ করেছেন সেই ঘাগরা ও সারদা অযোধ্যা থেকে ৭২ মাইল উত্তরে বাহরাইচে অবস্থিত। যতদূর মনে হয়, বাবর সম্ভবত ১৫২৮

অযোধ্যার ঐতিহাসিক পশ্চাদপট সম্বলিত 'ইউ পি গেজেট, ফৈজাবাদ, ১৯৬০'–এর কিছু অংশ এখানে বিধৃত হল:

'অযোধ্যা (যার অর্থ 'অজেয়') প্রাচীনতার এক মহান নিদর্শন। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, অযোধ্যা হল বিষ্ণুর ললাট এবং ভারতের সাতটি পুণ্যস্থানের (সপ্তপুরী) অন্যতম। কারনেগী'র ভাষায়– 'মুসলমানদের কাছে যেমন মক্কা এবং ইহুদিদের জেরুসালেম, হিন্দুদের কাছে অযোধ্যাও ঠিক তেমনই পুণ্যভূমি। মানা হয় যে অযোধ্যা এই মরণশীল পৃথিবীতে স্থাপিত নয়। অতিরিক্ত সুরক্ষার স্বার্থে এটি পরমস্রষ্টার রথচক্রের উপর স্থাপিত, যা চিরন্তন, অবিনশ্বর (পি· কারনেগী: এ হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অব তহশীল ফৈজাবাদ, জিলা ফৈজাবাদ, ১৮৭০, পৃষ্ঠা-৫)। রাম এবং সূর্য্য বংশীয় আখ্যানের সঙ্গে অযোধ্যা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে (রামচন্দ্র বিষ্ণুর সেই অবতার, যাঁর সম্পর্ক অযোধ্যার সঙ্গে)।

তৎকালীন অনেক শাসকের রাজত্বকালে অযোধ্যাই ছিল তাঁদের রাজধানী। সেই সঙ্গে অযোধ্যা বৈষ্ণবদেরও একটি অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী, 'সাকেত'-এ গৌতম বুদ্ধ নাকি তাঁর জীবনের ১৬টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেন। কারও কারও মতে এই সাকেত এবং অযোধ্যা অভিন্ন। খৃস্ট জন্মের পাঁচশ বছর পর অযোধ্যা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে এবং অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। সম্ভবত চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ এই স্থানটি পরিদর্শন করেছিলেন। ইদানীং অবশ্য প্রাচীন কোনও নিদর্শনের লেশমাত্র নেই অযোধ্যার আশেপাশে। কারণ বিভিন্ন সময় বহিরাগত শত্রুরা আক্রমণকালে এখানকার প্রায় সব কিছুই লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে দীর্ঘকাল তাই অযোধ্যা পরিত্যক্ত একটি স্থানের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর মধ্যযুগের প্রথমভাগে মুসলিম শাসকরা অযোধ্যাকে একটি বিশাল রাজ্যের শাসন-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললে অযোধ্যার গুরুত্ব আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালে হিন্দু সৌধগুলি তাদের গুরুত্ব হারায় এবং বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে-যখন মুসলমান শাসকেরা অযোধ্যা থেকে তাঁদের রাজধানী নিয়ে যান ফৈজাবাদে। মুসলিম দরবারের অবর্তমানে হিন্দুরা তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পায়, এবং কিছুদিনের মধ্যেই অযোধ্যায় অসংখ্য হিন্দু মন্দির এবং উপাসনা-গৃহ গড়ে ওঠে। অযোধ্যার এই হঠাৎ গুরুত্ববৃদ্ধির পেছনে সম্ভবত রয়েছে তুলসিদাসের 'রামচরিতমানস'–এর ক্রমবর্ধিত জনপ্রিয়তা। এরপর বৃটিশ কর্তৃক ওয়ধ অধিকারের ফলে অযোধ্যার উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই অযোধ্যা হিন্দু ধর্মের একটি শক্তিশালী পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হয়।

'বলা হয়, মুসলিম বিজয়ের সময় অযোধ্যায় শুধুমাত্র তিনটি হিন্দু-ধর্মস্থান ছিল। সেগুলি হল: জন্মস্থান মন্দির, স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতা-কে-ঠাকুর। জন্মস্থান মন্দিরটি রামকোট-এ অবস্থিত। এখানেই রামের জন্ম হয়েছিল বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। মনে হয়, ১৫২৮ খৃস্টাব্দে বাবর অযোধ্যা পরিদর্শনে আসেন এবং তাঁর নির্দেশেই জন্মস্থান মন্দিরটি ভেঙে ফেলে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়–বাবরের মসজিদ হিসেবে যা পরিচিত। এই মসজিদটির নির্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয় ভেঙে ফেলা মন্দিরটির বিভিন্ন উপকরণ–যার মধ্যে কয়েকটি মূল স্তম্ভ আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবও অযোধ্যার হিন্দু-মন্দিরগুলি অপবিত্র করার খেলায় মেতে ওঠেন, যা দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু-মুলসমান তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠে। মুলসমানরা জোর করে 'জন্মস্থান' দখল করে নেয় এবং 'হনুমানগড়ি'ও আক্রমণ করে। আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণ চলতেই থাকে। তারপর মৌলবি আমির আলির নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালে তা ব্যাপক রক্তপাতে পর্যবসিত হয়। যার ফলস্বরূপ ১৮৫৮ সালে মসজিদের বাইরের দিকে একটি পাঁচিল তোলা হয় এবং হিন্দুরা সেখানে রাম ও সীতার কয়েকটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যার ফলে স্থানটি নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। চলতে থাকে মামলা-মোকদ্দমা–যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

'এই বিতর্কিত সৌধটির বাইরের পাঁচিলের গায়ে রয়েছে অতি প্রাচীন একটি ভাঙা বরাহ মূর্তি…'

* এই রকম একটি বরাহ মূর্তি যে আজও সেখানে রয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে এই বিতর্কিত সৌধটির সাম্প্রতিক পরিদর্শনের সময়। সৌধটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি নিম-পিপল গাছের নিচে বরাহ মূর্তিটি আছে। সৌধের বহিরস্থ প্রাচীরের গায়ে মাটির সমতায় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটি যে খুবই প্রাচীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মূর্তিটির গায়ে অঙ্কিত কিছু আবছা চিহ্ন থেকে–যতদূর সম্ভব তাতে অঙ্কিত ছিল বিষ্ণুর অবয়ব। কারণ বরাহ বিষ্ণুরই এক অবতার। এবং প্রায় প্রতিটি বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গেই সন্নিহিত থাকে বরাহ-র মূর্তি। বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের মধ্যে 'বামন' এবং 'বরাহ'-ই সর্বাধিক পূজিত অবতার। কোন কোন স্থানে তাদের জন্য আলাদাভাবে মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে– যেমন আছে দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত খাজুরাহোর মন্দিরে। 'দ্য জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল', ভল্যুম ৩৪, পার্ট ১ (কলকাতা, ১৮৬৬)-তে প্রকাশিত হয়েছিল কানিংহামের 'রিপোর্ট অব দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, ১৮৬২-৬৩'। তাতে তিনি গোন্ডা-র আশেপাশে টিলার ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত বেশ প্রাচীন মুদ্রার উল্লেখ করেন (গোন্ডা অযোধ্যা থেকে ৩০ মাইল দূরে একটি শহর), যার মধ্যে দিল্লির প্রথম দিককার মুসলমান রাজাদের মুদ্রা ছাড়াও ছিল 'বেশ কিছু হিন্দু মুদ্রা। তামা এবং রূপার এই মুদ্রাগুলির একদিকে ছিল বিষ্ণুর বরাহ অবতারের ছবি–আর অপর দিকে ছিল মধ্যযুগীয় লিপিতে 'শ্রী-মদ-আদি-বরাহ'র উপকথা। যেহেতু ৯২০ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এই মুদ্রাগুলিকে 'শ্রী-মদ-আদি-বরাহ দ্রম্মস' বা 'বরাহ অবতার দ্রাখমা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে–তাই যে টিলাগুলি থেকে সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল তা আরও প্রাচীন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

এর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বিষ্ণুর বরাহ অবতার দশম শতাব্দী কিংবা তারও আগে থেকেই এই অঞ্চলে একটা বিশেষ মর্যাদা পেতে শুরু করে। সুতরাং অযোধ্যা মন্দিরের বাইরে যে বরাহ মূর্তিটি রয়েছে তা সেই সময়কারও হতে পারে। কিন্তু তা কি বিষ্ণু মন্দিরেরই একটি অংশ বিশেষ (না কি রামের, কারণ অযোধ্যা রামের জন্মস্থান এবং তিনিই বিষ্ণুর সর্বাধিক পূজিত অবতার)?

অযোধ্যায় রামের জন্মের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত কোন মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নে অনেকেই বিতর্কে নামতে পারেন। কারণ শুধু ভারতেই নয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে খৃস্ট-পরবর্তী প্রথম সহস্র বৎসর থেকেই একজন জনপ্রিয় অবতার হিসেবে রামের পূজিত হওয়ার বিভিন্ন প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বাল্মিকীর রামায়ণ-এর কাজ সমাপ্ত হয় খৃস্ট-পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং সেই থেকে রাম যুগে যুগে পূজিত হয়ে আসছেন (দ্য রামায়ণ এণ্ড আর্কিওলজি, বি বি লাল, ১৯৮৩)।

প্রাপ্ত তথ্য সমূহ থেকে আরও জানা যায় যে, দশম শতাব্দীতে নির্মিত খাজুরাহোর পার্শনাথের মন্দিরে এবং পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত যুগের দেওগড় মন্দিরেও রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (টি·এ· গোপীনাথ রাও, এলিমেন্টস অব হিন্দু ইকনগ্রাফি, ভল্যুম ১, পার্ট ১)।

ভারতের প্রায় সর্বত্র মন্দিরস্থ চিত্রকলা রামের একজন জনপ্রিয় অবতার হিসেবে পূজিত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে। ৪০০ খৃস্টাব্দে বরাহমিহির কর্তৃক সংকলিত 'বরাহসংহিতা'য় রামের মূর্তি কিভাবে নির্মাণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে (দ্য ডেভেলপমেন্ট অব হিন্দু ইকনগ্রাফি, জে·এন· ব্যানার্জি, কলকাতা–১৯৫৪)। রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীও মধ্যযুগের প্রথম এবং শেষ পর্বে বিভিন্ন মন্দিরে চিত্রায়িত হয়েছে। এই নিদর্শন শুধু ভারতেই নয় ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়াতেও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪২১)।

গুপ্ত যুগেও রাম একজন পরিচিত অবতার ছিলেন। বিভিন্ন শিলালেখ এবং মুদ্রায় এর উল্লেখ রয়েছে (এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, রাধাকুমুদ মুখার্জি, এলাহাবাদ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৩১৬)। খৃস্ট পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'কম্বোজ' (কম্বোডিয়া)-এর আন্নাম প্রদেশে একটি হিন্দু উপনিবেশ চম্পাতে বিষ্ণুর পুজো হত তাঁর আরও দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা–৫০২)। জাভার প্রম্বানম মন্দিরেও (অষ্টম শতাব্দী) রামায়ণের বিভিন্ন চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা–৫১৫)। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রামের স্বতন্ত্র ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তর নির্মিত মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে, প্রথমের দিকে রাম শুধুমাত্র একজন অবতার হিসেবেই পূজিত হতেন–একমাত্র অষ্টম শতাব্দীর পরই তাঁকে ঈশ্বরের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়। তর্পণ এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রে রামের উল্লেখই একথা প্রমাণ করে (দ্য ডেভেলপমেন্ট অব হিন্দু ইকনগ্রাফি, জে·এন· ব্যানার্জি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৩৬)।

সেই সময় খাজুরাহোতে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দেবতা হনুমানও বহু সংখ্যক মানুষের উপাসনা লাভ করত। ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন গ্রুপের মন্দিরের মাঝামাঝি অংশে হনুমানের একটি বিশাল মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয় একসময় তা কোন মন্দিরের

বেদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্তিটির পাদদেশে হর্ষ যুগের ৩১৬ অব্দের শিলালেখে একটি উৎসর্গমূলক বাণী খোদিত আছে (৯২২ খৃস্টাব্দ)। প্রায় সদৃশ্য আর একটি হনুমান মূর্তিও পাওয়া যায় খাজুরাহো সাগর বা নিনোরা তলাও-এর তীরে।

হনুমান বিষ্ণুরই এক অবতার, এবং চন্দেল্লা গোষ্ঠীর আগমনের বহু পূর্বেই (৯৪০ খৃস্টাব্দ) রামের অবতার হিসেবে বিষ্ণুর পূজার সঙ্গে জড়িত ছিল। চন্দেল্লা প্রদেশের সাধারণ মানুষজনই মূলত তাঁর উপাসক ছিলেন। চন্দেল্লার জনগণ শুধুমাত্র সাহসিকতার প্রতীক হিসেবেই তাঁর উপাসনা করেন নি, সে যুগের বিভিন্ন মুদ্রাতেও তাঁকে স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছেন (এস·কে· মিত্র, দ্য আর্লি রুলার্স অব খাজুরাহো, কলকাতা–১৯৫৮, পৃষ্ঠা ১৯৩)। বস্তুত খাজুরাহোতে রাম ও সীতা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্মের একটি মূল অঙ্গ হল বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের পূজা করা। খাজুরাহোর বিভিন্ন মন্দিরে তাঁদের বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। রাম, বলরাম এবং পরশুরামের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের মূর্তিও খাজুরাহোর বিভিন্ন মন্দিরে স্থান পেয়েছে।

এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণাদির আলোকে রামের জন্ম উপলক্ষে নির্মিত অযোধ্যায় কোন মন্দিরের উপস্থিতি সম্পর্কে কেউ কিভাবে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন? বস্তুত এই প্রমাণগুলি সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের মত বাবরি মসজিদের অধিবক্তার দ্বারা ভারতে মাত্র ৪০০ বছর আগে থেকে রামের পূজিত হওয়ার ব্যাখ্যা পুরোপুরি খারিজ করে। কানিংহামের হিসেব অনুযায়ীই মহাভারতের সময়কাল খৃস্টপূর্ব ১৫ শতাব্দীর আগের। এবং রামায়ণ মহাভারতের কমপক্ষে ৩০০ বছর আগে রচিত হয়েছিল।

* তৎকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃস্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে বেশ কিছু কাল অযোধ্যা ছিল একটি জনবিরল স্থান। একথা উল্লেখ করার জন্য কানিংহামের উক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী–যে ব্যক্তি অযোধ্যার পুনর্নির্মাণ করেন তিনি হলেন, উজ্জয়িনীর বিখ্যাত শাকারি রাজপুত্র বিক্রমাদিত্য। হিউয়েন সাঙ লেখেন, কণিষ্ক'র ১০০ বছর পর কিংবা খৃস্ট পরবর্তী ৭৮ অব্দে ঐ নামের একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজপুত্র অযোধ্যার সন্নিকটে শ্রাবস্তি শহরে রাজত্ব করতেন। তাহলে কে এই বিক্রমাদিত্য, যিনি অযোধ্যার পুনর্নির্মাণ করেন?

কানিংহাম, যাঁর লেখা থেকে এ ব্যাপারে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়, তিনি নিজেই বিক্রমাদিত্যের আসল পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি কি কালিদাসে বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করেছিলেন, না কি গুপ্ত কিংবা মৌর্য্য যুগের বিক্রমাদিত্যের কথা বলেছিলেন? মনে হয় 'বিক্রমাদিত্য' শুধুমাত্র একটি উপাধি ছিল–কারও নাম নয়। এই উপাধিটি ব্যবহার করতেন গুপ্ত কিংবা মৌর্য্য যুগের রাজারা।

* ইতিহাস অনুযায়ী, অষ্টম কিংবা দশম খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যা ছিল গুর্জর পরিহারদের শাসনাধীনে। এরপর একাদশ শতাব্দীতে জয়চাঁদ এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন (জৌনপুরের বিভিন্ন শিলালেখ একথার প্রমাণ দেয়)। জয়চাঁদ ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বাধিক প্রভাবশালী রাজা। অবশ্য সেই মন্দিরটি, যার স্তম্ভগুলি বাবরের মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল, কার নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল তার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ আর পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, গুর্জর পরিহারদের কিংবা জয়চাঁদ, কারও নির্দেশেই হয়ত এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়।

বলা হয়েছে যে মসজিদটিতে ব্যবহৃত স্তম্ভগুলি নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার কোনও এক সময়ের। অবশ্য এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, মন্দিরটি বাইরের জনগণের অর্থানুকূলে নির্মিত হয়েছিল, কারণ বহু বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরও অযোধ্যায় আমাদের চোখে পড়েছে, যদিও কোন সময়েই কোনও জৈন কিংবা বৌদ্ধ শাসক অযোধ্যায় রাজত্ব করেন নি। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বারাণসী এবং খাজুরাহো একই সঙ্গে হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র, এবং এই দুটি স্থানই একই সময়ে বিকশিত হয়, সুতরাং একথা কখনই জোর দিয়ে বলা যেতে পারে না যে অযোধ্যায় বৌদ্ধ স্তূপ ছিল অথচ কখনও কোন রাম মন্দির ছিল না।

অযোধ্যায় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক নির্মিত ৩৬০টি মন্দিরের মধ্যে ৩০০টি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়–একথা প্রমাণ করার জন্য কানিংহাম আবার হিউয়েন সাঙ-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (রিপোর্ট অব দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, ১৮৬২-৬৩, জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ প্রকাশিত, ভল্যুম ৩৪, পার্ট–১, কলকাতা, ১৮৬৬)। 'বিশাখা শহরটি সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা দিয়েছেন, শহরটির পরিধি ছিল ১৬লি, অর্থাৎ ২-২/৩ মাইল। সুতরাং তাঁর সময়ে রামের রাজধানী বর্তমান শহরের অর্ধেকের বেশী ছিল না···সে সময় সেই শহরে ছিল কমপক্ষে ২০টি উপাসনালয়। যাতে প্রায় ৩,০০০ সাধু থাকতেন। এছাড়াও ছিল প্রচুর ব্রাহ্মণ এবং বেশ কিছু ব্রাহ্মণ মন্দির। এই বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেই বিক্রমাদিত্যের প্রায় ৩০০টি মন্দির অবলুপ্ত হয়েছিল···'

যদি একথা বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে কিভাবে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে–যখন বাবর নাকি রাম-জন্মভূমি মন্দিরটি ধ্বংস করে সেখানে বাবরি মসজিদের নির্মাণ করেছিলেন। তবে মোটামুটি এই ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, মূল রাম-জন্মভূমি মন্দিরটি কালের কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ একই জায়গায় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে আবার নতুন করে মন্দিরটি নির্মিত হয়–যে সময়কার কস্টিপাথরের পিলারগুলি মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানটি পরিদর্শনের পর আমাদের ধারণা হয় জায়গাটি খুবই প্রাচীন। যে টিলাটির উপর এই বিতর্কিত সৌধটি নির্মিত, তার প্রতিটি ধাপের পাথরগুলির বিভিন্নতা এ কথারই ইঙ্গিত দেয় যে সেগুলি বিভিন্ন সময়ের। সৌধটির আশপাশে সাম্প্রতিক খননকার্যে উদ্ধারকৃত উপকরণসমূহও সেখানে কোন প্রাচীন মন্দিরের উপস্থিতি সম্পর্কে আভাস দেয়।

* ঐতিহাসিকদের মতে 'অযোধ্যা মহাত্ম্য'র রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। সেক্ষেত্রে এই রচনায় কি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মসজিদটি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ থাকার কথা নয়? উক্ত বইটির স্মরণ নিয়ে নানান হিসেব সহকারে বোঝান হয় যে, যে স্থানটিতে বাবরি মসজিদ রয়েছে সেখানে কোনমতেই রামের জন্ম হয়নি, সেই স্থানটি সম্ভবত জায়গাটির ৩০ গজ কিংবা তার আশপাশে ছিল। কিন্তু বইটিতে উল্লেখিত সব হিসেব-নিকেষই কি নিখুঁত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে?

* অনেকের ধারণায়, বাবর যদি রাম-জন্মভূমি মন্দিরটি ধ্বংসই করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর 'বাবর নামা'য় এর উল্লেখ থাকত। কিন্তু মনে হয় এরকম ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কারণ কেউ একটা মন্দির ধ্বংস করে পরে কেন বিশেষভাবে সেই ঘটনার উল্লেখ করবেন। তাছাড়া, অন্যান্য শাসকরাও যাঁরা মন্দির ভেঙে ছিলেন তাঁরা কি সবাই পরবর্তীকালে তার উল্লেখ করেছেন?

* আজ কি নদীর সেই সংযোগস্থলটিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব যেখানে বাবর তাঁর তাঁবু ফেলেছিলেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীরও গতিপথ পাল্টে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

* বাবর অযোধ্যার ধারেকাছে কোথাও পৌঁছেছিলেন–এ তথ্য পাওয়ার পর বাবরের মূল অযোধ্যা শহরটি পরিদর্শনের সম্ভাবনাটিকেও কি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায়? বিশেষ করে অযোধ্যার তৎকালীন গুরুত্ব বিচার করলে এই ধারণায় উপনীত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

* সে সময় বাবর মূলত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নিজের ভীত দৃঢ় করার ব্যাপারেই মশগুল ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে কিভাবে দিল্লি কিংবা অন্যান্য স্থানের কারিগরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব?

* অনেকের মতে বাবর ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, কিন্তু ঐতিহাসিক এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসার ইকতেদার খান উল্লেখ করেছেন যে 'বাবর ছিলেন ধর্ম সম্পর্কে একরকম উদাসীন।' যদি তাঁর কথা ঠিক হয় তাহলে এই তর্ক অমূলক যে কোনও বিতর্কিত জায়গায় বাবর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিতে পারেন না।

এবার অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিকগুলিও বিবেচনা করা যেতে পারে:

বিভিন্ন জায়গায় একথা লেখা হয়েছে যে, ইংরেজ ঐতিহাসিক কানিংহাম 'লক্ষ্ণৌ গেজেটিয়র'-এ লিখেছিলেন যে, এই মসজিদটির নির্মাণকালে হিন্দুরা তাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এর বিরোধিতা করেছিল এবং প্রায় এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার হিন্দু এর দরুন মারা যায়। কিন্তু এরকম কোন 'লক্ষ্ণৌ গেজেটিয়র' বাস্তবে নেই এবং কানিংহামও কোন গেজেটিয়র প্রকাশ করেন নি। অবশ্য কিছু ভুয়ো, ইতিহাসগোছের সাহিত্য, যেমন 'রক্তরঞ্জিত ইতিহাস'-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া নেভিল তাঁর বই 'ফৈজাবাদ–এ গেজেটিয়র' (ভল্যুম–৪২, পৃষ্ঠা–১৭৮)–এ উল্লেখ করেন যে, ১৮৬৯ সালে গোটা অযোধ্যার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৯, ৯৪৯, যা ১৮৮১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৬৪৩-এ। সুতরাং, ইতিহাসের সেই নির্দিষ্ট ক্ষণে, যখন হিন্দুরা এই মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রাণপাত যদি করেই ছিল, তখন এই লক্ষ লোকের ব্যাপারটা এল কিভাবে?

* কোথাও কোথাও একথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, 'সুলতানপুর

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

গেজেটিয়র'-এর ২৬ পাতায় নাকি ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন কোন ঘটনা সম্পর্কিত জনৈক কর্নেল মার্টিন-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও এরকম কোন গেজেটের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

* একই ভাবে ৬ জুলাই, ১৯২৪-এর 'মডার্ন রিভিউ'-এরও উল্লেখ করা হয়, যেখানে জনৈক স্বামী সত্যদেব পরিব্রাজক নাকি রাম জন্মভূমি মন্দিরটি ভেঙে ফেলে সেখানে বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বাবরের শাহী-ফরমানটির বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে একথা উল্লেখই যথেষ্ট যে, মডার্ন রিভিউ-এর ৬ জুলাই শিরোনামে কোন সংখ্যাই থাকতে পারে না। কারণ মডার্ন রিভিউ এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং সম্পাদিত একটি মাসিক পত্রিকা।

* কোনও কোনও মহলের ধারণা, সাধারণত মসজিদের প্রবেশদ্বারগুলি যে রকম হয়, বাবরি মসজিদের প্রবেশদ্বার নাকি সেরকম নয়। এর মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের ছোঁয়া রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলা চলে না যে বাবরি মসজিদ কোন মসজিদই নয়।

* কোন কোন হিন্দু প্রবক্তা আবার বলে থাকেন যে, বাবরি মসজিদের নির্মাণকার্যে কাঠের ব্যবহার হয়েছিল– যা নাকি অন্যান্য মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ শর্কী শৈলীর মসজিদ নির্মাণে কাঠের ব্যবহার দেখা যায়।

* হিন্দু প্রবক্তাদের আরও অভিমত যে, মসজিদের খিলানে বাঘের মূর্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যেমন দেখা যায় বাবরি মসজিদে। কিন্তু তাদের এই অভিযোগও ঠিক নয়। কারণ এর উপস্থিতি অন্যান্য মসজিদেও দেখতে পাওয়া যায়।

* অনেকের মতে মসজিদে মিনার থাকা আবশ্যক–যেখান থেকে মৌলবী আজান দেন। কিন্তু আজানের জন্য ব্যবহার হোক কিংবা না হোক–মিনার মসজিদের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা থেকে জানা যায় যে মসজিদে মিনার নির্মাণের প্রচলন শুরু হয় ৬৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। এবং তারপর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে মিনারের উপস্থিতি একরকম আবশ্যিক হয়ে ওঠে। সুতরাং বাবরি মসজিদে কোন মিনার না থাকার ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্য্যের।

* বাবরি মসজিদে কোনও দিন নামাজ পড়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোথাও জানা যায়নি। তবে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে এখানে খুব সম্ভবত কখনও নামাজ পড়া হয়নি।

* বাবরি মসজিদে পরিক্রমার উপস্থিতি সম্পর্কেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু এটাকে ঠিক পরিক্রমা বলা চলে না। অবশ্য পরিধির মধ্যেকার স্থানটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরিক্রমা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ইতিহাস যেমন পাল্টানো যায় না তেমনি কোন ঐতিহাসিক তথ্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বাবর এবং লোদী যা করেছিলেন আজকের প্রেক্ষাপটে তা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থহীন। কোন ইংরেজ স্মারক আজ আমরা শুধুমাত্র এই বলে ভেঙে ফেলতে পারি না যে, তারা একসময় আমাদের উৎপীড়ক ছিল। আবার আমরা এ দাবিও করতে পারি না যে, যেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেখানে মন্দির নির্মাণ করা হোক। কারণ এ ধরনের দাবি কখনই সঙ্গত নয়। সেভাবেই রামের মন্দির তাঁর জন্মস্থানের ঠিক উপরেই হোক কিংবা তার থেকে ১০ গজ কিংবা ১০ মাইল দূরেই হোক তা দ্বারা কখনই মন্দিরটির পবিত্রতা কিংবা ঐতিহাসিকতার উপর প্রভাব পড়তে পারে না। ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন, আর ভক্তির স্থান তো হৃদয়ের অন্তঃস্থল। যে ধর্মান্ধ মন্দির নির্মাণ করতে আগ্রহী, সে কেন 'মনমন্দির' তৈরি করে না। রামের জন্য সেটাই তো সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান।

অনেকের ধারণা 'রামচরিতমানস'-এর পরই রামের জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং তাঁর নামে মন্দির তৈরী হয়। সৈয়দ সাহাবুদ্দিনও একথা বলে থাকেন। কিন্তু রামের মহিমা যথেষ্ট প্রাচীন। রামের প্রথম উল্লেখ পাই আমরা ঋকবেদের ১০-৯৩-১৪ শ্লোকটিতে–'প্র তদ দুঃ শীমে পৃথানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।/ইয়ে যুক্তায় পঞ্চ শতাস্মসু পথা বিশ্রাবেৎষাম। '(এই স্তোস্ত্রে দুঃশীম, পৃথান, বেন, বলবান, অসুর আর রাম–এইসব রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে জানাচ্ছি)।এছাড়া বিস্তৃতভাবে পাই অথর্ববেদে। অথর্ববেদের ১০-২-৩১ শ্লোকটিতে অযোধ্যার উল্লেখ আছে এভাবে:– 'অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা। তস্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ (সূর্য্য-বংশীয় রাজাদের রাজধানী এই অযোধ্যাকে বলা হচ্ছে দেবতাদের পুরী অযোধ্যা, যা অজেয়)।

* হিন্দুদের মন্দির ঈশ্বরের আবাসস্থল রূপে মনে করা হয়। আর হিন্দুদের দেবতা সে তো ঈশ্বরের রূপও নয়, ঈশ্বরের দূতও নয়। এটি হল ভক্তির ঘনীভূত রূপ। গোঁড়া হিন্দু মনোভাব হিন্দুদের এই উপাসনার মূল সত্যটিকেই যেন ব্যঙ্গ করছে। এই যে হিন্দু দেব দেবীর ছবি সার সার টাঙিয়ে জায়গাটিতে হিন্দুত্ব আরোপের চেষ্টা চলেছে। এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

এই সব কিছু মাথায় রেখে একথা যেমন বলা যায় না যে, বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম-জন্মভূমি মন্দির ছিল না–তেমনই বলা যায় না এই মন্দির ভেঙেই বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। যতদিন না এই স্থাপত্যটির, বিশেষ করে স্তম্ভগুলির কার্বন-ডেটিং করা হয় ততদিন এ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। 'সেন্টার অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি'র ডিরেকটর এবং 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ'-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইরফান হাবিব-এর মতো আমরাও মনে করি, হিন্দু এবং মুসলমান–এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা এব্যাপারে যেভাবে এগোচ্ছেন তার দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সামনে এখন একটাই বড় প্রশ্ন–এই সমস্যা সমাধানে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্য নেব, না ফিরে যাব সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধর্মদ্রোহে! **–আলোক মিত্র**

সালের মার্চে অযোধ্যারই কাছাকাছি ছিলেন। যাই হোক, আসল 'বাবরনামা'য় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে যে, এপ্রিলের ২ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখের বিবরণ লেখা পাতাগুলি হারিয়ে গিয়েছে। সুতরাং লেডি বেভেরিজের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করাও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক বোঝা যায় না বাবর আদতে অযোধ্যা গিয়েছিলেন কিনা। তিনি রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন কিনা অথবা ধ্বংস করেছেন, তা তাঁর জীবনীতেই লেখা থাকতে পারত। কিন্তু ওই পাতাগুলি না থাকায় এবং ঐতিহাসিকদের রঙচঙে কলমের খোঁচায় ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বৃটিশ ঐতিহাসিকদের এই তথ্যের বিরোধিতা করে এ·কানিংহামের তথ্য পাল্টা যুক্তি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে ('রিপোর্ট অব আরকিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম–১–১৮৬৪)। কানিংহাম গুটিকয় বৃটিশ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম, যাদের দিনপঞ্জী বিতর্ক সৃষ্টি করে নি। এইসব ঐতিহাসিক যদিও স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলি মুসলমানরা ধ্বংস করেছে, তবু বাবরের বিরুদ্ধে তাঁরা নির্দিষ্টভাবে কোনও তথ্য পেশ করেন নি। তিনি লিখেছেন, 'সেখানে অনেক পবিত্র ব্রহ্মনিকাল (হিন্দু) মন্দির ছিল এবং সেগুলি ছিল অযুধ্যাতে (অযোধ্যা), তবে সেগুলি সাম্প্রতিককালে তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া তাতে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে অধিকাংশ প্রাচীন মন্দির যে মুসলমানেরা ধ্বংস করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রামকোট অথবা হনুমানগড়ি–শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এইসব মন্দির প্রাচীন স্থাপত্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়। অর্থাৎ প্রাচীন মন্দিরের ওপরই ছোট প্রাচীর দিয়ে এগুলি তৈরি। তবে 'রামকোট' নামটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং এটি মণিপ্রভাতের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। তবে হনুমান মন্দিরের বয়সকাল ঔরঙ্গজীবের সময় থেকে পুরনো নয়।'

এতসব সত্ত্বেও দেখা যায়, বাবরি মসজিদ মন্দিরের জায়গাতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে–এই তথ্যকে জোরদার করে প্রধানত মসজিদের ওপর খোদাই করা লিপি ও অনইসলামিক পিলারগুলি। একটি পিলারের লিপি স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ তৈরি হয়েছে।

বাস্তবিক, ওই খোদাই করা শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, বাবরের নির্দেশে, অওয়ধে নিযুক্ত প্রতিনিধি শাসক আমীর মীর বাকিই মসজিদটি নির্মাণের আদেশ দেন। লেডি বেভেরিজ লিখেছেন, বাবর যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন এই নির্দেশ দেওয়া হয়। সময়টি ছিল ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ ৯৩৪ হিজরি। ওই সময় হিন্দুদের প্রাচীন মন্দিরের মর্যাদা উপলব্ধি করে তিনি মন্দির স্থানান্তরিত করে মহম্মদের একান্ত অনুগামী হিসেবে মন্দিরের বদলে মসজিদ তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। মসজিদটি সম্পূর্ণ হয় পরের বছর ৯৩৫ হিজরি বা ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে। তবে একথা কিন্তু বাবরনামার কোথাও লেখা নেই। এও
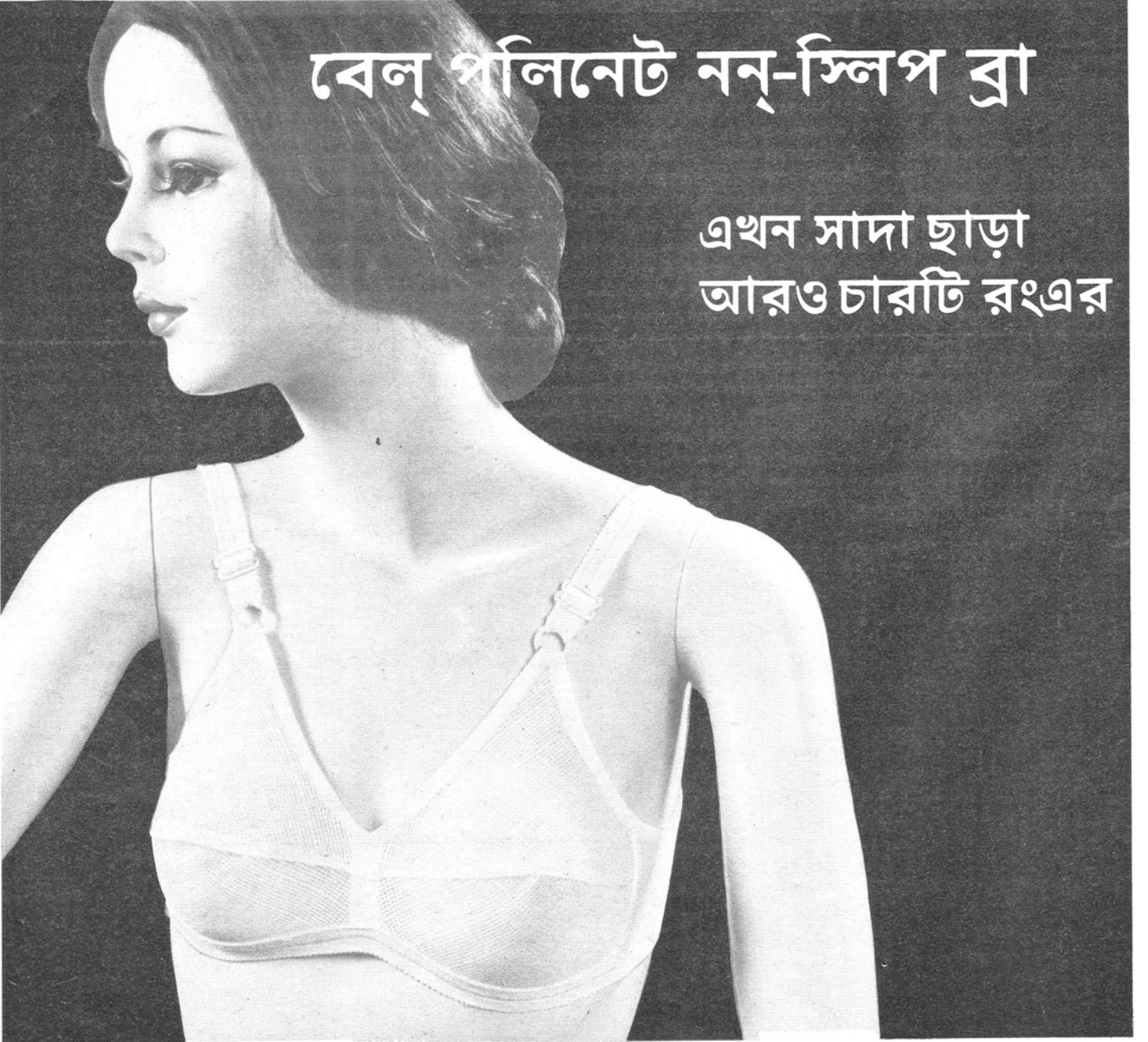
বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৬.৫০) পলিনেট রঙিগন (মূল্য ২৯০০)

ত্বকে বাতাস পৌঁছতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশি

'বিমল' পলিনেট দিয়ে তৈরী বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠান্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না। বহু বার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশনদুরুস্ত দেখায়।

'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর–এ সবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে বেল্ পলিনেট নন্ স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল্-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন- কটন টেপ	১১.০০
২ x ২ রুবিয়া কটন টেপ	১৩.৫০*
কটন ইলাসটিক টেপ	১৬.২৫
'বিমল' পলিয়েস্টার রুবিয়া	১৯.২৫
২ x ২ রুবিয়া ইলাস্টিক টেপ	২০.৫০*

*লাল, কালো, গোলাপী ও গায়ের রঙে পাওয়া যায়

belle

Polynet Non-Slip Bra

Belle Wears Pvt. Ltd.
54/B, Suburban School Road,
Calcutta—700 025
Phone: 48-3708

বরাহকল্প

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণু হলেন সর্বশক্তিমান, মনে করা হয় জন্তু অথবা মানুষ ধারাবাহিক ভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এই রক্ষাকর্তা হিসেবে এবং দানব ও অপদেবতাদের হারিয়ে ভগবানকে উদ্ধার করতে। এই ব্যাপারে অধিকতর উন্নত অতিকথা হলো বিষ্ণুর তৃতীয় আবির্ভাব বা অবতার: যখন বিষ্ণু মৎসসৃষ্টি পৃথিবীকে মহাজাগতিক সমুদ্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করার জন্য বরাহ রূপে অবতীর্ণ হন, সেখানে তিনি দানবকে নরকে অপহরণ করেন। এই ঘটনাটি কল্প (প্রত্যেকটি কল্প ৪ লক্ষ কোটি, ৩২০০ লক্ষ বছর) যুগের উষা কালে, এবং বলা হচ্ছে 'দ্য ক্রিয়েশন অব দ্য বোর' (বরাহ কল্প)।

পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবর্তমের শুরু। এই বিবর্তনের ফলে উষ্ণ রক্তের আবির্ভাব হয় স্থলভাগে, যার মধ্যেই মানব ইতিহাস বিকশিত হয়। এই অদ্ভুত নাটক সম্পর্কে পূর্বাভাস এমনই অস্বচ্ছ যে মহাজাগতিক জলের ওপর বিচ্ছুরিত নরকের আলো যেমন সব কিছু স্পষ্ট করে না, তেমনি আমাদের ধারণাকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেয়।

কিন্তু বিবর্তনের এই পিছিয়ে আসা ভারতীয় দৃষ্টিতে নেহাৎই দৈবের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রতিনিয়তই প্রতিপক্ষের সংঘর্ষ, বিরোধ, প্রতিরোধ, ঝগড়া ও বিবাদ জমে উঠছে। হিন্দু পুরাণের এই আদর্শ একটি নারকীয় সরিসৃপ সৃষ্টি করছে। বর্তমান 'কল্প'র অতি প্রত্যুষ থেকেই এটি ঘটেছে। এইভাবে পৃথিবীর বিকাশ সাগরের তলদেশে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

ঠিক এই সময়ে বিষ্ণু বরাহের রূপ ধারণ করেন। বরাহটি উষ্ণ রক্তের জন্তু, থাকবার জায়গা হিসাবে মর্ত্যকে বেছে নিয়েছিল এবং জলাভূমিতেই তিনি থাকতেন। জলজন্তুদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বিষ্ণু এই আকার নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। বিশাল আকৃতির সাপকে পরাজিত করে তাকে পর্যুদস্ত করেন। জন্তু রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান তার দুটি হাতে উচ্ছল পৃথিবীকে ধারণ করলেন এবং তার মুখের উপরিভাগ জড়িয়ে ধরে সমুদ্রে নিয়ে এলেন।
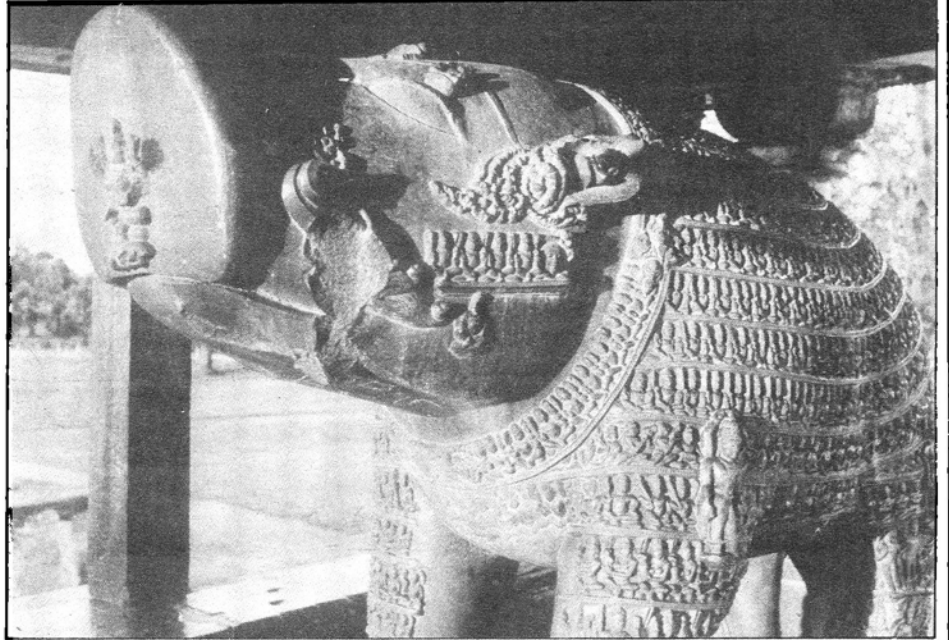
অসীমের আঁধার হিসাবে বিষ্ণু সহজাত প্রেরণা বলেই জলের রাজা সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রতিকী ভাবে ভগবান সর্প যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন না। সর্পকে পরীক্ষা করা হয়, কারণ পৃথিবীকে বিপদ মুক্ত করা দরকার। বাস্তবিক এ থেকে বিষ্ণুর তাবৎ সত্তা-রূপ বিকশিত হয়। এর বন্ধনের বাইরে পরবর্তী পর্যায়ে মহাজাগতিক শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে বরাবরই হুংকার দিতে থাকেন যে তার চেহারা খুবই খারাপ করে দেবেন। একেবারে অচেতন, ঠিক গোড়াতে যে অবস্থা চলছিল, সে অবস্থাতে ফিরে আসবে।

তখন পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না, অনন্ত রাত ও সীমাহীন নিদ্রা জগতে ডুবে ছিল সমুদ্র। বিষ্ণু তার অস্তিত্বকে লীন করতে করতে এক সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক হিসেবে পরিবর্তিত করলেন। বর্তমান সময়ে উষ্ণ রক্তের বরাহ তারই একটি রূপ মাত্র।

আলোক মিত্র

বরাহমূর্তি : খাজুরাহোর ভাস্কর্যে — ছবি: আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

দেখা যাচ্ছে যে, ৯৩৫ হিজরির দিনপঞ্জীতে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়েছে। এবং ৯৩৪ হিজরির বহু দিনপঞ্জী হারিয়ে গিয়েছে, যেগুলিতে অউধের স্মৃতি গ্রন্থিত রয়েছে (বাবরনামা এ·এস· বেভেরিজের অনূদিত ১৯২২ সংযোজন—৭৭)। বেভেরিজের যুক্তি সম্ভবত স্থানীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বাবরনামা তথা উৎকীর্ণ ফলকের কোথাও কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা নেই যে, রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙে বাবর ওই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। যাই হোক, বাবরনামা অথবা শিলালিপিগুলি থেকে কিছুতেই বোঝা সম্ভব হচ্ছে না যে, বাবর অথবা তাঁর লোকজনেরাই রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করেছেন। এমন কি শিলালিপিগুলি পড়তে পড়তে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। ওখানে তিনটি উৎকীর্ণ ফলক রয়েছে। দুটি মসজিদের বাইরে এবং একটি ভিতরের মঞ্চে খোদিত। বাইরের একটি ফলকে ছ'লাইন লেখা ও অন্যটি এক লাইনের। এগুলি দু লাইন বিশিষ্ট চরণে লেখা।

> বা-ফার্মুদা—ই-শাহ বাবর কী আদিলাশ
> বানিয়াতইস্ট
> তা হাখ—ই-গারদুম মুলাকি
> বানা ফারদ ইন মুহাবিত-ই-কুদসিয়ান
> আমির—ই-
> সাদাত—নিশান মীর বাকি
> বাভা খাইর বাকি : চু সাল-ই-বানাইশ
> ইয়ান শুদ কী গুফতাম, বাভাদ কাইর বাকি
> (৯৩৫)

এর অনুবাদ :

> সম্রাট বাবরের নির্দেশে, যাঁর
> বিচার বোধ স্বর্গের মত উচ্চ,
> মহান হৃদয়ের মীর বাকি
> এই ফরিস্তাদের উজ্জ্বল স্থান নির্মাণ
> করলেন।
> এই মহত্ত্ব বাবা খায়েরের জন্য
> চিরকালই থাকবে।
> নির্মাণের তারিখ: ৯৩৫ হিজরি সন
> (অথবা ১৫২৯ খৃঃ) (বেভেরিজের অনূদিত
> বাবরনামা)

লেডি বেভেরিজের অনুবাদ অবশ্য সবটাই নিখুঁত নয়, বিশেষ করে তিনি 'বা-ফারমুদা-ই-শাহ বাবর'—এর অনুবাদ করেছেন, 'বাবরের আদেশ দ্বারা'। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত জমিজমা, যা সম্রাটেরা দখল করতেন, তা শাসকের নামেই থাকত। এভাবেই জমিগুলি শাসকদের কল্যাণে লাগত। এও হতে পারে যে, মীর বাকি সম্রাট বাবরকে খুশি করতেই ফলকে তাঁর নাম উৎকীর্ণ করেছেন। ওই সময়ে কোন রাজকীয় আদেশ ছিল না মসজিদ নির্মাণের জন্য। এই রাজকীয় আদেশকে 'ফরমান'ও বলা হতো। অন্যদিকে দিল্লির বাবরি মসজিদের ব্যাপারে 'ফরমান' শব্দটি অবশ্য রেকর্ডে ছিল। কিন্তু অযোধ্যার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না।

অনুমোদিত দোকান:

বি এণ্ড বি এন দে, 'জি' ব্লক, নিউমার্কেট; **পরিধান,** সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে; **যশোদা স্টোর্স,** ১০৩বি, বিধান সরণী; **জগন্নাথ স্টোর্স,** সুভাষ কর্ণার, হাতিবাগান; **কলেজ স্টোর্স, ৫৫,** কলেজ স্ট্রীট; **পূর্ণিমা,** ডবলিউ/বি, ২৬, এন্টালি মার্কেট; **বিচিত্রা,** ৮৯ রাসবিহারী এভেনু; **রঞ্জিত স্টোর্স,** বেহালা; **অঙ্গশোভা,** গড়িয়া; **স্বর্ণময়ী,** যাদবপুর; **লিব্বাস,** ৫৩এ, এইচ এম রোড; **নিউ ওয়েল,** লেক টাউন; **সাহা ড্রেসেস,** কদমতলা; **রূপ-রঙ্গ,** সালকিয়া; **রাধেশ্যাম বস্ত্রালয়,** কাছারী বাজার, বারুইপুর; **পোদ্দার ব্লাউজ হাউস,** নৈহাটী সুপার মার্কেট; **অশোকা স্টোর্স,** কাঁচড়াপাড়া; **গৌরী স্টোর্স,** বারাকপুর; **তনুশ্রী,** সোদপুর; **গান্ধী স্টোর্স,** মধ্যমগ্রাম; **পূর্বাশা,** শ্রীরামপুর; **তারক এম্পোরিয়াম,** চুঁচুড়া; **অঙ্গশ্রী,** নবগ্রাম, কোন্নগর; **সূর্যকমল,** কাঁথি; **রাম নারায়ণ হরিকিষণ,** মেদিনীপুর; **নিউ টিপ টপ,** গোলবাজার, খড়গপুর; **কিশোর কুমার পারমার,** আনারা; **ব্লাউজ মিউজিয়াম,** আসানসোল; **ফ্যাসন হাউস,** চিত্তরঞ্জন; **ইন্দ্রালয়,** রাণীগঞ্জ; **প্রার্থনা স্টোর্স,** বাঁকুড়া; **জয়শ্রী,** পুরুলিয়া; **গৌরী ড্রেসেস,** মালদা; **অন্নপূর্ণা ব্লাউজ সেন্টার,** বালুরঘাট; **লেডিস কর্ণার,** প্রভাকর মার্কেট, রামপুরহাট; **ম্যাদামস্,** রায়গঞ্জ; সন্তোষ পাল, বনগাঁ; **পদ্মশ্রী ড্রেসেস,** নালিকুল; **নরুলা ক্লথ হাউস,** মার্কেট বিল্ডিং, ভুবনেশ্বর; **জিতেন ফ্যাক্টরী,** সেন্ট্রাল রোড, শিলচর।

এমন কি মসজিদের বাইরে উৎকীর্ণ লিপির ক্যালিগ্রাফীর ধরন দেখলেও সন্দেহ জাগে।

বিশিষ্ট উর্দু সমালোচক ও পার্সি পণ্ডিত শামসুর রহমান ফারুকির অভিমতটি দেখা যাক। তাঁর মতে, মসজিদ তৈরির ব্যাপারে বাবরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। ওই লিপিটি আসলে 'বা-হুকম মহাম্মদ জাহির–উদ–দিন গাজি বাবর'– কিন্তু 'বা-ফারমুদা–ই-শাহ বাবর' হবে না। পরের লাইনটির মানে 'সম্রাট বাবরের ইচ্ছে।' ফারুকির বক্তব্য: ক্যালিগ্রাফির ধরন দেখে মনে হয় যে, এটি উনবিংশ শতকেই উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রাচীন লেখার ধরনটা অনেক সূক্ষ্ম ছিল। আগের লিপির তুলনায় এই লিপি অনেক মোটা আর ভারি ধরনের। তিনি এও মনে করছেন যে, পার্সিতে অনভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির লেখা এটি।

তবে এই রাজকীয় 'ফরমান'-এর অনুপস্থিতি তথা লিপি ও ক্যালিগ্রাফি দেখে অনুমান করা যায়, (বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়) যে এই উৎকীর্ণ লিপি সম্ভবত মন্দির-মসজিদ বিতর্কের কিছু পরেই লেখা হয়েছে। এবং তা ১৯ শতকের পরেই। সম্ভবত কোন ব্যক্তির জোর দাবি ছিল যে, ওই মসজিদটি বাবরের আদেশেই তৈরি হয়েছে। মসজিদের প্রচার বেদীতে উৎকীর্ণ চরণগুলি যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করলেই এই সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়। প্রথম লাইনেই আছে ঈশ্বরের প্রশস্তি। দ্বিতীয় লাইনে নবী মহম্মদকে মহিমান্বিত করা হয়েছে এবং তৃতীয় লাইনে বাবরকে শক্তিমান সম্রাট বলে প্রশংসা করা হয়েছে। কোথাও কিন্তু বাবরের নির্দেশের কথা নেই। পাশাপাশি, এই দুটি স্তবকে কোনভাবেই উল্লেখ নেই যে আশপাশে রামজন্মভূমি কিংবা কোথাও কোন হিন্দুমন্দির রয়েছে।

মসজিদের স্থাপত্যের স্টাইলটিও বিশিষ্ট ধরনের। তথাকথিত বাবরি মসজিদের স্থাপত্য কারুকার্য ছিল জৌনপুরী কারুকার্যের অনুসরণে রচিত। জৌনপুরের শারকি রাজারা বাড়ি তৈরির জন্য হিন্দু রাজমিস্ত্রীদের কাজে নিতেন। তবে তারা সঠিক ধনুকাকৃতি খিলান বানাতে পারতেন না বলে জানা যায়। অধিকাংশ শারকি মিনার বিচিত্র ধনুকাকৃতি ধাঁচের এবং তাকে ধরে রয়েছে একটা বিম। অন্যদিকে মসজিদের গম্বুজগুলিও বিচিত্র শারকি স্থাপত্যের নিদর্শন। বাস্তবিক, যদি মসজিদটি পিছন থেকে দেখা যায় তবে তা জৌনপুরের অটালা মসজিদের মত দেখাচ্ছে। এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে ১৫ শতকে যখন তুর্কিরা দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছিল তখন গম্বুজের নকশার বেশ উন্নতি ঘটিয়েছিল। যদি বাবরের আমলে অর্থাৎ ১৬ শতকে মসজিদটি তৈরি হতো, সেক্ষেত্রে তখনকার স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য পাওয়া যেত।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো– মসজিদের তত্ত্ব সমর্থকদের চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে যে মসজিদটি মন্দিরের জমিতেই তৈরি হয়েছে। বৃটিশ পর্যবেক্ষকদের আরোপিত মত হলো, ভারতে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে অযোধ্যাতে হিন্দুমন্দিরের অবমাননার প্রচেষ্টা চলে। অর্থাৎ এ দেশে ইসলামীকরণের বিষয়টি অযোধ্যা থেকেই শুরু হয়। এই আরোপিত মতটি হলো, মন্দির ধ্বংসকারীরা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়া ছিল। 'কোরান'-এ স্পষ্টই নির্দেশ রয়েছে যে, বিবাদাস্পদ জায়গাতে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ। বিশেষ করে নিয়মিতভাবে যেখানে অন্য ধর্মের প্রার্থনা হয়েছে সেখানে মসজিদ নির্মিত হতে পারেনা। যদিও এটা বরাবরই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে যে, মন্দির ধ্বংসের পরই কাছাকাছি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার একটি আগাম মত জানিয়ে রাখি যে, বেনারস ও মথুরাতেও ধ্বংস

কৈকেয়ী ভবন

কড়া সুরক্ষায় দেবতা

'জন্মভূমি'-র দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভা

হওয়া মন্দিরের জায়গায় কোন মসজিদ নিতান্তই বিসদৃশ। তবে ধ্বংস হওয়া মন্দিরের কাছাকাছি মসজিদ থাকতে পারে। তবে যেখানে মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, ঠিক সেখানেই মসজিদ তৈরি হয়েছে–এটা ঠিক নয়। এটা স্পষ্টই মুসলিম ধর্ম–বিরোধী। বাবরের মত একনিষ্ঠ কোরান-পাঠক ও অনুগামী কি কখনোই একটি বিখ্যাত মন্দিরের জায়গায় মসজিদ নির্মাণের মত ভুল পদক্ষেপকে মেনে নেবেন?

জন্মভূমি মন্দির

বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম জন্মভূমির অস্তিত্ব ছিল–এটি মূলত স্থানীয় মিথ তথা লোকবিশ্বাস। বাস্তবিক, এ ব্যাপারে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নেই যে, রাম ঠিক কোন জায়গাটিতে জন্মেছিলেন। এমন কি হিন্দুধর্মের পুরাণগুলিতেও এরকম কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই বিশ্বাসের উৎস হলো বাল্মীকি রচিত রামায়ণ, যেখানে অযোধ্যাকে রামের জন্মভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

মুসলিম পর্যটক ও তাদের ধারাবিবরণী থেকে অযোধ্যার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে তাদের কেউই কিন্তু রামজন্মভূমি সম্পর্কে কোন কিছু জানান নি। এই পর্যটকদের মধ্যে আছেন–সয়ীদ সালার মাসুদ, যার পুস্তকের নাম 'মীরাত-ই-মাসুদি', ইবন বতুতা–যার পুস্তকের নাম 'রাহেলা,' এছাড়া 'বাবরনামা'। অন্যদিকে 'আইন-ই-আকবরী'র রচয়িতা আবুল ফজল লিখেছেন যে অযোধ্যাকেই রামজন্মভূমি বলা হতো, কিন্তু তিনি কোথাও লেখেন নি যে রামজন্মভূমি নামে কোনও মন্দির আদতে ওখানে ছিল কি না। এ বিষয়ে মহম্মদ ফৈজ বকসের 'তারিখ–ফারাহবাখস'–এর নাম করা যেতে পারে। এই বইয়ে ফৈজাবাদে ১৭২০ সাল থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আছে। এই বইয়ের কোথাও লেখা নেই যে কোন হিন্দু তীর্থস্থানের জায়গায় মসজিদ তৈরি হয়েছে। এমন কি বাবরি মসজিদ/রামজন্মভূমি সংক্রান্ত কোন সাম্প্রদায়িক ঝামেলার ইঙ্গিতও নেই। তবু ওই মসজিদের ১৪টি ইসলামিক পিলার একটি বিচিত্র প্রশ্ন তুলেছে। সেটি হল–বাবরি মসজিদ কি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি হয়েছে? অথবা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কি বাবরি মসজিদ তৈরিতে কাজে লেগেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া শক্ত। কারণ এ বিষয়ে লিখিত কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নেই।

পয়গম্বরদের মাজার, কানিংহ্যাম-এর বক্তব্য, যেখানে এগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে একসময় বুদ্ধের আসন ছিল
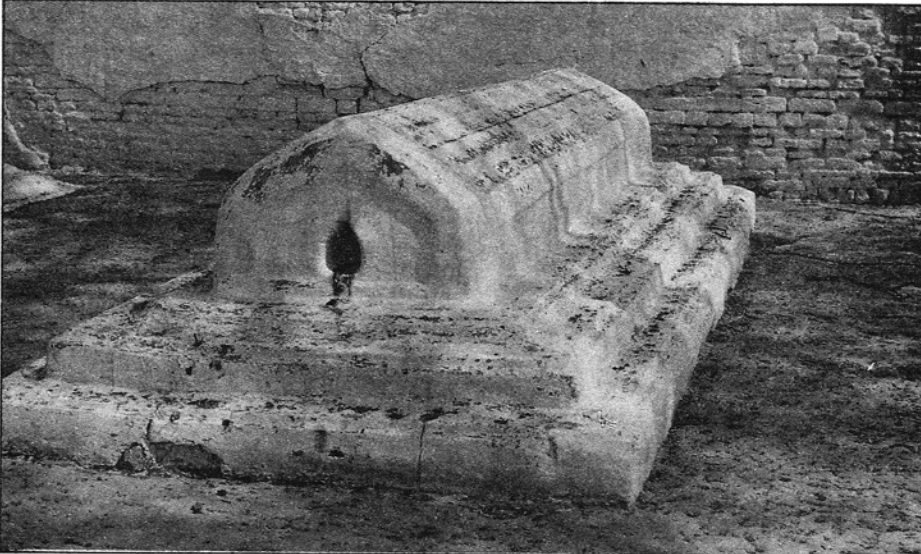
পশ্চিম দিক থেকে স্পষ্ট যে বিতর্কিত ধর্মস্থানটি একটি টিলার ওপর স্থাপিত ছবি: রাজেন্দ্র কুমার
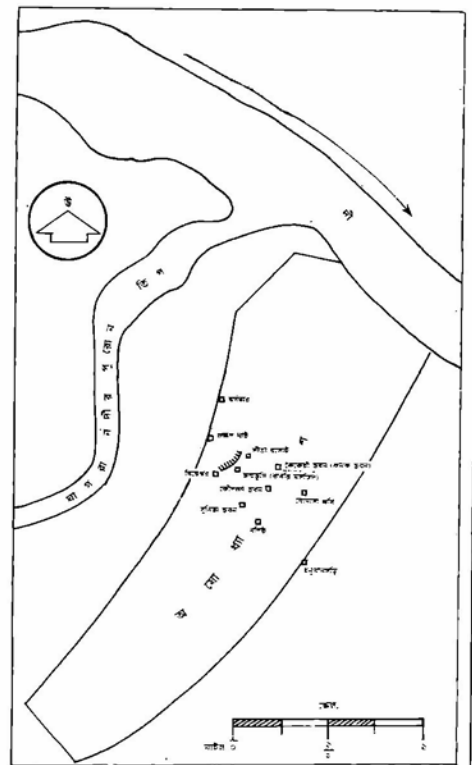
'অযোধ্যা মাহাত্ম্য'-এ বর্ণিত জায়গাগুলি

স্থানীয় মিথ অনুযায়ী, বিক্রমাদিত্য অযোধ্যাতে এসে যে রামজন্মভূমি মন্দির তৈরি করেছিলেন, তার ৮৪টি স্তম্ভ ছিল। অভিযোগ করা হয়েছে, বাবর ওই মন্দিরটি ধ্বংস করেছেন এবং মসজিদ নির্মাণে ওই স্তম্ভগুলি কাজে লাগিয়েছেন। এই স্তম্ভগুলি এখনও ভালো অবস্থাতেই রয়েছে। এগুলি যথেষ্ট আঁটোসাটো, গাঢ় রং বা কালো পাথরের–যা মূলত: কস্টিপাথর নামে পরিচিত। তাছাড়া স্তম্ভগুলি বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা কৃত খোদাই বোঝা যায়। স্তম্ভগুলি সাত আট ফুট লম্বা–গোড়াটা অর্ধভুজাকৃতি, মাঝখানটি গোলাকৃতি।
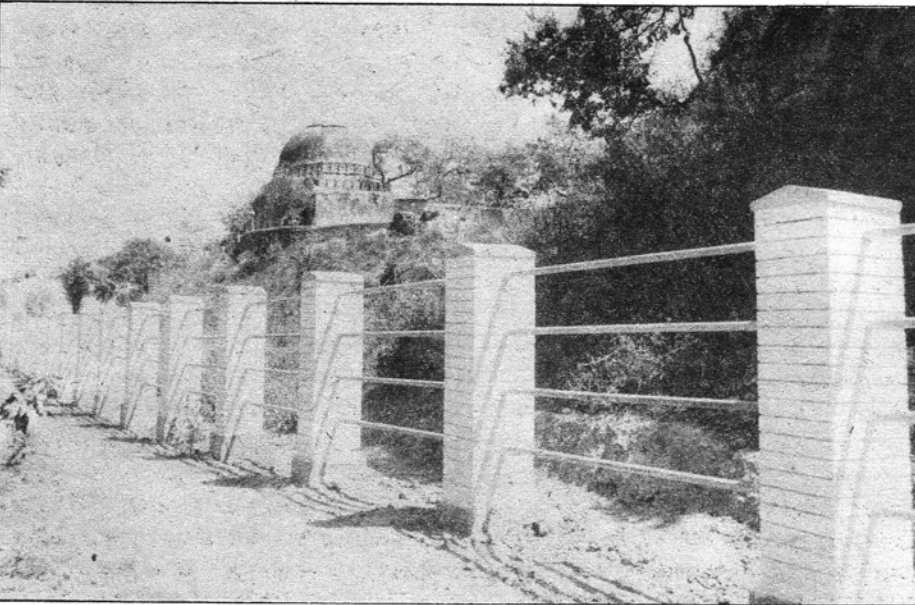
মসজিদের ব্যবহৃত দুটি স্তম্ভের অনুরূপ স্তম্ভ অর্ধেক সমাহিত অবস্থায় দেখা যায় স্থানীয় ফকির মুসা আসিকানের কবরের কাছে। যখন এই স্তম্ভগুলির ছবি দুই তাবড় বিশেষজ্ঞ-অধ্যাপক এম.এ ঢাকে এবং রামনগরের আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজ, সেন্টার অফ আর্ট অ্যান্ড আর্কিয়োলজির ডঃ কৃষ্ণদেওকে দেখানো হয় (এ প্রসঙ্গে জানাই যে বাবরি মসজিদের থামগুলির ছবি তোলার অনুমতি আমরা পাইনি, কিন্তু এর অনুরূপ থামগুলোর ছবি আমরা তুলি) তখন তারা স্পষ্ট জানালেন যে, এগুলির নির্মাণ নবম খৃস্টাব্দ থেকে একাদশ খৃস্টাব্দের মধ্যে করা হয়েছে। এইরকমভাবে যদি বাবরি মসজিদের স্তম্ভগুলির ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে, এগুলি ৮ম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের আমলে তৈরি হয় নি। এমন কি তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বিক্রমাদিত্য রাম জন্মভূমিতে মন্দির তৈরি করেছিলেন, সেক্ষেত্রেও এই স্তম্ভগুলি কোনভাবেই ওই মন্দিরের অংশ নয় বলে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। এবারে রামের জন্মভূমি অর্থাৎ যেখানে রাম জন্মেছিলেন বলে প্রচলিত, সেই তীব্র কৌতূহলকর প্রশ্নে আসা যাক। এই রামের জন্মস্থান নিয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে গেলে তীর্থযাত্রীদের পুরনো গাইড 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য'র পাতা ওল্টানো দরকার। এখান থেকেই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' সংস্কৃতে লেখা, তবে এর ইংরেজি অনুবাদ (রাম নারায়ণকৃত) প্রকাশিত হয় 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'–এ (ভল্যুম ৪৪ পার্ট ১–নং ১ থেকে ৪, কলকাতা ১৮৭৫)। অযোধ্যার মহারাজ মান সিং দাবি করেছিলেন যে এই 'মাহাত্ম্য' আসলে ইক্ষাকুবংশের কীর্তিমালা। অন্যদিকে অযোধ্যার পণ্ডিত উমা দত্ত জানিয়েছেন, 'মাহাত্ম্য' হলো স্কন্দ ও পদ্ম পুরাণেরই অংশ। অযোধ্যার রাজার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

তবে পণ্ডিত উমা দত্তের মতামত অনেক বিশ্বাসযোগ্য, কারণ আমরা জানি যে, এইসব মাহাত্ম্য লেখার চল ষোড়শ শতকেই জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আর 'অযোধ্যা মাহাত্ম্যের' সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে। এখানে প্রয়াগকে দু বার ইলাহাবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬ শতকে সম্রাট আকবর এই শহরকে প্রয়াগ ইলাহাবাদ আখ্যা দিয়েছিলেন। সম্ভবত শাহজাহানের আমলে বা তার পরে এই 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' লেখা হয়েছিল। 'মুসলমান' শব্দটিকেই আমরা 'মাহাত্ম্য'তেই দেখতে পাই। এই শব্দের প্রচলন ঘটেছিল ৮ম শতাব্দীর পরেই।

বাস্তবিক 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' রচিত হয়েছিল আকবরের আমলে অথবা তার পরে। কারণ তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'–এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই এই সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করে। 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য'য় রামের জন্মভূমি বিষয়ে দুটি উল্লেখ আছে। এই বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর বুঝতে পারি যে রাজা দশরথের চারপুত্র তার তিন রানীর প্রাসাদে জন্মান। এর একটি হলো 'সীতারসোই'–যেটি জন্মভূমির উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। জন্মভূমির চল্লিশ গজ উত্তরে কৈকেয়ী প্রাসাদ, যেখানে ভরত জন্মেছিলেন (স্মরণ করা যেতে পারে যে. কৈকেয়ীর প্রাসাদ কনকভবন হিসেবে পরিচিত ছিল–কারণ 'মুহ দিখায়ী' (মুখ দেখা) অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি এটি সীতাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ষাট গজ দক্ষিণে সুমিত্রার বাড়ি–সেখানে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মেছিলেন। জন্মভূমির দক্ষিণপূব অঞ্চলের নাম ছিল 'সীতা কূপ' যাকে সকলে 'জ্ঞান কূপ' বলেই চেনেন (অযোধ্যা মাহাত্ম্য–দশম অধ্যায়)। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, 'এরপরে, (তীর্থযাত্রীর) রাম জন্মভূমিতে যাওয়া উচিত। বিঘ্নেশ্বরের পূর্ব অথবা বশিষ্ঠের বাসগৃহের উত্তরে কিংবা বোমাসা ঋষির পশ্চিমে এই জন্মস্থান, স্বর্গে পৌছবার জায়গা বা মোক্ষ পাবার স্থান–যা দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না (অযোধ্যা মাহাত্ম্য, ৭ম অধ্যায়)। তবে সম্প্রতি রামের জন্মভূমি বলে পরিচিত জায়গাটি কী 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য'র নির্দেশ অনুযায়ী বা চিহ্ন মোতাবেক সেই স্থান?

'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' অনুযায়ী–সীতারসোই (সীতার রান্নাঘর) জন্মভূমির উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত–যা কৌশল্যাভবন হিসেবেই চিহ্নিত। সেখানে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, সম্প্রতি যাকে সীতারসোই বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা বাবরি মসজিদ থেকে ২৫ গজ দূরে অবস্থিত। ধর্মীয় তাত্ত্বিকরা এই স্থানটিকেই রামজন্মভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এখানেই বাবরি মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে (মানচিত্র দেখুন)। আবার দেখা যায়, দশরথের তিন রানীর প্রাসাদ একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। যেটা উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছে। কৈকেয়ীর প্রাসাদ একেবারেই উত্তরে। 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' অনুসারে জন্মভূমি কৈকেয়ী ভবনের দক্ষিণ দিকে ৪০গজ দূরে। আবার, অযোধ্যা মাহাত্ম্য থেকে এও জানতে পারি যে সুমিত্রার প্রাসাদ জন্মভূমি থেকে ৬০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমানে প্রদত্ত নকশা থেকে জানতে পারি যে সুমিত্রার প্রাসাদটি বাবরি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল।

জন্মভূমি তথা বিঘ্নেশ্বর, বোমাসা ঋষি এবং বশিষ্ঠের বাসস্থান এগুলি বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাই যে মসজিদটি (সোজাসুজি পূর্বদিকের পরিবতে) বিঘ্নেশ্বরের কুটিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমে (উত্তরদিকের পরিবর্তে) বোমাসা ঋষির কুটির, সেদিকেই বশিষ্ঠের কুটির। বাস্তবিক, 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' অনুসারে যে জায়গাটির সঠিক অবস্থান বর্তমানেও মিলিয়ে নেওয়া যায় তা সীতাকূপ। সীতাকূপটি মসজিদের সরাসরি দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত। কিন্তু অযোধ্যা–মাহাত্ম্যের কোথাও এতটুকুও উল্লেখ নেই যে–বিতর্কিত জন্মস্থানটি জন্মভূমি ঠিক কোথায় ছিল? যদি 'মাহাত্ম্য'র তথ্য বিশ্বাস করতে হয় তবে আমাদের নিশ্চয় করে ধরে নিতে হবে রামের জন্মভূমি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণেই অবস্থিত।

কাজেই, রামের জন্মভূমি বলে পরিচিত স্থানটিতে বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা হলেও এমন কোনও প্রাচীন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, যা থেকে বোঝা সম্ভব যে ওখানে মসজিদের আগেই জন্মভূমি মন্দির ধরনের কোন পূণ্য স্থান ছিল। তাহলে কি থাকতে পারে সেখানে? অন্য কোন হিন্দু মন্দির?

কিংবা একটি বৌদ্ধমঠ?

১৮৬২ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল এর মধ্যে মেজর জেনারেল এ.ই কানিংহাম উত্তরভারতে বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ফা-হিয়েন ও হিউ এন সাং-এর বিবরণের দুটি জায়গা খুঁজতে শুরু করেছিলেন। ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং হিউ এন সাং এসেছিলেন ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে। কানিংহামের সিদ্ধান্ত ছিল যে ফা-হিয়েন যাকে 'সা–চী' এবং হিউ এন সাং যাকে 'বিশাখা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সেই দুটো জায়গাই আসলে এক। তাদের প্রদত্ত ভৌগোলিক অবস্থান অনুসরণ করলে দেখা যায় যে সাকেত বা অযোধ্যার অবস্থানও ঠিক ওই জায়গাতেই। তাঁর 'আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট' (১৮৬২–৬৩)–এ কানিংহাম জানিয়েছেন, 'আমি দেখাতে চাই যে ফা-হিয়েনের সা–চী ও হিউ এন সাং–এর বিশাখা একই জায়গা। এবং দুটিই সাকেত অথবা অযুদ্ধা নামে পরিচিত। ফা-হিয়েনের সা-চীর ব্যাপারে ফা-হিয়েনের বর্ণনা ছিল এইরকম–ওই শহর থেকে দক্ষিণ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আপনারা দেখবেন পূবদিকের রাস্তার পাশের জায়গায় বুদ্ধদেবের দাঁতনের একটি গাছ রয়েছে, এবং তা মাটি থেকে ৭ ফুট উঁচু। তা বাড়েওনি বা কখনো কমেনি। এখন এই উপকথার বিবরণ পাওয়া যায় হিউ এন সাং–এর বিশাখাতেও। তিনি বর্ণনা করেছেন 'রাজধানীর দক্ষিণ দিকে, এবং রাস্তার বাঁ দিকে (ফা-হিয়েন একেই পূর্বদিকে বলেছেন)– অন্যান্য পবিত্র জিনিসের পাশাপাশি ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা একটি গাছ রয়েছে। এটি বাড়েও না, কমেও না। এটিই বুদ্ধদেবের সেই দাঁতন গাছ।'

কানিংহামের এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় বি.সি.ল (লাহা)–র বিবরণে। বি.সি.ল প্রাচীন ভারতীয় ভূগোলের সর্বজন স্বীকৃত পণ্ডিত। তাঁর 'আইডোলজিকাল স্টাডিস'–এ (৩য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়–এলাহাবাদ–১৯৫৪) তিনি লিখেছেন যে অযোধ্যা অথবা অযুধ্যা বা অউধ হলো হিন্দুদের সাতটি পবিত্র তীর্থস্থানের একটি। ফা-হিয়েন একেই সা–চী বলে বর্ণনা করেছেন এবং গ্রীক জোতির্বিদ টলেমির বর্ণনায়–এই স্থানের নাম সোগোদা। এই শহরটি সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত।

এবং এটি বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র স্থান। পালি সাহিত্যের অনুসারে সরযূ বা সরভূ হলো অযোধ্যার ঘাগরা অথবা গোগরা।

গৌতম বুদ্ধ যে সাকেতে থাকতেন এ ব্যাপারে কানিংহাম স্থিরনিশ্চিত। সিংহলী ও বার্মিজ বৌদ্ধদের বার্ষিক ঘটনালিপি থেকে জানা যায় যে বুদ্ধ যখন বৌদ্ধত্ব লাভ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। ২০ বছর গৃহহীন অবস্থায় উত্তর ভারতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বার্ষিক বিবরণে এইসব তথ্যাদি রয়েছে। কানিংহাম তাঁর 'পুরাতত্ত্ব বিবরণ' (আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট– ১৮৬২–৬৩)–এ লিখেছেন, 'বুদ্ধর বাৎসরিক ভ্রমণের বিবরণ থেকে আমি যা পেয়েছি, তা প্রত্যক্ষ বিবরণই।' সিংহলী বর্ষপঞ্জী অনুসারে, বুদ্ধদেব ৩৫ বছর বয়সেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। সে সময় গৃহহীন হিসেবে ২০ বছর ধরে উত্তরভারতে পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। ওই পঞ্জীতে এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। বাকি ২৫ বছরের ৯ বছর তিনি শ্রাবস্তীর জেথবন মঠে কাটান এবং ১৬ বছর সাকেতপুরার পুভারামো মঠে অতিবাহিত করেন। তবে বর্মী ঘটনাপঞ্জীতে দেখতে পাচ্ছি যে ৯ বছর হয়েছে ১৯ বছর এবং ১৬ বছর লেখা হয়েছে ৬ বছর হিসেবে। শেষ অংকগুলি হিউ এন সাং–এর বিবরণে আমরা পাই। এই প্রমাণ বেশ নির্ভরযোগ্য। দুটো জায়গায় বুদ্ধদেব বেশ কিছুদিন ছিলেন। তার মধ্যে শ্রাবস্তীতে তিনি হয় ৯ অথবা ১৯ বছর ছিলেন, সাকেতেও ছিলেন ৬ বছর। এবং সাকেত শ্রাবস্তীর দক্ষিণ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। তথ্য মোতাবেক বলা যায় যে সাকেত আদতে বিশাখাই।

অযোধ্যার একটি প্রাকৃতিক বিশেষত্ব কানিংহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হল যে গোটা শহরে বেশ কয়েকটি 'টিলা' রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন (আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট–১৮৬২-৬৩): 'অযোধ্যার পূর্বদিকে তিনটি মাটির টিলা রয়েছে এবং প্রত্যেকটির দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল। এগুলির নাম: মণি পর্বত, কুবের পর্বত, সুগ্রীব পর্বত।' তবে কানিংহাম যা লেখেননি, তা হল আর একটি টিলার উপস্থিতি। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই টিলার ওপরেই বিতর্কিত উপাসনাস্থানটি রয়েছে। টিলাটি ৩৫ ফুট এবং পশ্চিমে ৫০ ফুট উঁচু। বাস্তবিক, পশ্চিমদিক থেকে এই টিলাটিকে অন্যান্য টিলা (যা 'পর্বত' নামে পরিচিত)র মতই দেখায়।

এই পর্বতগুলির ব্যাপারে কানিংহাম তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, 'সনাতন হিন্দুদের বিশ্বাস অনুসারে মণি পর্বত ছিল রামকে সাহায্য করার জন্য বানরদের আখড়া। আচমকাই এটিকে এখানে বসিয়ে দেন বানররাজ সুগ্রীব। পাঁচশো ফুট দক্ষিণে দ্বিতীয় টিলাটির নাম কুবের পর্বত–এটির উচ্চতা মাত্র ২৮ ফুট। গোটা 'পর্বত'টি ইট আর সুরকি দিয়ে তৈরি। লোকেরা এটিকে খুঁড়ে অনেক ইট নিয়ে গেছে। এই এক একটা ইটের মাপ ১১ ইঞ্চি × ৭½ ইঞ্চি। মণি ও কুবের পর্বতের মাঝখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ঘেরা জায়গা রয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বা ৬৪ ফুট, চওড়া ৪৭ ফুট। এখানে দুটি ইটের তৈরি সমাধিস্থল রয়েছে। এই দুটি সিস পয়গম্বর ও আয়ুব পয়গম্বর–এর নামে উৎসর্গীকৃত। অথবা শেঠ এবং জব নবী নামেও পরিচিত।

কানিংহামের মতে, এই দুই পয়গম্বরের সমাধি আসলে তুর্কি অভিযানের সময়কার সৈনিকদের কবর। তিনি লিখেছেন যে ইসলামিক রীতি অনুসারে মৃতদেহদের রাস্তার ধার বরাবর সমাধিস্থ করা হতো। তিনি আরো জানিয়েছেন যে ইট দিয়ে ওই সমাধি তৈরি হয়েছিল সেগুলি অত্যন্ত পুরোনো। কানিংহাম শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এটাই সেই জায়গা যেখানে বুদ্ধদেব সেই আশ্চর্য দাঁতনগাছটি পুঁতেছিলেন।

কানিংহাম শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এটাই সেই জায়গা যেখানে বুদ্ধদেব সেই আশ্চর্য দাঁতনগাছটি পুঁতেছিলেন।

কানিংহামের যুক্তি অনুসারে সমাধিস্থলের কবরফলকগুলি প্রকৃতপক্ষে চারটি প্ল্যাটফর্মে প্রোথিত। ওই বেদিতে চার বুদ্ধদেব বসতেন। তিনি লিখেছেন, 'হিউ এন সাং বর্ণনা করেছেন যে দাঁতন গাছ ও মিনার চতুষ্টয়–যেখানে চারজন পূর্বতন বুদ্ধ সাধনায় বসতেন–সেটি ছিল মহান স্তূপের নিকটবর্তী। এই জায়গাটিই আসলে শেঠ আর জবের সমাধি–আমি এ ব্যাপারে নিঃসংশয়। এটি মণি পর্বতের দক্ষিণ দিক স্পর্শ করেছে। ওই দুটি সমাধিই আসলে প্রাক্তন চারজন বুদ্ধের বসার আসন'।

কানিংহামের মতে, এই মহান স্তূপ আসলে অশোকের স্তূপ। বৃটিশ পুরাতাত্ত্বিকের মতে, ওই স্তূপটি ২০০ ফুট লম্বা এবং বুদ্ধ যেখানে ৬ বছর ব্যাপী সাধনা করেছিলেন–এটিই সেই জায়গা, যা কিনা সাকেত নামে পরিচিত। কানিংহামের বক্তব্য অনুযায়ী এটিই আসলে মণিপর্বত। তাঁর কথানুযায়ী, 'এই মিনারটিই আসলে মণি পর্বত। এটি ৬৫ ফুট লম্বা-স্থাপত্যও উঁচুদরের। ধাতুর চূড়োটি প্রায় ২০০ ফুট–হিউ এন সাং এটিকে অশোকের মিনার বলেই বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলছি না। মাটি আর স্থাপত্যের এই নিদর্শনটি অতি প্রাচীন-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে এই দুটি মিনার যে ভারতের প্রাচীনতম মিনার–তাও আমি স্বীকার করি। আমি এও বিশ্বাস করি যে ওইগুলি পঞ্চম খ্রীস্ট পূর্বাব্দেরও আগে তৈরি। একটি পরিচিত ঘটনার ফলে আমার এই ধারণা হয়েছে যে সমস্ত মিনারগুলিই অশোকের আমলের, যে ক্ষেত্রে হিউ এন সাং এ ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছি। মাটির টিলাগুলি আরও প্রাচীন আমলের। তবে বৌদ্ধদের উপস্থিতি পঞ্চম খৃস্টপূর্বাব্দের আগে ভাবা না গেলেও অযুদ্ধায় মণি পর্বতের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হলো যে ওই মাটির টিলা বা নিচের অংশ বুদ্ধদেবের সময়কার আগেই তৈরি হয়েছিল। উপরের অংশটি অশোকই সংযোজন করেছিলেন।

স্বীকার করতেই হবে যে, কানিংহাম ফা-হিয়েন ও হিউ এন সাং-এর উল্লিখিত অবস্থানগুলি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শেষের জন 'বলেছেন, অযোধ্যাতে সনাতন হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি ছিল। তিনি প্রায় ৩,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ২০টি বৌদ্ধ মঠ দেখেছেন। এবং ৫০টি সনাতন হিন্দু মন্দিরও তাঁর চোখে পড়েছে। হিউ এন সাং সাকেতের কলাকর্ম ও পূর্বারামার মঠ সম্পর্কে লিখেছেন। এই দুটির কথা সিংহলী 'মহাবংশ'-এ লিখিত রয়েছে। কানিংহাম এই দুটি মঠকে সুগ্রীব পর্বত বলেই জানিয়েছেন।

কানিংহাম বলতে চেয়েছেন যে হিউ এন সাং যেসব মিনারকে স্তূপ বলতে চেয়েছেন সেগুলি আসলে ভগবান বুদ্ধের নখ ও চুল সংরক্ষণের স্থান। তাঁর মতে, এটিকে ঘিরে আছে অনেক ছোট ছোট স্মৃতিস্তম্ভ। যেগুলিকে দেখে মনে হয় একে অপরের সঙ্গে ছুঁয়ে আছে। এদের ঘিরে কতকগুলি পুকুর। যাদের জলে পবিত্র মঠগুলির ছায়া পড়ত।

বিতর্কিত ওই উপাসনার স্থান যে টিলাটির উপর রয়েছে, তার সঙ্গে সেই স্তূপের বর্ণনার একটা মিল রয়েছে, যেখানে বুদ্ধের নখ ও চুল সংরক্ষণ করা হত। শহরের মধ্যস্থলে, বহু স্তম্ভের দ্বারা আবেষ্টিত টিলাটিকে দেখলে স্তূপের মতই দেখায়। আবার, মসজিদ তথা মন্দিরের পশ্চিমে যে কিছুটা খাদ মত দেখা যায় সেখানে সম্ভবত অতীতে কোনও নদী বইত অথবা ঝিল ছিল।

একমাত্র অনুপুঙ্খ পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আর খননের মাধ্যমেই এর সঠিক জবাব পাওয়া সম্ভব। কিছুদিনের জন্য আমরা না হয় ধরে নিলাম বিতর্কিত মসজিদ মন্দিরের অবস্থানটি যে টিলার ওপর সেই টিলাটিই আসলে বিতর্কিত। যদি কানিংহাম অথবা হিউ এন সাং-এর পর্যবেক্ষণকে আমরা মূল্য দিই, তাহলেই বোধহয় সমগ্র বিতর্কের গভীরে পৌঁছতে পারব। সমস্যার চাবিকাঠিটা সেখানেই। **ছবি: মনমোহন শর্মা**

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

কলকাতায় রুশ উৎসব

কলকাতায় অভূতপূর্ব সোভিয়েত উৎসবের শুভ এবং বর্ণাঢ্য সূচনা হয়ে গেল ২ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী স্টেডিয়ামে। হাজারো ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও অনেকেরই অভিমত বর্ণময়, মনোগ্রাহী এমন অনুষ্ঠান কলকাতায় আর নাকি দ্বিতীয়টি হয়নি। রুশ প্রথা অনুসারে তার নিজের দেশের পোশাকে সজ্জিতা জনৈকা রুশী তরুণীর হাত থেকে নুন রুটি নিয়ে অনুষ্ঠানটির সূত্রপাত করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। দিল্লি থেকে উড়ে আসার বার্তা ছিল কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী মহামান্য নরসীমা রাও-এঁর। কিন্ত অনিবার্য কারণে তিনি না আসতে পারায় তাঁর অভাব পূরালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা সাহী। অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে স্বাগত ভাষণ দিতে স্বাগত জানানো হল ইউক্রেন মন্ত্রী মন্ডলী-প্রধান মিস্টার ভি· এ· মাসুল কে।

যে সময়ের এবং যেমনতর অনুষ্ঠানই হোক-তা শুরু হবে নির্দ্ধারিত সময়ের পরে। কথাটি কি নিত্যসত্যে পরিণত হয়ে গেল? হয়তো বা তাই। নইল গুণীজন সমৃদ্ধ এবং ব্যয়বহুল এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাতে অবাঞ্চনীয় এই বিলম্ব কেন? ধন্যবাদ কলকাতার দর্শকদের। সাধুবাদ তাঁদের সংস্কৃতি প্রেমের। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দিব্যি মানানসই হয়ে যেতে আটকায়নি তাঁদের।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল মোট দুদিনের। সংবাদ অনুযায়ী খবর-এই দুদিনের জন্যে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ এক কোটি টাকা। যার বেশি অংশটি ব্যয়িত হয়েছে আলোক এবং মঞ্চসজ্জায়। যে রাজ্যে আকছার খেলে বেড়ায় নাছোড়বান্দা দারিদ্র্য সেখানে মঞ্চ এবং আলোক সজ্জার জন্যে এতখানি-এতখানিই প্রয়োজন ছিল কি না সে প্রশ্ন থাক। আয়োজকদের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের সার্বিক তাক লাগানো। তা নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। শুধু ক্রীড়াঙ্গনে কেন তার বহির্ভাগও সজ্জিত হয়েছিল মনোহারী আলোকমালায়। ব্যবস্থা ছিল নানা ধরনের ট্যাবলোরও। ইওরোপীয় এক বিখ্যাত থিয়েটারের আদলে প্রস্তুত মুক্ত মঞ্চে ছটার অব্যবহিত পরেই যন্ত্রীরা সরব হয়ে উঠলেন। একদিকে রুশ অন্যদিকে ভারতীয় বাদকেরা। লালপাড় শাড়ি পরিহীতা এক দল ভারতীয় তরুণী নৃত্যছন্দে হিল্লোল জাগিয়ে সুস্বাগতম জানালো বিদেশীদের। এরপর একের পর এক নানা শিল্পীর

কলকাতায় রুশ উৎসবের উদ্বোধন

প্রাচীন রুশী প্রথায় মুখ্যমন্ত্রীকে নুন রুটি দিয়ে অভ্যর্থনা

ছবি : শিখর কুমার কর

রুশ অতিথিদের
অভ্যর্থনা
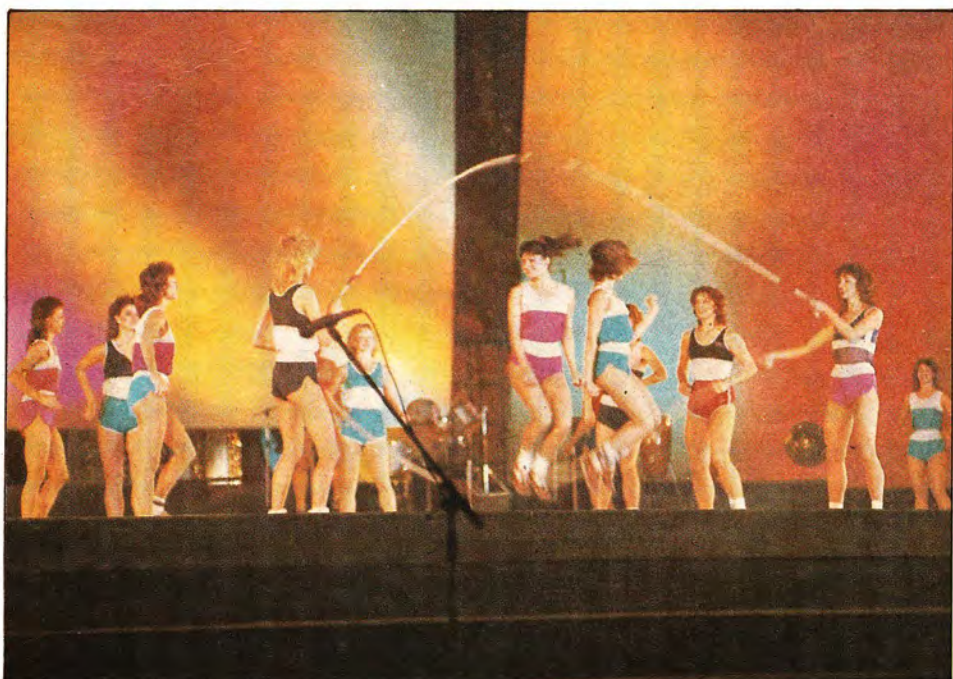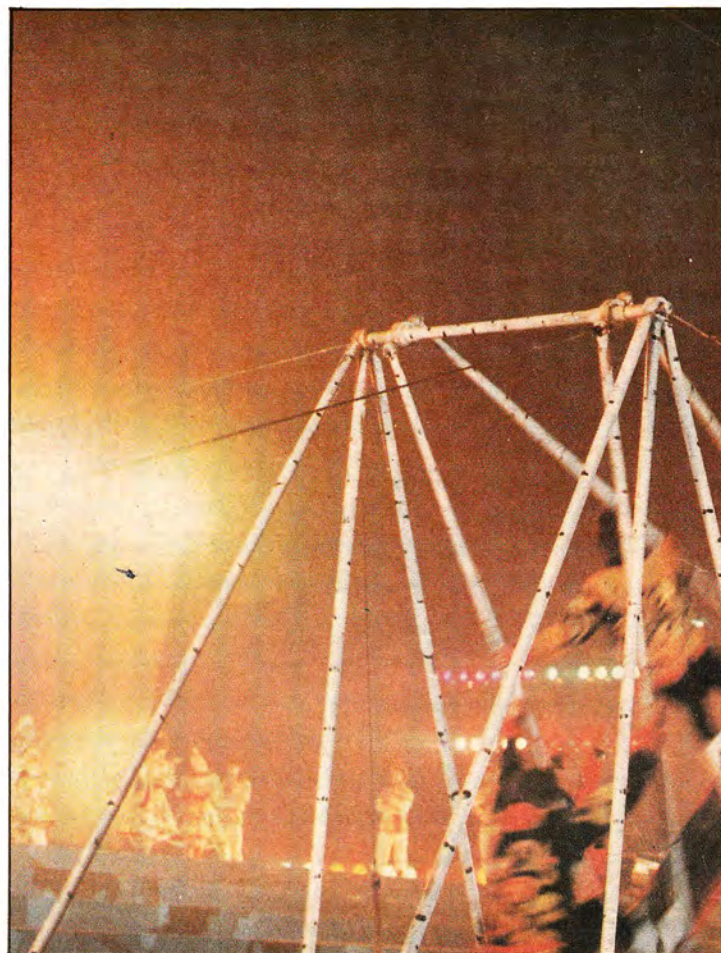
জিমন্যাস্টিক
ব্যালে
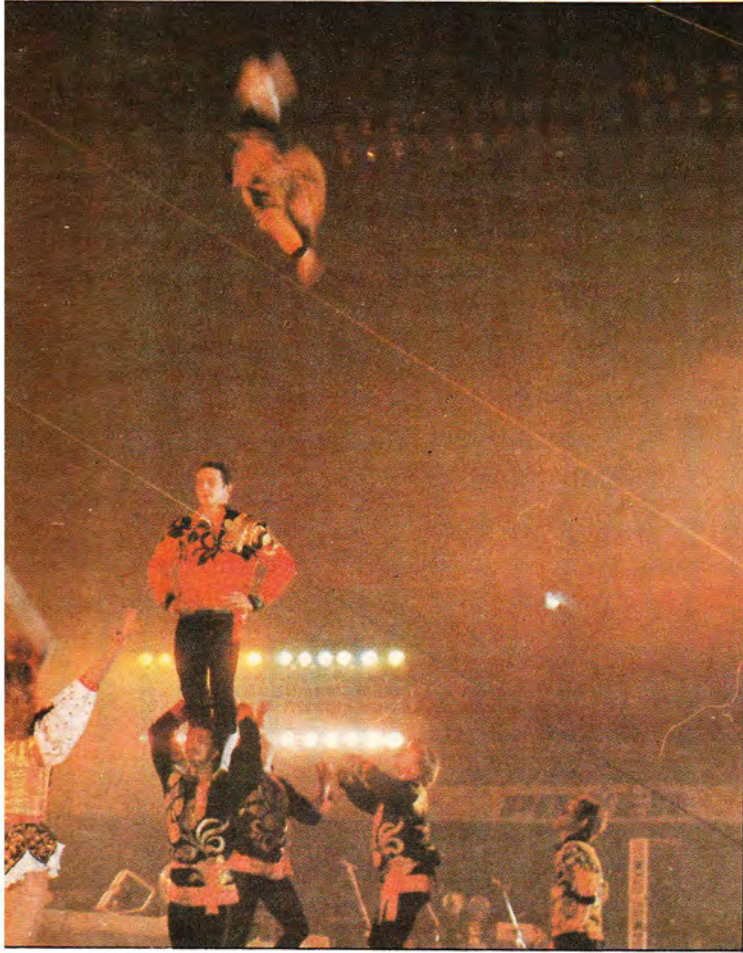
রুশ সার্কাসের
কলাকৌশল

বিশ্ববিখ্যাত
বলশয় ব্যালের
একটি দৃশ্য

সার্কাসের
একটি দৃশ্য

ব্যালের দুরুহ মুদ্রায়

রুশ সুন্দরীরা

যৌথ কৌশলে মঞ্চে কখনো উড়ে এলো লাল পরী। কখনো একদল ডানা মেলা কৃষ্ণ বাদুড়। নৃত্যের তালে তালে কখনো ফুটে ওঠে বিপ্লবের মুদ্রা কখনো হালকা রসসিক্ত শুধুই বিনোদনী মায়া। মঞ্চ জুড়ে যখন চলছিল নাচ গান পিছনের পর্দায় তখন দর্শায়িত হচ্ছিল নানান চিত্র। ফুটে উঠল ইন্দো-সোভিয়েত মহাকাশযান উৎক্ষেপণ, প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা ইত্যাদি। উপগ্রহের ছায়া গায়ে মেখে আলোর ফোয়ারা বেয়ে মঞ্চে নেমে এল চার তরুণী। ক্রমান্বয়ে মঞ্চে ঘটে যায় এমনি আরো কতকিছু। বেলুনারোহী হয়ে শূন্যে উড়ে যায় অ্যাক্রোব্যাটরা। নীচে ঘুরপাক খায় অনুপমা সুন্দরীরা।

বলশয় থিয়েটারের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল রবীন্দ্রসদন। এরপর এখানে দেখানো হলো তারই কিছু সীমিত অংশ। চলে সিম্ফনির সুর মূর্ছনা। দেখানো হয় লোকনৃত্য। লোকনৃত্যের শিল্পী মসিয়ে ইগর-নিপুণ দক্ষতায় পরিচালনা করলেন নাবিক নৃত্য। এরপর সোভিয়েত সার্কাস। মুহুর্মুহ জনধর্মীতা এবং নতুনত্বে যা সহজেই মন কেড়ে নেয় দর্শকদের। হাতের মায়ায় ম্যাজিক বলের দৃশ্যমান হওয়া এবং লুকিয়ে পড়ার দৃশ্য অনেকেরই দেখা কিন্তু বল নিয়ে এমনতর কারুকাজ নিঃসন্দেহেই দীর্ঘদিন মনে থাকবে দর্শকদের। একেবারে শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল পপ সঙ্গীতের। শিল্পী স্বর্ণকণ্ঠী আল্লা পুগাচোভা। নিমেষে এক এবং আপ্লুত করে তোলেন তিনি সমবেত শ্রোতাদের। তাঁরা বুঝতেই পারেন না ক্রমশ রাত বাড়ছে বাইরে। কিন্তু রাত তো বাড়েই। এবং উৎসবের ক্ষণ অতিক্রান্ত হতেই তা অনুভূত হয়।

ছবি: কুমার রায়

ব্যালের আরেকটি দৃশ্যে

ব্যালেনতকীর কঠিন ভারসাম্য

দাতা সাহেবের মেলা–অমৃত সন্ধান ?

'দাতা সাহেব দোওয়া কর', 'দাতা বাবা পার কর'–চৈত্রের খরদাহ ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আর্তিতে মুখর হয়ে উঠেছে পীর দাতা সাহেব ওরফে মেহবুব শা–র মাজার। কিন্তু কিভাবে এই পীরবাদের উদ্ভব? পীররা কি ইসলামী শরীয়ত থেকে বিচ্যুত? মুসলিম সমাজের কোন কোন অংশ পীরবাদের ঘোরতর বিরোধী? হিন্দু 'যোগী' ও বৌদ্ধ 'থের'দের সঙ্গে পীরদের মিল কোথায়? মুসলমান পীরতত্ত্বের ওপর হাবিব আহসানের আলোকপাত।

সাধু ও ফকিরেরা একসাথে

আছে মক্কা মদীনা এই দেহে
দ্যাখ না রে মন চেয়ে
দ্যাশ দ্যাশান্তরে দৌড়িয়ে এবার
মরিম ক্যানে হাঁপিয়ে

পরনে লুঙ্গি, গায়ে কালো রঙের ঢিলে আলখাল্লা, হাতে ডমরু, পায়ে ঘুঙুর আর গলায় দুলছে রঙীন 'তসবি'–ওদের মরমী গলা হাওয়ায় ভাসে:

মওলা ধন রে কি দিয়া ভজিব তোমারে
কিবা আছে হেন ধন এই অসার সংসারে…

রাঢ় বাংলার রুক্ষ দুপুরে জ্বলছে ধুনি। সূর্যশিখার খরতাকে আড়াল করে কর্কশ পাষাণভূমি মোম ও

দাতা সাহেবের দরগাহ
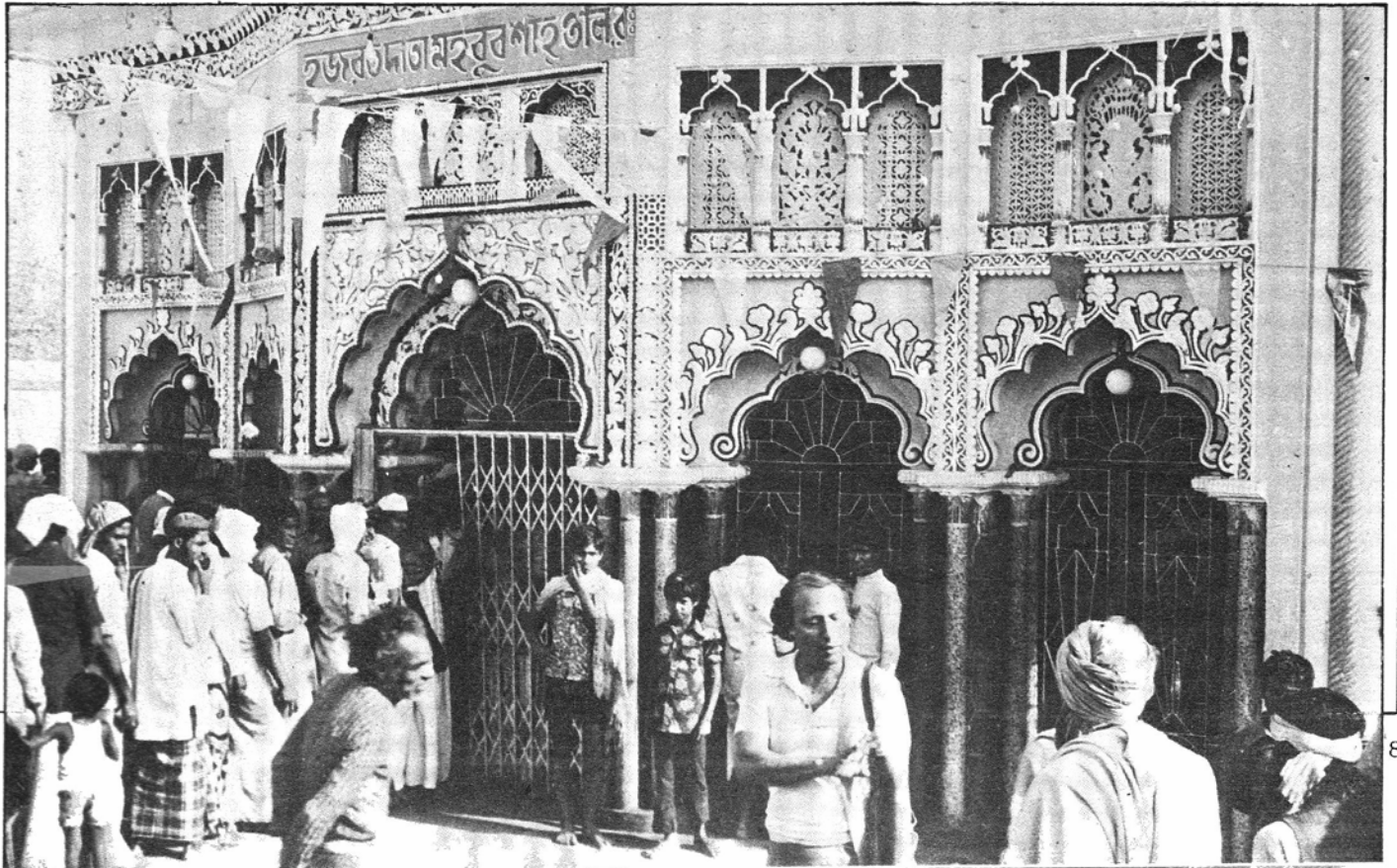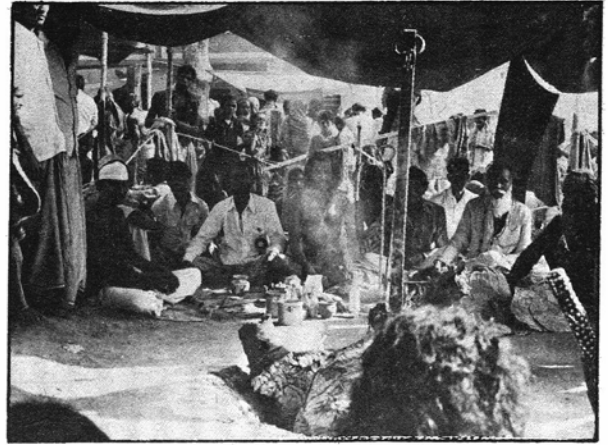
ধূপের সুরভিতে মৌ-মৌ। শরীরের কাঁপন ঢেউ তোলে ওদের বাবরি চুলে, লাল শালু মোড়া বাঁশের চামরে। অযত্নলালিত শ্মশ্রুরাজি শুকনো ঘাসের মত পাহাড়ি হাওয়ায় ঝিরঝির করে ওড়ে:

অবুঝে কি বুঝতে পারে আকবরী সোনা?
তামা-কাঁসা-পিতল-সোনা চার চীজে এক নমুনা।
ভবে ফোটে নানান জাতির ফুল
সকল ফুলে বসে কি রে ভোমরা বুলবুল?
তুমি বকুল ফুল তুলতে গিয়ে জারমানি ফুল তুলিও না …।

যারা অবুঝ, জ্ঞানচক্ষু যাদের উন্মীলিত নয়, তারা তামা-কাঁসা-পিতলের সাথে সোনার পার্থক্য কি বুঝবে? সব ফুলে ভ্রমর বা বুলবুলি বসে না। শেওড়া গাছে আগর কাঠ খুঁজতে গেলে কুঠারখানিই ভেঙে যায়। সুতরাং জগত-রহস্যের আসল রত্নটি পরখ করার জন্য শক্তি ও সাধনা চাই। বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সেই সারকথার সুর-লহরিই ওদের কণ্ঠে উচ্চারিত আবেগমথিত ভাষায়। আসল রত্ন 'গুরু' চেনার মাতমে ওরা মাতোয়ারা।

কিন্তু ওরা কারা? আর কোন পটভূমিতেই বা জমে উঠেছে ওদের গানের আখড়া? ওরা ফকির—দরবেশ। পীর-মুর্শিদের শিষ্য-প্রশিষ্য হিসাবেই ওদের পরিচয়। দাতা সাহেবের দরগায় ওরা এসেছে শাশ্বত সত্যের জয়গান করতে।

সিউড়ি থেকে রাজনগর। প্রথমটি বীরভূম জেলার সদর শহর, আর দ্বিতীয়টি প্রাচীন বীরভূম রাজ্যের রাজধানী। কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার ব্যাপী টানা পথরেখার মাঝামাঝি এক দেহাতী জনপদ পাথরচাপুড়ী। সিউড়ি থেকে মাইল ছয়েক দূরে অবস্থিত এই পাহাড়তলি বীরভূমের আর পাঁচটি গ্রামের মতই একটি সাধারণ গ্রাম। কিন্তু কালের সীমা অতিক্রম করে সেই সাধারণ গ্রামেই বয়ে চলেছে এক অসাধারণ ঐতিহ্যের ধারা। চৈত্রের প্রাণান্তকর দাবদাহ উপেক্ষা করে ৯ থেকে ১৫ চৈত্র

দাতা সাহেবের সমাধি

দাতা সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত বটগাছ

সেই ঐতিহ্যধারায় পাথরচাপুড়ি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পাথরচাপুড়ির দাতা সাহেবের মেলা যেন সাগর মেলারই উল্টোপীঠ। ধর্ম-সম্প্রদায় বর্ণের বিভেদ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় সেই জনসমুদ্রে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে পাষাণ প্রান্তর স্পন্দিত হয় নতুন জীবনের হিন্দোলে। আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, সাধু-সন্ত থেকে সাধারণ মানুষ সকলের আরাধ্য পুরুষ এই দাতা সাহেব, যাঁর আসল নাম মেহবুব শাহ।

খুব বেশিদিনের কথা নয়, তবু দাতা সাহেবের পূর্ব পরিচয় আজ কিংবদন্তীর ধোঁয়াশায় ঢাকা। কারো মতে তিনি ভিনদেশী। সুদূর পশ্চিমের কোন দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। কারো মতে তিনি খাঁটি ভারতীয়, নদীয়া জেলার এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমে পাগল। আবার কেউ কেউ এমনও বলেন, দাতা সাহেব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের লোক। যৌবনে গৃহত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন হাজির হয়েছিলেন পাথরচাপুড়িতে। পরে এই স্থানটিই তাঁর সাধনপীঠে পরিণত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার তাঁকে সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সৈনিক বলেও উল্লেখ করেছেন।

সে যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেহবুব শাহের বীরভূমে আবির্ভাব এবং বলাই বাহুল্য তা সাধক হিসাবে নয়। জঙ্গলাকীর্ণ দুর্লভপুরের পীরতলায় ভোলা খাঁ–র বাড়িতে তিনি প্রথমে রাখাল ছিলেন। কিন্তু রাখাল হলেও মেহবুব শাহ অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। ফলে অল্পদিনেই এলাকার মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁর দিকে। জনশ্রুতি অনুসারে সেই সময়ের একটি ঘটনা: গরুর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে তিনি দিব্যি একটি বটগাছের মাথায় উঠে বসে থাকতেন। ওদিকে জমির কাঁচা ধান নির্মূল করে দিত গরুগুলি। ফলে জমির মালিকের মাথায় হাত। তিনি তেড়ে আসতেন। কিন্তু অবাক কান্ড, গালমন্দ শুনে মেহবুব শাহ নিচে নেমে এলেই সেই নির্মূল শস্যক্ষেত্র আবার অক্ষত অবস্থায় দোল খেত হিলহিলে বাতাসে। ফলে একদিন পরম শ্রদ্ধাবশত তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে ধন্য হলেন পার্শ্ববর্তী কুশমাশুল গ্রামের বন্দে আলি সাহেব। সেখানে আরেকটি ঘটনা: সেদিন উন্মুক্ত প্রান্তরে এক আমগাছের ছায়ায় বসে ভক্তদের সঙ্গে আলোচনায় মশগুল ছিলেন মেহবুব শাহ। এমন সময় ঝড়। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড দাপটে চারদিক উথাল পাথাল। যেন মহাপ্রলয় সমাগত। কিন্তু অবাক ব্যাপার, যে আমগাছের তলায় মেহবুব শাহ বসেছিলেন তার একটি পাতাতেও সেই তাণ্ডবের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতি আবার শান্ত হল। কিন্তু তখন আরেক বিস্ময়, সেই নিথর নিস্পন্দ গাছ থেকে টুপ করে একটি আম খসে পড়ল মেহবুব শাহের কোলে। অথচ তখন আমের মরশুম নয়। অসময়ের ফল। বন্দে আলি ছিলেন নিঃসন্তান। মেহবুব শাহ সেই আমটি বন্দে আলির স্ত্রীকে খেতে বললেন। তিনি খেলেন, আর খাওয়ার পরই সন্তান লাভ। রামপ্রসাদ শর্মার বন্ধ্যা স্ত্রীও সন্তান লাভ করেছিলেন দাতা সাহেবের আশীর্বাদে!

মাজারের সামনে প্রার্থনারত

তীর্থযাত্রীদের আস্তানা

এ রকম নানা অলৌকিক কেরামতি মেহবুব শাহকে সিদ্ধ-পুরুষ হিসাবে জনমনে অধিষ্ঠিত করে। শুরু হয় তাঁর সাধক জীবন। সাধন ক্ষেত্র হিসাবে তিনি বেছে নেন জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে পাথরচাপুড়িকে। কুশমাশুল গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত পাথরচাপুড়ি জঙ্গলাকীর্ণ হলেও তার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। বন্ধুর ভূমিতলে আগাছার মতই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পাথরের চাঁই, মিষ্টি জলের সুন্দর পুকুর, ছায়া–সুনিবিড় বিরাট বটমূল আর উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার হাওয়া। এখানে মেহবুব শাহ বসলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায়। মারফতী সাধনা। সিদ্ধও হলেন। তখন থেকেই মেহবুব শাহ 'পীর' রূপে পরিগণিত। অসহায় মানুষের তিনি পরম সহায়। কিন্তু নিজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। অস্থিচর্মসার শরীরের পরিচ্ছদ হিসাবে গ্রহণ করতেন অতি সাধারণ জীর্ণ লুঙ্গি, গায়ে অনুরূপ একটি ফতুয়া, পায়ে কাঠের খড়ম। বাঁ হাতে একটি চিমটি আর ডান হাতে বাঁশের লাঠি ও তসবিমালা–এইটুকুই তাঁর পার্থিব সম্পদ। এই ত্যাগী পুরুষকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী উপহার

দিয়ে ভক্তরা ধন্য হতেন। কিন্তু মানবপ্রেমিক পীর সাহেব সবই অকাতরে বিলিয়ে দিতেন দীন-দুঃখী মানুষের মধ্যে। হিসাব শাস্ত্রের পরিসংখ্যানে সে দানের অংক বিশাল। সেবার মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ। এবং শুধু পার্থিব সম্পদই তিনি দান করতেন না, তাঁর অপার্থিব দানও ছিল অগণিত। সেজন্যই ভক্তরা তাঁর নাম দেয় দাতা সাহেব। ওই নামেই তিনি আজ সমাধিক প্রসিদ্ধ।

১২৯৯ সালের (১৮৯২ খ্রী:) ১০ চৈত্র এই সিদ্ধপুরুষ নিজের সাধনপীঠেই সজ্ঞানে প্রয়াত হন। কিন্তু মানুষ তাঁকে ভোলে নি। এখনও তাঁর আত্মা ভক্ত মানুষের পরম সহায়। 'দাতা সাহেব দোওয়া কর', 'দাতা বাবা পার কর' আর্তি নিয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তযাত্রী তাঁর উরস মেলায় সামিল হয়।

'পীর' শব্দটি পারসি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় 'বৃদ্ধ লোক'। কিন্তু কথাটির প্রচলিত অর্থ অন্য রকম, ভাবগত অর্থে যাকে বলা যায় 'জ্ঞানবৃদ্ধ'—অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ বা আধ্যাত্মিক গুরু। শেখ, মুর্শিদ, ওস্তাদ, হজুর প্রভৃতি শব্দকেও ক্ষেত্রবিশেষে 'পীর'—এর প্রতিশব্দ রূপে দাঁড় করানো যায়। একইভাবে হিন্দু 'যোগী' বা বৌদ্ধ 'থের' জাতীয় শব্দগুলিও 'পীর' শব্দের সমার্থক, অন্তত ভাবগত অর্থে। ইসলামের সুফী মতবাদ থেকেই পীরতত্ত্বের গুরুবাদের উদ্ভব। শুদ্ধ ও সিদ্ধ ব্যক্তিই সুফী—তিনিই পীর, তিনিই মুর্শিদ। আধ্যাত্মিকবোধে তিনি মহাজ্ঞানী, এমন কি অতিমানবিক ও অতিলৌকিক ক্ষমতারও তিনি অধিকারী। তিনি পাপী-তাপীর চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তির পথপ্রদর্শক। তাঁর অনুগ্রহে মজলুম মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থ হয়।

সুফী ঐতিহ্যবাহিত পীরবাদ আর হিন্দুধর্ম লালিত গুরুবাদের মধ্যে মিল এবং অমিল দুটিই বেশ স্পষ্ট। তবু অন্তরধর্মের নিরিখে দুটিকেই সহজাত বলা যায়। দুটি মতবাদই অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়। তবে সাধনার পথ ও মত ভিন্ন ধরনের। এবং 'পীর' ও 'গুরু' সেখানে একই আসনে সমাসীনও নন। হিন্দু যোগতন্ত্রে গুরুবাদের গুরুত্ব আছে, তান্ত্রিক আচারে তা আবার আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেগুলির মূল লক্ষ্যই হল কায়া—সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ। পক্ষান্তরে সুফী একান্তভাবেই একটি মিস্টিক মতবাদ, তাতে কায়া—সাধনার লেশমাত্র নেই। গুরুবাদের সাথে পীরবাদের এখানেই গরমিল এবং সেটিই তার মৌলিকতা। সুফীমতের উদ্ভব আরব ভূমিতে, যদিও তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের কেন্দ্রভূমি অবশ্যই পারস্য দেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিজয়ের ঝড়ো হাওয়ায় এই উদার মতবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়, বিশেষভাবে ভারতবর্ষে। অবশ্য মুসলিম বিজয়ের অনেক আগেই সুফী সাধকরা এদেশের মাটি স্পর্শ করেছিলেন, তবু মুসলিম বিজয়ের মিশ্র প্রবাহ যে তাঁদের মতবাদ প্রচারের পথ সুগম করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবং এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলামী শাসনদণ্ডের চেয়ে এদেশের জনমানসে এই মতবাদ অধিকতর বরণীয়ও হয়ে উঠেছিল। বহু মত ও পথের পূজারী ভারতবর্ষের জনমানসকে তা এক নতুন ঐতিহ্যের স্নিগ্ধ আদর্শে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিল। আমাদের সমাজজীবনেই তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। পীরের দরগা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব ভারতীয়েরই ভক্তি নিবেদনের পুণ্যস্থান। বাড়িতে গরু বিয়োলে তার প্রথম দুধটুকু মানিকপীরের দরগায় না পাঠিয়ে শান্তি পায় না হিন্দু গৃহিনী।

আরব আজমে উমাইয়াদ খলিফারা যখন পার্থিব বিলাসিতায় ভাসতে শুরু করলেন, তখন এক শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষে তাঁদেরকে আর ধর্মগুরু বলে স্বীকার করা সম্ভব হল না। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হল বিকল্প পথের অন্বেষণ। পথ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য তখন থেকেই সুফী মতবাদের উদ্ভব। ধর্মের পথ অন্তরমুখী। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তরের অবিচল বিশ্বাসই বড় সত্য। 'সুফ' বা রুক্ষ পশমের জোব্বাধারী এই মরমী সাধকরা শুধু স্বর্গবাসের অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট হতে চাইলেন না। তাঁরা চাইলেন আল্লাহর নিত্য সান্নিধ্য, তাঁর সঙ্গে নিত্য লীলা। কিছুকাল পরে সে কল্পনাও যথেষ্ট তৃপ্তিকর মনে হল না।

'সুফ' পরলেই কি 'সুফী' হওয়া যায়? সে তো বাইরের আলখাল্লা। তাই কল্পনা দোলায়িত হল ভিন্নভাবে—ভিন্ন পথে। সুফীকে 'দিওয়ানা' হতে হবে। প্রেমের জন্য পাগল। তা প্রেমের জন্য মানুষ হামেশাই পাগল হয়। কিন্তু এ পাগলামী মানুষের প্রেমে নয়—আল্লাহর প্রেমে। আল্লাহ হলেন 'আসিক', আর সুফী তার 'মাশুক'। আল্লাহ প্রেমিক—সুফী তাঁর প্রেমিকা। বড় বিচিত্র সেই প্রেম। আল্লাহ সুফীদের ঘুম কেড়ে নিলেন। ভুলিয়ে দিলেন ক্ষুধাতৃষ্ণা। বিবাগী হয়ে তাঁরা পথে বসলেন আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে। তাঁরা 'দিওয়ানা' হলেন।

সুফীদের মধ্যে যিনি ফকির—বাদশাহ বলে খ্যাত, তাঁর নাম ইব্রাহিম ইবনে আদম। জাতিতে তিনি আরব বংশোদ্ভূত এবং বলখের রাজপুত্র। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বেরিয়ে ছিলেন। হঠাৎ পথিমধ্যে ভাঙল মনের ভুল—এ জন্য তাঁর জন্ম হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে এক মেষপালকের হাতে তাঁর রাজকীয় পরিচ্ছদ, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিয়ে রাজপুত্র পশমের জোব্বা পরে ফকির বেশে রওনা দিলেন মক্কার পথে, পায়ে হেঁটে। মাশুক চললেন আসিকের দরবারে।

৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম ইবনে আদমের মৃত্যু হয়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনার ইমান বা বিশ্বাসকে আপনি কিসের ওপর স্থাপন করেন?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, চারটি সূত্রের ওপর। প্রথমত, আমার প্রাত্যহিক আহার আমি ছাড়া অন্য কেউ খেতে পারবে না—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, আমার করণীয় কাজ আমি ছাড়া কেউ করবে না, তাতে আমি ব্যস্ত। তৃতীয়ত, মৃত্যু আসে একেবারে হঠাৎ, আমি তাই সেদিকেই ধাবমান এবং চতুর্থত, যেখানেই থাকি আল্লাহর চোখের আড়াল কখনো হই না, তাই সর্বদাই আমি তাঁর কাছে বিনীত।

প্রথম দিকের সুফী সাধকদের মধ্যে আল—হুসেন বসরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। দুনিয়া অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে গভীর বৈরাগ্য তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট। কেননা 'এই নিচের পৃথিবী হল একটি বাড়ি, যার আবাসিকরা শুধু লোকসানের জন্যই খাটে। সুতরাং এর নিবৃত্তিতেই প্রকৃত সুখ। ...আমার কিছুই নেই, তবু আমি সবচেয়ে ধনী। কারণ আমার কোন অভাব নেই।'

সুফী চিন্তাধারা একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মহিয়সী রাবেয়া বসরীর সাধনায়। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সামান্য একজন দাসী। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য বাঁশি বাজিয়ে তাঁকে পারিষদবর্গকে খুশি করতে হত। অশেষ দুর্ভোগের পর প্রভু অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেন তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। আল্লাহর প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করার এক চরম আদর্শ তাঁর জীবন ও বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে: 'ভয়, আতংক বা পুরস্কারের লোভে আল্লাহর সেবা খুব নিকৃষ্ট দাসদাসীর কাজ। স্বর্গ আছে কি নেই, নরক আছে কি নেই—এ সবের সঙ্গে আল্লাহর কি সম্পর্ক? তাঁর সেবা করাতেই আমার আনন্দ। সেই সেবার অন্য কোন কারণ নেই।' একবার নাকি হজরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া—সাল্লাম) স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রাবেয়া, তুমি কি আমায় ভালবাস না?' রাবেয়ার জবাব, 'হে আল্লাহর নবী, তোমায় ভালবাসে না এমন কে আছে? কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আমার সব কিছু এমনভাবে দখল করে আছে যে অন্য কারো জন্য আমার প্রেম বা ঘৃণার কোন জায়গা নেই।'

কিন্তু নবম শতাব্দীতে খলিফা আল—মামুদের আমলে সুফী সাধনার ধারা এক বিপরীত পথে মোড় নেয়, যাকে বলা হয় 'মুতাজিলা' বা যুক্তিবাদ। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী, আল্লাহ স্বয়ং মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারণ করে রাখেন। মুতাজিলাবাদীরা তা মানতে পারলেন না। কারণ তা—ই যদি হয়, তাহলে বলতে হয় আল্লাহই মানুষের জন্য কুকর্ম নির্দিষ্ট করেন এবং সেজন্য তাদের শাস্তিও দেন। সুতরাং আল্লাহকে দয়ালু বলা অযৌক্তিক।

তাই বলে মুতাজিলাবাদীরা নাস্তিক নয়। শরীয়তের তত্ত্বকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে তাঁরা ঘোষণা করলেন, আল্লাহ প্রকৃতই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ। আর কর্ম নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও স্বাধীনতা মানুষের। তাই দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা বা স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য মানুষের ওপর আল্লাহ রুষ্ট হন। নতুবা সব অবস্থাতেই তিনি সত্যিকার সৃষ্টিপ্রেমে পূর্ণ। এভাবে ইসলামী শরীয়তের বহু বক্তব্যকেই তাঁরা সংশোধন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা

দিতেও দেরি হল না। শুরু হল শরীয়তপন্থী মুসলমানদের সাথে মুতাজিলাবাদীদের দ্বন্দ্ব। এ সময় আসরে নামলেন ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইমাম আল–গাজ্জালি। শুধু ইসলামী দর্শনেই নয়, সর্বধরনের দর্শনশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত হিসাবে তিনি সারা বিশ্বে সমাদৃত। মুতাজিলাবাদের যুক্তিকে আদৌ খণ্ডনের চেষ্টা না করে তিনি তার সীমাবদ্ধতাকেই চিহ্নিত করলেন 'তহাফত অল-ফলাসিফ' বা 'দার্শনিকদের অসঙ্গতি' নামক গ্রন্থে। ঈশ্বরের মুখ বললেই মানুষের মুখের যে অবিকল কল্পনা করা হয় তা মুতাজিলাবাদীদের যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা মাত্র। অর্থাৎ তা স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিমাপেই সব কিছুকে ধারণ করে। আক্ষরিক অর্থে রূপ না বুঝিয়ে ঈশ্বরের রূপ বলতে তাঁর স্বরূপকেই বোঝায় এবং তা কখনোই যুক্তিবোধ্য নয়, কেবল অনুভবসাধ্য।

মুসলমান সুফীরা শরীয়তপন্থী নন, মারিফত বা মরমীপন্থী। কোরআন–হাদীসের জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রাধান্য দিয়েই এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা। বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড নয়, প্রেম ও ভক্তি দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ তথা একাত্ম হওয়াই সুফী সাধনার মূল লক্ষ্য। পীর-মুর্শিদের কাছে মুর্শিদ বা শিষ্য সে সাধনায় দীক্ষা নিতে পারে।

দশম শতাব্দীর গোড়া থেকেই পীর-দরবেশরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন। কিন্তু ভারতে এসে এদেশের তান্ত্রিক যোগধর্মের প্রভাবে মরমীয়া সুফীবাদ ক্রমেই আনুষ্ঠানিক পীরবাদে পরিণত হয়। এদেশে পীর শুধু গুরুই নন, প্রায় হিন্দু দেবতার তুল্যমুল্য তাঁর স্থান। জীবিত অবস্থায় তাঁরা হয়তো 'মানুষ গুরু' হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁরা অনেকেই পরিণত হন 'দেবগুরু'তে। বিশেষ করে এদেশের লৌকিক চেতনায় পীরের দেবত্ববাদের ধারণাটি যথেষ্ট স্পষ্ট। সুফীতত্ত্বের গবেষক ড: এনামুল হকের মতে, যে সমস্ত পীর দরবেশ এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন তাঁরা প্রথম থেকেই বিকৃত সুফী মতবাদের ধারক। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পীর-পূজা বৌদ্ধদের থের–পূজার অনুরূপ, তেমনি কবর-পূজা হল চৈত্য–পূজার প্রতিরূপ। পারস্য, বোখারা, সমরকন্দ, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধরা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়, তখন থেকেই তত্ত্বধর্মী সুফী মতের সাথে আচার-ধর্মী বৌদ্ধমতের মিশ্রণে শরীয়ত–বিরোধী পীরবাদের উদ্ভব হয়। (দ্র: 'বঙ্গে সুফী প্রভাব'–ড: এনামুল হক)। ধূপধুনা, ফুল-চন্দন প্রভৃতি দিয়ে বৌদ্ধদের চৈত্য পূজা আর গোলাপ, আতর, লোবান, ধূপবাতি দিয়ে মুসলমানদের দরগাহ পূজা একই প্রেরণা জাত। ধর্মের রূপান্তরে শুধু ইসলামী পরিচ্ছদ পরানো হয়েছে মাত্র। আর এ কারণেই পীরবাদ নিয়ে মুসলমান সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান পীরকে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদাতা হিসাবে গ্রহণ করে পারলৌকিক মুক্তির পথ খোঁজে, আরেক শ্রেণীর মুসলমানরা পীরবাদের কট্টর

> ***দশম শতাব্দীর গোড়া থেকেই পীর-দরবেশরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন। কিন্তু ভারতে এসে এদেশের তান্ত্রিক যোগধর্মের প্রভাবে মরমীয়া সুফীবাদ ক্রমেই আনুষ্ঠানিক পীরবাদে পরিণত হয়।***

বিরোধী। তারা একে 'বেদাত' বলে অভিহিত করেন। দেওবন্দী আলেম সম্প্রদায় এবং আহলে হাদীস মুসলমানরা পীরপূজাকে মহাপাপ বলেই বিবেচনা করেন। কারণ তাঁদের মতে, এক আল্লাহ ছাড়া মুসলমান অন্য কারো কাছে নত হতে পারে না।

রোগ, শোক, মহামারী, দস্যু-তস্করের ভয়ে এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধরা বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজা করত। কিন্তু ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। মুসলমানরা বিগ্রহ পূজা করতে পারে না। তাই দুঃখের দিনে অসহায় মানুষের ভরসা হয়ে উঠেছেন পীর-মুর্শিদ। লোকপূজ্য পীরদের সাথে হিন্দু ধর্মের লৌকিক দেবদেবীর একটি তুলনামূলক সারণী এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে:

অধিপতি	দেবদেবী	পীর-পীরানী
জল	বরুণ	খোয়াজ খিজির
আগুন	ইন্দ্র	মাদার পীর
সম্পদ	লক্ষ্মীদেবী	লক্ষ্মীবিবি
সন্তান	ষষ্ঠী, পাঁচু ঠাকুর	মনাই পীর
গরু	গোরক্ষনাথ	মানিক পীর, সোনা পীর
ব্যাধি	শীতলা, ওলা দেবী	ওলাবিবি
বন	বনদুর্গা, বনদেবী	বনবিবি, জঙ্গলী পীর

ব্যক্তি, প্রতীক এবং আত্মা হৈ তিনরূপে পীরগণ লোকমনে বিরাজিত। ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের দিক দিয়ে তাঁদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

এক) ঐতিহাসিক: বদর, মাদার ও গাজী পীর প্রমুখ।
দুই) পৌরাণিক : খোয়াজ খিজির, হাওয়া বিবি, ত্রিনাথ পীর প্রমুখ।
তিন) লৌকিক : সত্যপীর, মানিক পীর, বনবিবি প্রমুখ।

অবশ্য দেবপূজার সাথে পীরপূজার মৌলিক পার্থক্যও আছে। মুসলিম ভক্তরা পীরের কোন মূর্তি গড়ে না। কেবল ব্যাঘ্রারোহী গাজী পীরের মূর্তি কল্পিত হয়েছে গাজীর পটে। কিন্তু সেটিকে পুজো করা হয় না, বাণিজ্যিক স্বার্থে পটুয়ারা তা কেবল পটেই আঁকেন। তবে দুয়েকজন পীরের নিজস্ব প্রতীক আছে। যেমন–গাজী পীরের প্রতীক 'আসা' মাদারী পীরের 'বাঁশ' বা সত্যপীরের প্রতীক 'প্যাট'।

প্রসঙ্গত আবার ফিরে যাই পাথরচাপুড়িতে দাতা সাহেবের মাজারে। বিদ্বেষের হলাহলে পূর্ণ, সাম্প্রদায়িকতায় দীর্ণ আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে দাতা সাহেবের দরগা মানব প্রেমের আলোকতীর্থ। মাজারের পূব দিকে ফকিরদের অস্তানা, তাদের পাশেই আখড়া পেতেছে বিবাগী বাউল এবং সংসারবিবাগী বিভূতিভূষণ হিন্দু সন্ন্যাসী। ফকিরের হাতে দফ, বাউলের হাতে একতারা আর সন্ন্যাসীদের চিমটির আওয়াজ যেন এক স্বরলিপিতে বেজে ওঠে দাতা সাহেবের স্মরণে। মাজার প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান নেই। মাথায় শিরনির পাত্র নিয়ে রৌদ্রস্নাত ভক্তযাত্রীর দীর্ঘ লাইন। তবু কোনও ক্লেশ নেই। দাতা সাহেবের পবিত্র কবর স্পর্শ করতে তারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষমান। সারা বছর একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে হয়তো কিনেছে একটি মোরগ, কিংবা একটি খাসি–দাতা সাহেবের মাজারে তা–ই নিবেদন করে পরম শান্তি খুঁজে পায় ভক্তিবিগলিত সাধারণ মানুষ। অবস্থাপন্ন ভক্তরা নিবেদন করেন মূল্যবান চাদর, যার কোন কোনটির দাম দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রায় হাজার খানেক চাদর পড়ে সোয়া বছরের উরস মেলায়। আর নগদ প্রণামী পড়ে প্রায় লাখ তিনেক টাকা।

দাতা সাহেবের উরস উৎসবকে মেলা বলাই ভাল। সেই বড় বড় মিষ্টির দোকান, সার্কাস, নাগরদোলা, টয় ট্রেন, চিড়িয়াখানা কিছুই বাদ নেই। ছড়িয়ে আছে বিশাল এলাকা জুড়ে। দাতা সাহেবের কুদরতির শেষ নেই। আউল-বাউলের মত মশা মাছিরও দেশ বীরভূম। কিন্তু পাথরচাপুড়িতে ওসবের বালাই নেই। যত্রতত্র রান্নাশালা, মুরগির পালক, ভাতের ফ্যান–দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু মাছি নেই। মিষ্টির দোকান, মাংসের দোকান কোথাও একটি মাছি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নেই মশা বা পিঁপড়েরও কোন উপদ্রব।

কিন্তু দাতা সাহেবের মেলায় জাতপাতের বালাই না থাকলেও মুসলমান সমাজেরই একাংশ মেলা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পোষণ করেন। বলাবাহুল্য তাঁরা পীরতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের মতে, পীরদের কেরামতি নেহাৎই বুজরুকি ছাড়া কিছুই নয়। অন্ধ ভক্তরাই ওসব বানিয়ে বানিয়ে রটনা করে। পীররা কি হজরত মুহম্মদের (সাল্লাললাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম) চেয়ে বড়? যেখানে তাঁর কবর পূজাই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, সেখানে পীরদের কবর পুজো করা মহাপাপ ছাড়া কিছুই নয়।

তবু বিভ্রান্তি যতই থাক, ভক্তপ্রাণ মানুষ পীরের দরগায় নতজানু হয়ে অন্তরের প্রশান্তি ফিরে পায়, ফিরে পায় নতুন মনোবল। তাই যুগ-যুগান্তের ঐতিহ্য বয়ে পীরের উরস মেলা সমানে চলেছে। হয়তো চলতেই থাকবে কিংবদন্তীর নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে।

ছবি: হাফিজুর রহমান
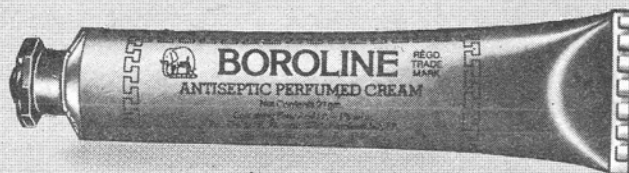
১৯ জুন ১৯৮৭, শুক্রবার, বিকেল চারটা। মান্দাই বাজারে সাপ্তাহিক হাট বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ সেই হাটের মাঝে অঘটন। বাজারের পূব দিকে একটি শেডের নিচে একদল জনতার ভিড়ে আচমকা বিকট শব্দে এক বিস্ফোরণে গোটা পাহাড়ি বাজারটি কেঁপে উঠল। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব মানুষজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর্তকলরোল ছড়িয়ে পড়ল এলাকায়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী পুলিশ ফাঁড়ির লোকজনেরা অকুস্থলে ছুটে আসেন। বুধরাই দেববর্মা সহ তিনটি রক্তাক্ত দেহ তখন মাটিতে লুটিয়ে, নিষ্প্রাণ। এখনও সেখানে আরও প্রায় ত্রিশটি নরনারীর রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে ছিটেয়ে, ক্ষত বিক্ষত। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য

প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে পুলিশের কর্মকর্তারা জানালেন, ওই বিধ্বংসী মারণাস্ত্রটি শক্তিশালী টাইম বোমা বলেই তাদের আশংকা। মাত্র তিন মাস আগে এই মান্দাইগামী একটি যাত্রী বাস থেকে পুলিশ একটি তাজা বোমা, ব্যাটারি সেল উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে কিছু পোস্টার, প্রচারপত্র যাতে 'বাঙালী মুক্তি বাহিনী'র নাম উল্লেখ ছিল। ১৯৮০ সালের এই জুন মাসেই রাজধানী আগরতলার বিশ কিলোমিটার দূরবর্তী মান্দাই বাজারেই সংঘটিত হয়েছিল শতাব্দীর বীভৎসতম গণহত্যা। উগ্র উপজাতি ঘাতকদের নির্বিচার হত্যালীলার নৃশংস শিকার হয়েছিল দুই শতাধিক নরনারী, যাদের সবাই ছিল বাংলা ভাষাভাষী। দীর্ঘ সাত বছর পরে উপজাতি অধ্যুষিত স্পর্শকাতর সেই মান্দাই বাজারেই বিধ্বংসী বিস্ফোরণের ঘটনায় সর্বব্যাপী আতংক ছড়িয়ে পড়ল।

কল্পরাজ্য বাঙালিস্থান : আমরা বাঙালির আন্দোলন সন্ত্রাসের পথে

বাঙালিবাহিনীর প্যারেড

উগ্রপন্থী উপজাতিদের হানায় অসংখ্য বাঙালি হত্যার বদলা নিতে এবার কি বাঙালির রাজনৈতিক মানচিত্রে 'বাঙালি মুক্তি বাহিনী'র ক্রুদ্ধ আবির্ভাব? বাঙালিস্থানের দাবিতে বঙ্গভাষীদের কট্টর সংগঠন 'আমরা বাঙালি'র আন্দোলন এখন কোন পথে মোড় নিচ্ছে? সন্ত্রাসসৃষ্টির অভিযোগে কেন গ্রেপ্তার হন আমরা বাঙালির কর্মী। সামরিক পোষাকে আমরা বাঙালি বাহিনীর মার্চ পাস্ট কিসের ইঙ্গিত! বাঙালি-বিক্ষোভের নেপথ্যপাট ও প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে অন্তর্তদন্ত ভিত্তিক প্রতিবেদন।
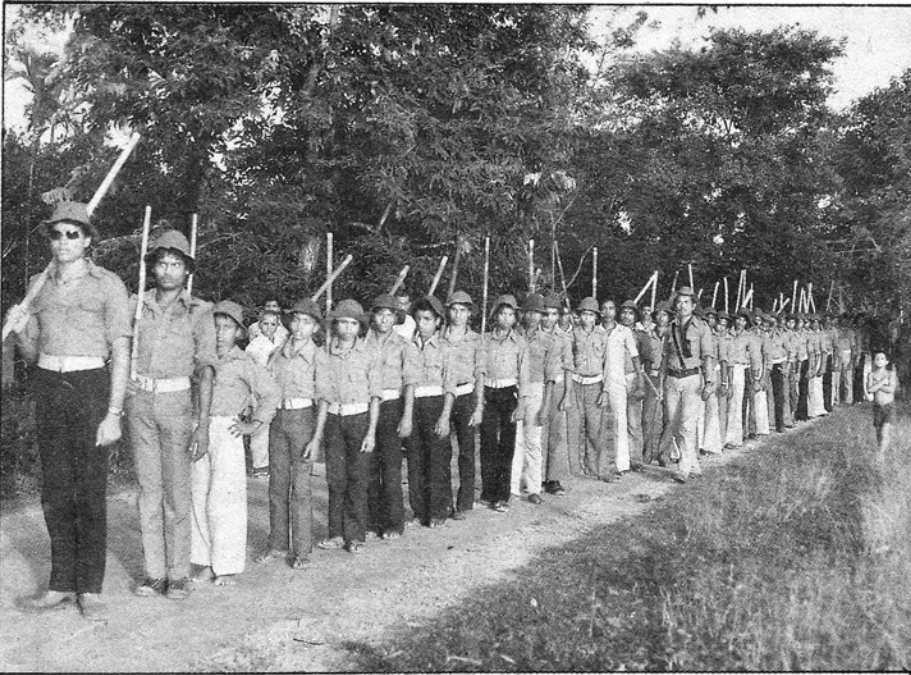
এদিকে একের পর এক, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে বিধ্বংসী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন যখন ব্যতিব্যস্ত, সর্বব্যাপী উদ্বেগ ও ত্রাসের ঝড় বইছে এরই মধ্যে '৮৭-র ৩১ আগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরার কল্যাণপুর পুলিশ খবর দেয়, খোয়াই মহকুমার সোনাতলা গ্রামে রাতের অন্ধকারে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত, আরও কয়েকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে 'আমরা বাঙালি'র একটি প্রশিক্ষণ শিবির চলছিল বেশ কয়েক দিন ধরে।

পরদিন রাজ্য বিধানসভায় উদ্বিগ্ন সদস্যদের এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী জানান—ওই গ্রামের জনৈক রাখাল দেবের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে বোমা তৈরির সময় ওই বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা 'আমরা বাঙালি' দলের সদস্য। পুলিশ এ ব্যাপারে বাড়ির মালিক রাখাল দেব সহ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি বিস্ফোরক, ১২টি ব্যাটারি এবং ৪টি হাতঘড়ি।

পূর্বোত্তর ভারতে স্পর্শকাতর সীমান্তরাজ্য ত্রিপুরায় একদিকে টি এন ভি নামধারী উপজাতি উগ্রবাদীরা যখন 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গঠনের দাবিতে

নির্বিচার হত্যা ও সন্ত্রাস কায়েম করে চলেছে, তখন অন্য দিকে 'বাঙালীস্থান' গঠনের দাবিতে 'আমরা বাঙালি'র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। ত্রিপুরার প্রবীণ মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলছেন, সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট আনন্দমার্গ পরিচালিত উগ্র সাম্প্রদায়িক 'আমরা বাঙালি' দল 'বাঙালিস্থানের' শ্লোগান তুলে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। এই উগ্রবাদীরা টাইমবোমা দিয়ে নিরীহ উপজাতিদের হত্যা করছে। উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদ ভাঙার দাবি তুলেছে। বাঙালি সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তুলে পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতি ও ঐক্য সংহতি বিপন্ন করে ত্রিপুরায় আবার দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র করছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে।

পক্ষান্তরে রাজ্য সরকারের অভিযোগ অস্বীকার করে 'আমরা বাঙালি' নেতৃবৃন্দ বলছেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আমরা বাঙালি বিশ্বাস করে না। দলের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে পরিচিত রাজ্য কমিটির সচিব দেবব্রত দত্ত আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। মান্দাই দামছড়া বাজারে বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। দলের ভাবমূর্তিকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে মার্কসবাদী সরকার আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে আমাদের নেতা ও কর্মীদের সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করে হেনস্থা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, সাম্প্রতিক টাইমবোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে আমরা বাঙালি ও আনন্দমার্গীদের যুক্ত থাকার বেশ কিছু তথ্যাবলী পাওয়া গেছে। তার ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার ও তল্লাসী অভিযান চালানো হচ্ছে। 'বাঙালি স্থান' গঠনের দাবিতে 'বাঙালি মুক্তি বাহিনী' নামে একটি জঙ্গী সংস্থাও সক্রিয়। কলকাতা, শিলিগুড়ি এবং ত্রিপুরার দামছড়া মান্দাই–এর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাবলী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা দুই আমরা বাঙালি কর্মীকে দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৯৭৭–এর বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করেন, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া, অশিক্ষিত, দারিদ্র্য–জর্জর উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই তারা 'জমি হস্তান্তর' আইনের বাস্তবায়ন এবং উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন করবেন। চল্লিশের দশক থেকে উপজাতি স্বায়ত্ব শাসনের দাবিকে ভিত্তি করেই ত্রিপুরায় মার্কসবাদী রাজনীতির আত্মবিকাশ।

রাজধানী আগরতলার শিশু উদ্যানে বামফ্রন্টের বিজয় উৎসব উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে প্রবীণ মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঘোষণা করলেন–'এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী

বাহিনীর প্রশিক্ষণশিবির
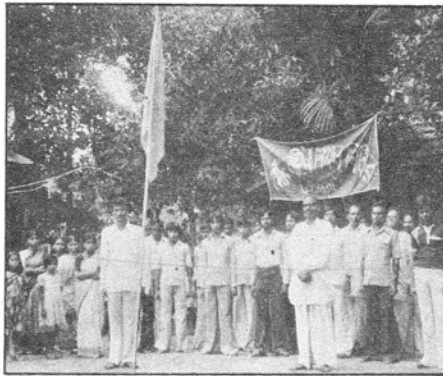
একদিন পুলিশের নির্যাতন উপেক্ষা করেও আমাদের খাদ্য দিয়ে আশ্রয় দিয়ে পার্টির সর্বাত্মক সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। আমাদের আন্দোলনের চাপের মুখেই ১৯৭৪ সালে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত বিধানসভায় জমি হস্তান্তর আইন পাস করিয়ে নিলেও রাজনৈতিক কারণে তার বাস্তবায়ন না ঘটিয়ে উপজাতিদের শোষণে মদত জুগিয়েছে। উপজাতিদের ন্যায্য দাবি দাওয়া উপেক্ষিতই থেকে গেছে। আজ দীর্ঘ সংগ্রামের পরে আমরা ক্ষমতায় এসেছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণা এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গা ও অন্যান্য কারণে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠী একদার রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নেয় এবং উপজাতিদের জমি কিনে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এবং ক্রমে পাহাড়ি রাজ্যটিতে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। ২০ কোটি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ত্রিপুরায় ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যানে সংখ্যাগুরু উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। আনুপাতিক হারে উপজাতিদের সংখ্যা ২৯ শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে জমি হস্তান্তর আইন বাস্তবায়নের ঘোষণায় গ্রামাঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

বিতর্কিত ওই আইনে বলা হয় ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যেসব বাঙালি জেলা সমাহর্তার বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে উপজাতিদের জমি কিনে নিয়েছে, সে সব জমি বেআইনী হিসেবে গণ্য হবে এবং সেগুলি সংশ্লিষ্ট উপজাতিদের ফেরৎ দিতে হবে। অবশ্য এর ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের জন্য সামান্য সরকারি অনুদানের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। রাজধানী আগরতলার শিশু উদ্যানে এক বিশাল সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'আমরা বাঙালি' সংগঠন। ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কমিটির সভাপতি হন ভুবন বিজয় মজুমদার এবং সম্পাদক অনিল দেবনাথ। বস্তুত ১৯৬৭ সাল থেকে 'প্রাউটিস্ট ব্লক অব্ ইণ্ডিয়া' নাম দিয়ে যে সংগঠনটি সক্রিয় এবং ১৯৭৭–এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পর্যুদস্ত হয় সেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দই 'আমরা বাঙালি' সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ফের আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 'আমরা বাঙালি' সংগঠন গড়ে ওঠে।

আগরতলার প্রকাশ্য সম্মেলন থেকে 'আমরা বাঙালি'র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন: বামফ্রন্ট সরকারের বিভেদকামী জমি হস্তান্তর আইন এবং উপজাতি জেলা পরিষদ যে কোন মূল্যে আমরা রুখবোই। প্রয়োজনে রক্ত দেব, তবু জমি ছাড়বো না, জেলা পরিষদ হতে দেব না। এই সেন্টিমেন্টাল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগঞ্জে ব্যাপক প্রচারাভিযানের পাশাপাশি অচিরেই ব্যাপক

আমরা বাঙালির মিছিল
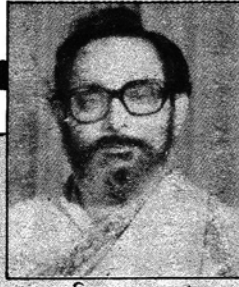
ভুবনবিজয় মজুমদার

'বাঙালিস্থান' না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে'

'অসমীয়াদের জন্য আসাম, মিজোদের জন্য মিজোরাম, নাগাদের জন্য নাগাল্যাণ্ড, মনিপুরে মণিপুরী ছাড়া কেউ বসবাস করতে পারবে না। মেঘালয় আর ত্রিপুরাও উপজাতিদের জন্য ঘোষিত। তাহলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পঁচাত্তর লক্ষ বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাসভূমি কোন্‌টি?' আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রায় উত্তেজিত কণ্ঠেই পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন আজকের বিতর্কিত 'বাঙালিস্থান' আন্দোলনের শীর্ষ নেতা 'আমরা বাঙালি' দলের প্রতিষ্ঠাতা ও ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ভুবন বিজয় মজুমদার।

তিনি বললেন, 'আসাম ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্নাংশেই আজ 'বিদেশি হঠাও' স্লোগান তুলে চলছে বাঙালি উৎখাতের ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বাঙালি জাতির রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও ভারতের মাটিতে সেই বাঙালি জাতিগোষ্ঠী অবাঞ্ছিত, 'বিদেশি' শব্দে আখ্যায়িত। উত্তরপ্রদেশের, বা বিহারের এক একটি ঘটনায় দিল্লির সংসদে ঝড় বয়ে যায়, সারা দেশে সোরগোল ওঠে। অথচ ত্রিপুরা, আসামে কত শত হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে! কিন্তু দেশের কোনও প্রান্ত থেকে কি কোনও প্রতিবাদ বা ধিক্কার উঠেছে? তাই বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি—'বাঙালিস্থান' গঠনের। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, বিহার, উড়িষ্যার বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক অঞ্চল হবে 'বাঙালিস্থান'। বাঙালি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এই দাবি পূরণের লক্ষ্যে আমাদের আন্দোলন চলবেই।'

প্রশ্ন: 'খালিস্থান', 'গোর্খাল্যাণ্ড' এসব আন্দোলন ভারতের ঐক্য সংহতির সামনে আজ এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 'বাঙালিস্থান' আন্দোলন কি জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নয়?

উত্তর: 'খালিস্থান' সম্পূর্ণই একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ওরা ভারতবর্ষ থেকে পৃথক রাষ্ট্র চাইছে। গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনও বাংলাকে ভাগ করার আরেক ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে সংবিধানসম্মত ভাবেই 'ব্যাঙালিস্থান'-এর দাবি জানাচ্ছি। সংবিধানের যে ধারা বলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের মাধ্যমে হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয় ইত্যাদি নতুন নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে, সেই ধারা বলেই 'বাঙালিস্থান' গঠনের দাবি করছি আমরা। কাজেই তা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী হবে কেন?

প্রশ্ন: বলা হচ্ছে 'আমরা বাঙালি' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে আনন্দমার্গ। যার পেছনে মদত যোগাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

উত্তর: স্রেফ অপপ্রচার। আনন্দমার্গ একটা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংস্থা। আর 'আমরা বাঙালি' একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলন। এই দু-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের সাংগঠনিক তৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলি অপপ্রচার চালাচ্ছে।

প্রশ্ন: এটা কি ঠিক যে, ১৯৮০ সালে আনন্দমার্গের বেনারস 'ধর্মমহাচক্র' সম্মেলনে সারা ভারতের বিভিন্ন অংশে ৪৪টি আঞ্চলিক সংগঠন তৈরি করে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। 'আমরা বাঙালি' আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি?

উত্তর: ওটা আনন্দমার্গের সম্মেলনে নয়। ওই বছর 'প্রাউটিস্ট ইউনিভার্সাল'-এর সম্মেলনে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রশ্ন: প্রাউটিস্ট ইউনিভার্সাল-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রভাত রঞ্জন সরকারই তো আনন্দমার্গেরও মহাপরিচালক 'আনন্দমূর্তিজী'?

উত্তর: আমি বুঝতে পারছি আপনি কোন্ দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছেন। আদর্শগত কারণে আমরা প্রাউট দর্শনটাকে বেছে নিয়েছি। তার অর্থ এই নয় আনন্দমার্গই আমাদের পরিচালনা করছে। ভারতের কমুনিস্ট পার্টিও তো একটা বিদেশি ইজমকে বেছে নিয়েছে। তার অর্থ কি ওরা চীন-রাশিয়ার দ্বারা পরিচালিত?

প্রশ্ন: আপনাদের সহধর্মী কয়েকটি সংগঠনের নাম বলুন।

উত্তর: যেমন আসামে 'জয়অই অসম', পাঞ্জাবে 'অসি পঞ্জাবী', বিহারে 'ভোজপুরী সমাজ', কাশ্মীরে 'আজাদ কাশ্মীরি' প্রভৃতি।

প্রশ্ন: এ ধরনের আঞ্চলিক আন্দোলন ভারতবর্ষে অস্থিরতা সৃষ্টিতেই ইন্ধন যোগাচ্ছে না?

উত্তর: আমরা বলতে চাই প্রতিটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রিকতার সুবাদে প্রতিটি অঞ্চলে পরিকল্পিত ভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা চলছে। আমরা তারই বিরুদ্ধে লড়ছি। সর্বোপরি আমরা মনে করি আমাদের সংবিধানটাই বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস।

প্রশ্ন: ত্রিপুরায় তো 'আমরা বাঙালি' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মূলত উপজাতি জমি হস্তান্তর আইন ও জেলা পরিষদ ইস্যুর বিরুদ্ধে। আপনারা হুমকি দিয়েছিলেন 'রক্তের বিনিময়েও জেলা পরিষদ রুখবো'। কিন্তু সেই জেলা পরিষদও হল। জমি হস্তান্তর আইনও কার্যকর হচ্ছে!

উত্তর: আমরা তো এখন এর বিরুদ্ধেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের বহু কর্মী হতাহত হয়েছে। জেলে গেছে। নানাভাবে হেনস্থা নির্যাতন চলছে। আমরা এসবের বিরুদ্ধেই সংগঠনকে গড়ে তুলছি।

প্রশ্ন: কিন্তু 'বাঙালী বাহিনী' নামে তো আপনাদের একটি সংস্থা রয়েছে। সামরিক কায়দায় ট্রেনিংও নাকি দেওয়া হচ্ছে—এটা কি ঠিক?

উত্তর: মিথ্যে কথা। 'বাঙালী বাহিনী' নিছক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। প্যারেড বা লাঠি খেলা এইসব ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। এ নিয়েই নানা অপপ্রচার চলছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রশ্ন: কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার কি 'বাঙালিস্থান'-এর দাবি মেনে নেবে?

উত্তর: 'বাঙালিস্থান'-এর দাবি মানতে কেন্দ্রকে বাধ্য করানোর লক্ষ্যেই তো আমাদের আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

—সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী।

সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকল। জমি খুইয়ে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হওয়ার আশংকার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে প্রবল জনমত গড়ে উঠতে থাকে। জমি হস্তান্তর এবং জেলা পরিষদ ইস্যু দুটিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় আমরা বাঙালি সংগঠন অচিরেই বামফ্রন্টের সামনে মস্ত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

১৭ জানুয়ারি ১৯৭৯ সাল। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই দিনই বিধানসভা অধিবেশন বসল এবং সেখানেই 'দ্য ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনমাস বিল ৭৯' পেশ করা হল। এই বিলের প্রতিবাদে 'আমরা বাঙালি' চব্বিশ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধ ডাকল। বন্ধকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল। আগুন জ্বলল। পুলিশের লাঠি চার্জ, গুলিবিদ্ধ হয়ে বিশ্রামগঞ্জে পরিমল

শীলের নিহত এবং আরও অনেকের আহত হবার ঘটনা ঘটল। কয়েক শ' বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তার বরণও করলেন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল।

১৭ জুন ১৯৭৯। 'আমরা বাঙালি'র বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে রাজস্ব মন্ত্রী বীরেন দত্ত অমরপুরে প্রকাশ্য সভা ডাকলেন। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল। নির্বিচার লাঠি ও গুলিতে একজন নিহত এবং বহু আহত হল। বামফ্রন্ট কমিটি জরুরী বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা বাঙালির মোকাবিলায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে রাজ্যব্যাপী প্রচারাভিযান চালান হবে।

৯ জুন ১৯৭৯। পশ্চিম ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় জনসমাবেশ ডাকা হল। 'আমরা বাঙালি'র পক্ষ থেকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই অঞ্চলে ১২ ঘন্টার বন্ধ ডাকা হল। বন্ধ উপেক্ষা করে ফ্রন্টের জমায়েতে যোগদানকারী জঙ্গী জনতার সঙ্গে 'আমরা বাঙালি'র সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ল হাঙ্গামা। পুলিশের লাঠি গুলি চলল। সভা বানচাল হয়ে গেল। এর পরদিনই ভোর থেকে ওইসব অঞ্চলে হাঙ্গামা উগ্রসাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। নির্বিচার গৃহদাহ, লুঠপাট। দু'দিনের হাঙ্গামায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০। দুই সহস্রাধিক নরনারী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয়। ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির ইতিহাসে প্রথম কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা। আমরা বাঙালি সহ সমস্ত বিরোধী দলগুলি দাবি তুলল, তেলিয়ামুড়া দুর্ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। কিন্তু সরকার সেই দাবি অগ্রাহ্য করে সরাসরি হাঙ্গামার জন্য 'আমরা বাঙালি' কেই দায়ী করলেন। বেশ কিছু গ্রেপ্তারও হল। মামলা রুজু হল।

১৯৮০-র জুন মাস। একদিকে 'আমরা বাঙালি'র তীব্র বিরোধিতা, অন্যদিকে ষষ্ঠ তপশীল-মোতাবেক স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠন সহ বিভিন্ন দাবিতে রাজ্য বিধানসভার একমাত্র বিরোধী দল আঞ্চলিক উপজাতি যুব সমিতির ডাকে সপ্তাহব্যাপী বাজার বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ৬ জুন হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়লে ত্রিপুরায় এক নজির বিহীন অধ্যায় রচিত হল। কয়েক হাজার নরনারী নিহত হল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়। গৃহদাহ, লুণ্ঠনের শিকার হয়ে চার লক্ষাধিক নরনারী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিল। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেতার ভাষণে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানালেন। উপজাতি জেলা পরিষদের নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। ১৯৮০-র ১৩ জুলাই ওই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

এই ভয়াবহ পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি নাকচ করে দিয়ে মার্কসবাদী সরকার আমরা বাঙালি এবং যুব সমিতির প্ররোচনামূলক আন্দোলনকে সরাসরি দায়ী করলেন। অনেককে গ্রেপ্তার করে মামলা রুজু করা হল। ত্রিপুরার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দিল্লি থেকে ছুটে এলেন দীনেশ সিং।

বাঙালিস্থানের পরিকল্পিত মানচিত্র
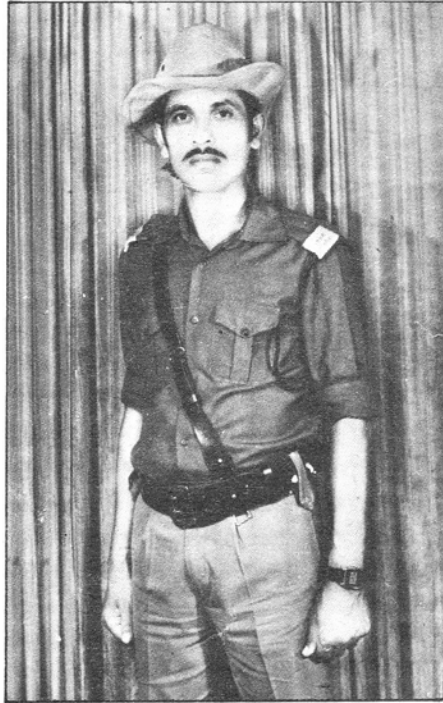
বাঙালিবাহিনীর কম্যাণ্ডার ইন চিফ সুশীল মালাকার

তারপর ৩ জানুয়ারি ১৯৮২। 'আমরা বাঙালি' প্রদেশ কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যের তিন চতুর্থাংশ এলাকাকে নিয়ে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হল। ২৮ সদস্য পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বী যুব সমিতিকে পেছনে ফেলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল শাসক সি পি এম। নির্বাচন প্রতিরোধ করতে গিয়ে 'আমরা বাঙালি' বন্ধ, বিক্ষোভ মিছিল করে। দুই শতাধিক কর্মী গ্রেপ্তার হয়।

৫ জানুয়ারি ১৯৮৩। ত্রিপুরা বিধানসভ নির্বাচনে ৪৩টি আসনে দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উত্তর ত্রিপুরার প্রচারস্থল কেন্দ্র থেকে দলের একমাত্র সদস্যা রত্নাপ্রভা দাস বিজয়ী হন। বর্তমানে সারা রাজ্যে ১৩টি গাঁও পঞ্চায়েত 'আমরা বাঙালি'র দখলে। এছাড়া বিভিন্ন গাঁসভায় দেড় শতাধিক পঞ্চায়েত সদস্যও রয়েছেন।

১৯৮৮-র আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও দল মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৮টি কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনীত করে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এবারও দলের মুখ্য নির্বাচনী ইস্যু—জেলা পরিষদ বাতিল এবং বাঙালিস্থান গঠন। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৮০র জুন দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, জমি হস্তান্তর আইন বাতিল, পৃথক বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন প্রভৃতি। দলের রাজ্য নেতাদের দাবি, আসন্ন ভোটে তারা ভালো ফল করবেন।

কিন্তু গোড়ার দিকে ত্রিপুরায় 'আমরা বাঙালি'র যে রমরমা বা জনপ্রিয়তা ছিল, এখন আর তেমনটি যে নেই এটা খোদ রাজ্য সভাপতি ভুবন বিজয় মজুমদার ছাড়াও দলের অনেকেই স্বীকার করলেন। ভুবনবাবুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রথম দিকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে বন্যার জোয়ারের মত অনেকেই দলে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু এখন চলছে আমাদের প্রকৃত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার পালা।

১৯৭৯ এবং ৮০-র জুন মাসের দাঙ্গার সহস্রাধিক মামলা এখনও দলীয় কর্মী-নেতাদের বিরুদ্ধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যারাই শাসক সি পি এম-এ যোগ দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধারও টোপ ফেলা হচ্ছে। কিন্তু এসব করেও বাঙালিস্থান আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা যাবে না বলে শ্রী মজুমদার জোর দিয়েই বললেন।

তবে এসব অভিযোগ যে মিথ্যে নয় তার বড় প্রমাণ, ইতিপূর্বে দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক এবং 'বাঙালিস্থান' কেন্দ্রিয় কমিটির সহ সম্পাদক অনিল দেবনাথ কয়েকশ' অনুগামী নিয়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছেন। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধাও অনেকেরই ভাগ্যে জুটেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ সুশীল মালাকার বললেন, আমাদের নামে মার্কসবাদী সরকার উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা রটাচ্ছে। দলের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে বাঙালি বাহিনী। এ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? 'ভলান্টিয়ার সোস্যাল সার্ভিস' নামে পরিচিত এই বাঙালি বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির সমূহে মুখ্যত শরীর চর্চা, লাঠি চালনা প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে বলে সুশীলবাবু জানালেন।

একদিকে 'স্বাধীন ত্রিপুরা'র দাবিতে টি এন ভি নামধারী মিশনারী প্রভাবিত উপজাতিদের ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, অন্যদিকে বাঙালিস্থান গঠনের দাবিতে 'আমরা বাঙালি' গঠনের দাবিতে আমরা বাঙালি'র নব পর্যায়ে আন্দোলনের বিতর্কিত প্রস্তুতি পর্বের তৎপরতা, এই প্রেক্ষাপটে তিনদিক বাংলাদেশ সীমান্তবেষ্টিত ত্রিপুরার বাইশ লক্ষ জাতি উপজাতির ভবিষ্যত কোন্ অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত সেই প্রশ্নটাই আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিপুরা থেকে সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

ক্রাইম ২৪ পৃষ্ঠার পর

বিধানসভা সদস্য শেঠ গুলাবচন্দ্র আর মধ্যপ্রদেশেরই দাতিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ধীরেন্দ্র কুমার কে পুলিশ এরপর নাসা আইনে গ্রেফতার করে। পুলিশ এরপর কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করে যে সব তথ্য আদায় করে তা তাদের অবাক করে দেয়।

যেমন রাজু ফাঁস করে দেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার নাম। তেমনিই জানা যায় সে তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে রাজ বব্বরের সঙ্গে। বম্বেতে গিয়ে সে নাকি থাকত রাজ বব্বরের ফ্ল্যাটেই। সেখানেই সে নাকি পরিকল্পনা করছিল অমিতাভ বচ্চনকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের। ধরা না পড়লে সেই পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়ে যেত।

গ্রেফতারের পর রাজুকে রাখা হয় কড়া সুরক্ষায়, দিল্লির তিহার জেলে। একে একে ধরা পড়ে রাজুর সহযোগীরা। ব্রজমোহন গুপ্তা, নরেশ সোনী, গুলাম সিবতেন, আনিস, আর লক্ষ্মীনারায়ণ।

তিহার জেলে রাজু ঘনিষ্ঠতা বাড়ায় আন্তর্জাতিক অপরাধী চার্লস শোভরাজের সঙ্গে। শোভরাজ খবরের কাগজ মারফৎ রাজু ভাটনগরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানত। রাজু শোভরাজের সঙ্গে এরপর পরিচয় করায় তিহারে ততদিনে চলে আসা লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে। জেলে শোভরাজের সঙ্গে দীর্ঘ চারবছর কাটায় রাজু ভাটনগর। জেলে এতদিন একসঙ্গে থাকার দরুন জেলের অফিসারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল এরা দুজনে মিলে। দুজনে তিহার জেলের ঘাঘু অপরাধীদের নেতা হয়ে বসে জেলের মধ্যেই।

এরপর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫ তিহার জেলের কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌছোয় রাজু ভাটনগরের মুক্তির আদেশ। দিল্লির কার্যকারি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জু গোয়েলেব জারি করা আদেশপত্র এটি। এই আদেশনামা পাওয়ার পর রাজুকে মুক্ত করে দেন তিহার জেলের কর্তৃপক্ষ।

রাজু ভাটনগরের মুক্তি পাওয়ার খবর উত্তরপ্রদেশ সরকার পান ১৫ দিন পর। খবর পেয়েই পুলিশ প্রশাসন হতচকিত হয়ে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের গৃহ মন্ত্রণালয় যথেষ্ট শংকিত হয়ে পড়েন, এই সম্ভাবনায় যে উত্তরপ্রদেশে আবার তার কাজ শুরু হলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যাটি আরও ব্যাপক হয়ে পড়বে।

এদিকে রাজুর বিরুদ্ধে হত্যা, লুট, অপহরণের ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তখন দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আশঙ্কায় চকিত দিল্লি পুলিশ খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে যে ওধরনের কোনও আদেশনামাই কখনও জারি করা হয়নি। আদেশনামাটি পুরোপুরি জাল।

চার্লস শোভরাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটি জেনে দিল্লি পুলিশ এরপর চার্লস শোভরাজের পাহারা জোরদার করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘটনার তিনমাসের মধ্যে ১৬ মার্চ ১৯৮৬ প্রকাশ্য দিনের আলোয় চার্লস শোভরাজ সহ ছজনকে তিহার থেকে মুক্ত করে রাজু ও তার সহযোগীরা। এই ছ জনের মধ্যে ছিল রাজুর বিশ্বস্ততম সহযোগী লক্ষ্মীনারায়ণ।

এরপর দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সম্মিলিতভাবে রাজুর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাতে থাকে। কিন্তু রাজুর কোনও খোঁজই মেলে না। পুলিশ কিন্তু সন্ধান পেয়ে যায় সুনীতার। রাজুর প্রেমিকা।

জেল থেকে বেরিয়ে রাজু তার প্রেমিকা কানপুরের সুনীতা তিওয়ারীকে নিয়ে লখনউ–এ চলে আসে। সেখানে স্বামী স্ত্রী হিসেবে তারা আমীনাবাদের কাছে একটা কামরা নিয়ে থাকা শুরু করে।

সুনীতা পুলিশকে জানায়, সে রাজুর বিবাহিতা স্ত্রী। হামীরপুর জেলার রাঠে রাজুর বাড়িতে তাদের বিয়ে হয়েছে। পুলিশকে সে জানায় শোভরাজ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কয়েকদিন আগে সুনীতাকে একলা রেখে সে কোথাও চলে যায়।

সুনীতার সঙ্গে রাজুর নাকি প্রথম দেখা তিহারেই। সুনীতার এক বান্ধবী শাবানা কাজ করত দিল্লির এক বড় হোটেলে। সুনীতা তার কাছে গিয়ে দিল্লিতে থাকত মাঝে মধ্যে। এরপর সে দিল্লিরই একটা বিজনেস

ফার্মে কাজ পেয়ে যায়, তারপর দিল্লিতেই থাকা শুরু করে। ফ্যাশনেবল সুনীতার দিল্লি শহর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। শাবানার এক ভাই তিহার জেলে ছিল কোন অপরাধের দরুন। শাবানা বেশ কয়েকবার জেলে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও দেখা করতে পারে না। রাজু ভাটনগরের তখন তিহার জেলে বেজায় প্রভাব প্রতিপত্তি। কোনও সূত্রে রাজু ভাটনগর শাবানার ভাইয়ের সঙ্গে শাবানার দেখা করার বন্দোবস্ত করার সুযোগ করিয়ে দেয়। শাবানা এরপর কয়েকদিন সুনীতাকে সঙ্গে নিয়ে তিহারে যায়। সেখানেই রাজু ভাটনগরের সঙ্গে দেখা সুনীতার, প্রথম দর্শনেই প্রেম। এরপর শাবানার সঙ্গ ছাড়াই সুনীতা তিহার জেলে যাওয়া শুরু করে। তিহার জেলে রাজুর প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে জেলের খোলামেলা আঙ্গিনা আর বাগানে প্রেম গভীর হয়ে ওঠে।

সুনীতাকে পুলিশ তার বাপের বাড়ি কানপুরে পৌছে দিয়ে তার ওপর কড়া নজর রাখে। এদিকে রাজু উত্তরপ্রদেশ আর দিল্লি পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় আহমেদাবাদে। সেখানে কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে নভেল নগর কলোনিতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়।

চার সাড়ে চার বছর কোনও কাজ না করে রাজুর টাকা পয়সা ক্রমশ: ফুরিয়ে আসছিল। অতএব সে আবার সক্রিয় হবার পরিকল্পনা নেয়। এরপরেই ১৯৮৬র জুলাইয়ে আহমেদাবাদের এক ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা লুঠ করে সে বম্বেতে চলে যায়। জুহু বীচের 'পামগ্রো' হোটেলে কিছুদিন থাকার পর আবার সেই উত্তরপ্রদেশে, তার পরিচিত ক্ষেত্রে। লখনউ-এ এসে সে আবার ভেঙে যাওয়া দল নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সেখানে একে একে এসে হাজির হয় বিশ্বস্ত সহযোগী লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রিজমোহন, বজরংগ। এখানেই সে পরিচিত হয় ওমপ্রকাশের সঙ্গে। ওমপ্রকাশ লখনউ-এরই এক দাগী অপরাধী। লখনউ-এ রাজুর সঙ্গী হয় এক বাঙালি যুবকও। নাম তার শংকর দে।

রাজু ইতিমধ্যে সুনীতার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিল। সুনীতার প্রেমে সে এতই মশগুল ছিল যে দলের অন্যান্য সঙ্গীরা তাকে বারবার জানায় সুনীতার সঙ্গে সম্পর্ক সে যেন ভেঙে দেয়। নইলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে যে কোনওদিন। রাজু কিন্তু সুনীতার সঙ্গে দেখা করার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রদেশে এক ব্যাঙ্ক লুঠের পরিকল্পনা করছিল তারা। রাজু তার দলবলকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে জানায় এক সপ্তাহের মধ্যেই সে গিয়ে পৌছাবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ আর বজরংগ মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসে কিছুদিন অপেক্ষা করে, কিন্তু রাজু তখনও গিয়ে পৌঁছোয় না। লক্ষ্মীনারায়ণের নেতৃত্বে এরপর দল দেওয়াসের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া থেকে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা লুঠ করে। নিজের নেতৃত্বের সাফল্যে গর্বিত লক্ষ্মীনারায়ণ এরপর রাজুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। ব্রিজমোহন আর বজরংগ ভাগের টাকা নিয়ে কানপুরে আসে। রাজু ততদিনে সুনীতার সঙ্গে কানপুরে যোগাযোগে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সুনীতার সঙ্গে আবার একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে বাধা ছিল পুলিশ।

কানপুরে সুনীতার প্রাক্তন প্রেমিক রামবাবু গুপ্ত এক ধনী ব্যবসায়ী। রাজু সুনীতাকেও এবার তার দলের কাজে লাগানোর প্রয়াস চালায়। সুনীতাকে পাঠায় রামবাবুর কাছে। সুনীতাকে দেখে রামবাবুর হারানো প্রেম উথলে ওঠে। সুনীতা তার সঙ্গে ঘোরার প্রস্তাব রাখতেই সে রাজি হয়ে যায়। সুনীতার সঙ্গে রামবাবু তার গাড়িতে ঘুরতে বেরোলে রাজু আর ওমপ্রকাশ মিলে তাকে অপহরণ করে। রাজু আবার তার সেই পুরনো কার্যধারায় ফিরে আসে। এলাহাবাদের এক বাড়িতে এই ধনী ব্যবসায়ীটিকে আটকে রেখে ২ লাখ টাকার মুক্তিপণ আদায় করে সে। পুলিশ শত চেষ্টা করেও তাদের টিকিটি ছুঁতে পারে না। রাজু আর ওমপ্রকাশ এরপর ইন্দোরে চলে যায়। সুনীতাও যায় ফেরার হয়ে তাদের সঙ্গে। তাকে অবশ্য রাজু পাঠিয়ে দেয় দিল্লিতে, নিরাপদ আশ্রয়ে। রাজুর দল কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না, ইন্দোরের

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লুঠ করে তাদের হেফাজতে আসে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এরপর রাজু চলে যায় দিল্লিতে।২৩ অকটোবর রাতে পুলিশ লখনউয়ের মহানগর এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করে ওমপ্রকাশকে। সঙ্গে গ্রেফতার হয় কমল সোনী, শংকর দে।

রাজুর দলের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার হওয়ার ২ দিনের মধ্যেই কানপুর পুলিশ রাজুর সহযোগী ব্রিজমোহন শর্মাকে গ্রেফতার করে ফেলে। ব্রিজমোহন ছিল রাজুর ডানহাত। দিল্লির তিহার জেল থেকে চার্লস শোভরাজের সঙ্গে পালিয়েছিল ব্রিজমোহনও। দিল্লি থেকে কানপুর আসার জিটি রোডে একটা গাড়ি লুট করে তারা। পুলিশ ওৎ পেতেই ছিল। ধরা পড়ে সে। কিন্তু পুলিশ শত জিজ্ঞাসাবাদ করেও রাজুর দল সম্পর্কে কোনও তথ্য আদায় করতে পারে না তার কাছ থেকে। কিন্তু এরপর ইন্দোর পুলিশও তল্লাশি চালিয়ে রাজুর দলের আর এক সদস্য বজরংগকে গ্রেফতার করে ফেলে।

দলের সদস্যরা একের পর এক ধরা পড়ছে পুলিশের হাতে। রাজু যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে ওঠে। নতুন করে দল গড়ার জন্য সে তার পুরোনো বন্ধু দেবকুমার ত্যাগীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তিহারেই এই কুখ্যাত অপরাধীটির সঙ্গে রাজুর ঘনিষ্ঠতা। শোভরাজকে জেল থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্রে রাজুর সঙ্গে জড়িত ছিল এই দেবকুমার ত্যাগীও। ২৬ বছরের এই তরুণ শিক্ষাগত যোগ্যতায় ছিল কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট।

দেবকুমার ত্যাগীকে রাজু একটা চমকপ্রদ প্রস্তাব দেয় গতবছর মার্চ মাসে। ভারতখ্যাত তথা কুখ্যাত জালিয়াত রাজেন্দ্র শেঠিয়াকে অপহরণ করে মোটারকমের মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা ছিল সেটি। কিন্তু শেঠিয়া আবার শোভরাজের পরিচিত। সে জন্য এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়।

এরপর রাজু চেষ্টা চালাতে থাকে কোনও বড়সড় দাঁও মারার জন্য। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার নামকরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খেমচন্দ্র-মতিলাল। মালিক সুখনন্দন জৈন, ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। সুখনন্দনের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বন্ধু বিহারী চতুর্বেদী মধ্যপ্রদেশের তেন্দুপাতার নামকরা কন্ট্রাকটর। রাজু আগে থেকে দিল্লিতে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তার সঙ্গে সাগরে গিয়ে রাজু নিজেকে ব্যবসায়ী বিমল কুমার জৈন বলে পরিচয় দেয়। বিহারীর কাছ থেকে তেন্দুপাতার ব্যবসা সম্বন্ধে ঘাঁত-ঘোতগুলো জেনে নিয়েছিল সে। ব্যবসায়ের কথাবার্তা পাকা করতে সাগরের ট্যুরিস্ট বাংলোতে এক ডিনারে আমন্ত্রণ জানায়। এই ডিনারে এসে আর ফেরেনি সুখনন্দন জৈন। সাগরের ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় পান্নার জঙ্গলে। দীর্ঘ ২২ দিন তাকে জামাই আদরে রাখে রাজু। ১৩ লক্ষ টাকা আদায় করে রাজু ঝাঁসিতে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

রাজুর বিশ্বস্ত সহযোগীরা সকলেই জেলের ভেতরে। পুলিশ এবার হন্যে হয়ে ওঠে রাজুকে গ্রেফতারের জন্য।

ইতিমধ্যে রাজুর দলের ওমপ্রকাশকে তাদের পক্ষে কাজ করানোর ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলে পুলিশ। সে পুলিশের চর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পুলিশ রাজুর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছিল ঠিকই। কিন্তু তারা খোঁজ করতে গিয়ে দেখে যে রাজুর যোগাযোগ অনেক উঁচুমহলে। এমনকি কংগ্রেস (ই)–র বিধায়ক দীননাথ পাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠিও লেখেন রাজুর দলের জনৈক সদস্যের মুক্তির ব্যাপারে। এছাড়াও কংগ্রেস (ই)–র বিধায়ক ডি এইচ আনসারিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজুর দলের পক্ষে সুপারিশ করছেন। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস (ই) সেক্রেটারী এস যাদবও নাকি পুলিশকে বিভিন্ন সময়ে চিঠি লেখেন রাজুর সহযোগীদের মুক্তি চেয়ে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের গোপন রিপোর্ট এই যে উত্তরপ্রদেশের পাঁচ জন সংসদ সদস্য, দেড় ডজন বিধানসভা সদস্য, তিরিশেরও বেশি অন্যান্য নেতা বিভিন্ন সময়ে রাজু ভাটনগরকে রাজনৈতিক মদত দিয়ে এসেছেন।

মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলেও রাজুর ছিল যথেষ্ট প্রভাব। কংগ্রেস (ই)–র প্রাক্তন রাজ্য

কোষাধ্যক্ষ শেঠ গুলাবচাঁদ, দাতিয়ার বীরেন্দ্র গুপ্ত, মধ্যপ্রদেশের গৃহরাজ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন জয়পাল সিং–এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আত্মীয় পান্না জেলা কংগ্রেসের নেতা ভূপেন্দ্র সিং, ঝাঁসির লোকসভা সদস্য (মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ) সুজান সিং বুন্দেলা ছাড়াও অনেকের নাম বিভিন্ন সময়ে রাজুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ হয়ে এসেছে। এছাড়া দিল্লিতেও ছিল রাজুর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মহল। পুলিশকে তাই এগোতে হচ্ছিল অনেক ভেবেচিন্তে।

ওমপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে পুলিশকে রাজু সম্বন্ধে খোঁজখবর দিয়ে যাচ্ছিল। এছাড়াও পুলিশের পক্ষ থেকে অপরাধজগতের অন্দরমহলে খোঁজখবর চালিয়ে যাচ্ছিল ইয়াসিন নামের জনৈক ইনফর্মার।

ইতিমধ্যে ইনফর্মার এসে খবর দেয় রাজু সেদিন রাতেই ইউ জি কে ৮২৮৮ নম্বরের সাদা ফিয়াট কারে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এস পি এস এন সিং ইনফর্মারকে নিজের দপ্তরে ডেকে নেন। ডেকে পাঠান কায়সরবাগ, হজরতগঞ্জ, নাকা, তালকোটরা থানার ওসিদের। এছাড়া বেশ কয়েকজন কনস্টবলকে নিয়ে দুটি গাড়িতে চেপে সাদা পোশাকে সেই রাতেই এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান এস এন সিং। সকাল পাঁচটার মধ্যে সাদা পোশাকে পুলিশদল পৌঁছোয় এলাহাবাদে। সিভিল লাইনসের 'হোটেল হর্ষ'–তে এসে ওঠেন তাঁরা। ইনফর্মারকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে অ্যাকশনের জন্য তৈরি হতে থাকে পুলিশদল। ইতিমধ্যে এস এন সিং তাঁর দলবল নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সিভিল লাইনস বাসস্ট্যাণ্ডে এসে অপেক্ষায় থাকেন ইনফর্মারের ফিরে আসার। ইনফর্মার এসে খবর দেয় রাজুর খোঁজ পাওয়া গেছে। সে জানায় লাউদার রোডের এক গ্যারেজে রাজু তার গাড়ির ডেলিভারি নিতে আসবে।

সকাল নটার মধ্যে সেই গ্যারেজের আশেপাশে পজিশন নিয়ে নেয় পুলিশ, সাদা পোষাকে।

কিছুক্ষণ পরেই স্কুটার নিয়ে গ্যারেজের আশপাশে ঘুরে যায় এক তরুণ। সন্দেহজনক কিছু তার চোখে পড়েনা সম্ভবতঃ, এরপর পুলিশদল ঘন্টা তিনেক নিঃশব্দ অপেক্ষা করে। আরও কবার চারধার দেখে যায় এক তরুণ। এবার ধীরে ধীরে একটা ফিয়াট গাড়ি গ্যারেজের সামনে এসে থামে।

পুলিশ ইনফর্মার জানিয়ে দেয় পেছনের সিটে বসা লোকটিই রাজু ভাটনগর! এস পি এস এন সিং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খোলার চেষ্টা চালাতে চালাতে রাজুকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল, রাজু রিভলভার বের করে ভেতর থেকে গুলি চালাতে থাকে। পুলিশপার্টি ইতিমধ্যে পজিশন নিয়ে নিয়েছিল গাড়িটিকে ঘিরে। তাদের হাতের পিস্তলগুলি এবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, রাজু পেছনের সিটে পড়ে আছে, রক্তাক্ত।

রাজু মৃত। কিন্তু তার হত্যা নিয়ে শুরু হয় জটিলতা। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ পায়। যেমন রাজু এলাহাবাদে এসেছিল ফিয়াটে নয় লাল রংয়ের কন্টেসায়। সেই গাড়িটি কোথায় গেল? রাজুর দেহে যে গুলির আঘাতগুলি দেখা গেছে সেগুলির অনেকগুলিই পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে। এছাড়া গাড়ির পেছনের সিটে যেখানে রাজু নিহত হয় সেখানে যে ২১টি খালি কার্তুজ পাওয়া গেছে সেগুলি রাজুর কাছে পাওয়া রিভলভারের নয়। আর রাজু যদি ২১টি গুলি চালিয়েও থাকে তবে পুলিশদলের কেউ আহত হল না কেন? সর্বোপরি পুলিশ লাল কন্টেসা–র অস্তিত্বই অস্বীকার করে যাচ্ছে, অথচ গাড়িটিকে এলাহাবাদে দেখা গেছে। কিভাবে রাজুর মৃত্যু হল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য সরকার সি বি আই রিপোর্টের আদেশ দিয়েছেন অতঃপর।

লখনউ থেকে অজয় কুমার, সুরেশ দ্বিবেদী, স্বদেশ কুমার, রাজেন কুমার। দিল্লি থেকে পুষ্কর পুষ্প। ভুপাল থেকে সোমদত্ত শাস্ত্রী। এলাহাবাদ থেকে সঞ্জিৎ সিং।

ছবি: ওয়াসিমুল হক, বিভু গুপ্ত

রাজধানী পরিবর্তন কি প্রফুল্ল মহন্ত সরকারকে বিপদে ফেলবে?

দিসপুর থেকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তর নির্বাচনী এলাকার শিলঘাটে রাজ্যের রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অ গ প দলের মধ্যেই বিক্ষোভের ঝড় তুলেছে। কামরূপ জেলার অ গ প সমর্থক ছাত্র সংস্থার ধর্মঘট কিভাবে এই ইস্যুতে অ গ প-মুখ্যমন্ত্রীকে বিপাকে ফেলল? রাজ্যমন্ত্রীদের মধ্যেও এ নিয়ে বিরোধ? পূর্তমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী কি বলেন? কংগ্রেস ও সি পি এম-এর ভূমিকা কি? রাজধানী শিলঘাট কি নিম্নঅসমে অ গ প-র সমর্থন নষ্ট করবে? আসাম থেকে ফিরে সুদর্শন মহাপাত্রর রিপোর্ট।

শিলঘাট, নতুন রাজধানীর জন্য নির্বাচিত স্থান

৯ অক্টোবর ১৯৮৭। আসামের গৌহাটি সহ অন্যত্র ২৪ ঘন্টার বন্ধে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলল আসুর (অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) একটি শাখা সংগঠন এ কে ডি এস ইউ (অল কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস ইউনিয়ন)। সারাদিন যানবাহন চলাচল ব্যহত হয়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়, ট্রেনও সময় মত চালানো যায় নি। অসম পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারে নি। দিসপুর গৌহাটির রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরোয়। সারিবদ্ধ মিছিলের শ্লোগান ছিল–'দিসপুর থেকে শিলঘাটে রাজধানী স্থানান্তকরণের রাজনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ করুন। অ গ প সরকারের খামখেয়ালী নীতি নিপাত যাক।'

শুধু দিসপুর গৌহাটিতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আকড়সুর ডাকে ধর্মঘট পালিত হয়। ধুবড়ি, বরপেটা ও গোয়ালপাড়াতেও সরকারের বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটি হল অ গ প রাজ্য সরকারের ছাত্র সংগঠন আসুরই এক সময়স্রষ্টা ও কর্ণধার হয়ে কাজ করছিলেন বর্তমান অ গ প মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত। অথচ আসুরই একাংশ আকড়সু সরাসরি অ গ প রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছেন। প্রকাশ্যে আকড়সু বিরোধিতায় নামলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা বিধানসভার কিছু সংখ্যক অ গ প সদস্য পর্যন্ত এর পেছনে পরোক্ষ মদত দিয়ে চলেছেন। অনুমান করা হচ্ছে এঁরা প্রত্যেকেই কামরূপ জেলার। মূল বিতর্ক রাজধানী দিসপুর থেকে সরিয়ে শিলঘাটে স্থানান্তর নিয়ে হলেও বিক্ষোভের পেছনে জড়িয়ে আছে আপার আসাম লোয়ার আসামের চিরকালীন বিদ্বেষ। গৌহাটি থেকে দিসপুরে স্থানান্তরিত হবার সময়েও রাজধানী বিতর্ক নিয়ে কম তোলপাড় হয় নি। আপার-লোয়ার আসামের বিরোধ সেদিনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এখন দিসপুর থেকে শিলঘাটে রাজধানী স্থানান্তর নিয়ে একই প্রশ্ন উঠছে। আর চিরকালীন এই বিবাদের তাত ছড়িয়ে পড়েছে কাছাড়, শিলচর এমন কি কার্বি আলং–এও।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত, বিপাকে?

প্রায় পনের বছর আগে আসাম থেকে মেঘালয়কে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। সঙ্গে শিলংকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ উত্তরপূর্ব ভারতের সাত ভগ্নীরাজ্যের মধ্যে অন্যতম আসামের আজ অবৃদি কোন স্থায়ী রাজধানী তৈরি হয় নি। দিসপুরের বর্তমান প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয়-টি পর্যন্ত আগে স্থানান্তবিত্ত রাজধানী হিসেবে বিবেচিত হত। তখন যেখানে বিধানসভা এবং মহাকরণ, তা আগে ছিল একটি চা প্রসেসিং ফার্ম হাউস। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ফার্ম হাউসটিকে রাজধানীর উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা এবং বিগত কয়েক বছর প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার

৬৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দিসপুরে, বর্তমান রাজভবন

দক্ষিণী নায়কের প্রস্থান ও পরবর্তী নাটক

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

দক্ষিণের রাজনীতিতে ইন্দ্রপতন ঘটে যাওয়ার পর এখন শূন্যতা। সেই শূন্যতাকে ঘিরে বিভিন্ন মহলের সুযোগ সন্ধানের পালা। এম জি আর কত বড় শূন্যতা রেখে গেছেন তামিলনাড়ু তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে! রূপোলি পর্দা থেকে জনতার বিশ্বাসের কেন্দ্রে আসতে তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে কতটা পথ?, এরপর কি? আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন।

ক্ষাধিক শোকাহত শ্রদ্ধাবনত মানুষের ভীড়। বুকে-মাথায় করাঘাতরত শত শত রমণীর মূছনা। হিংসা। খণ্ডযুদ্ধ। আত্মহত্যা, আত্মদাহ–গত ২৪ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর জনপ্রিয়তম মুখ্যমন্ত্রী এম·জি রামচন্দ্রের মৃত্যুতে রাজ্যবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদনের এই অভিনব প্রয়াস অভূতপূব হলেও কোনমতেই তা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ঠিক এরকমই আর একটি ঘটনার অবতারণা হয়েছিল বছর তিনেক আগে। ১৯৮৪–র অকটোবরে শ্রী রামচন্দ্রন তখন মাদ্রাজস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বেশ কিছু এম জি আর–ভক্ত তাদের আত্মাহূতি দিলেন। শহরের অবস্থা হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ। তারপরই সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে আমেরিকায় স্থানান্তরিত করা হয়। অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কারণ এম·জি·আর–এর স্বাস্থ্য ছাড়াও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের ভারাবেগ এবং রোষ চিকিৎসকদের আরও একটি বড়সড় দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
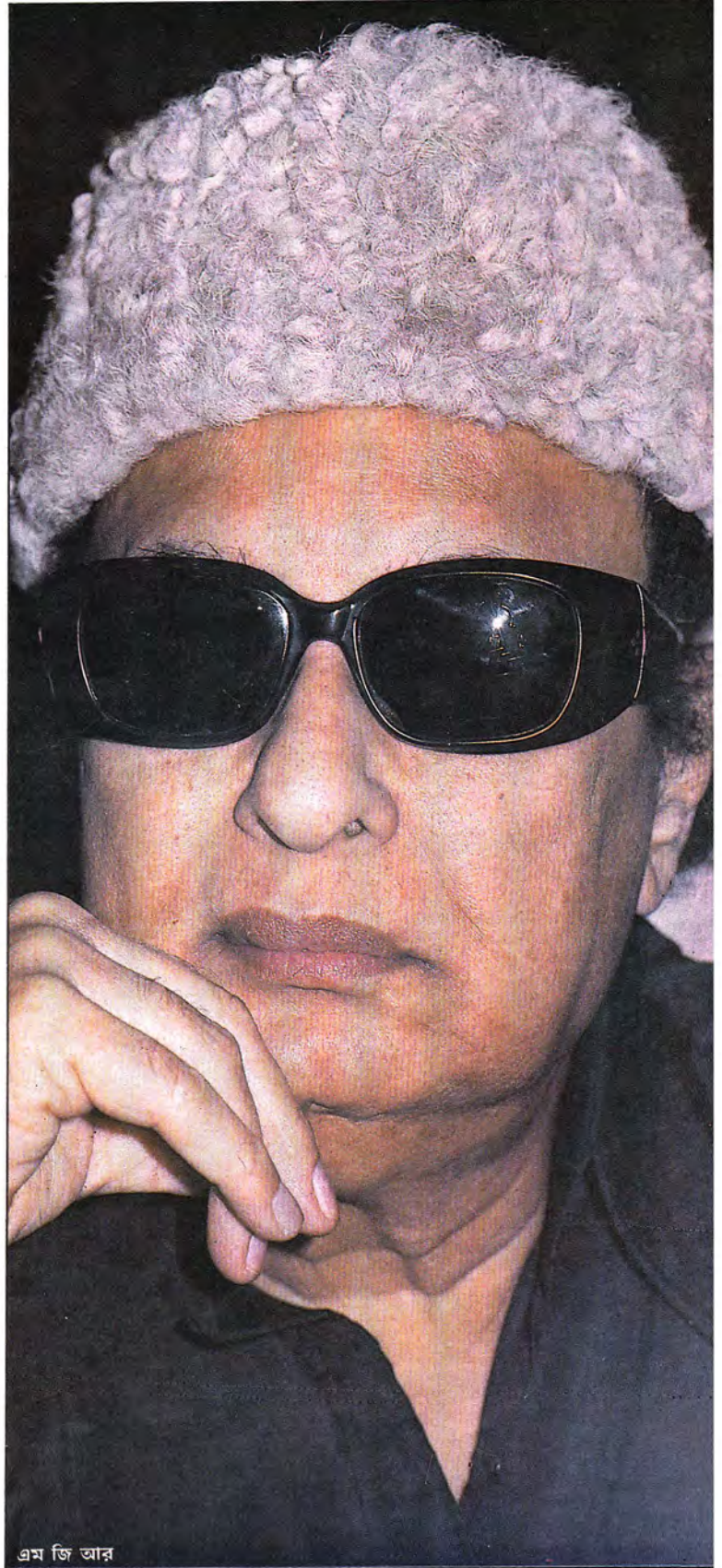
এম জি আর
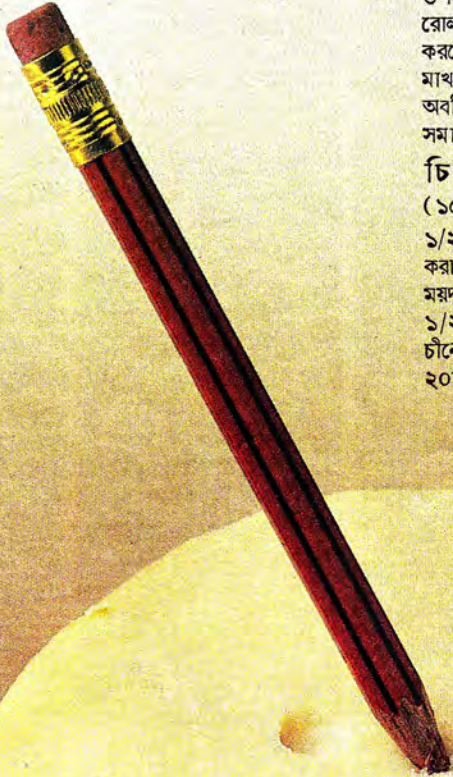
আমার সোনামণিকে
পুষ্টির প্রথম পাঠ শেখায়
আমূল চীজ।
যখন জানলাম খোকনমণির বাড়ন্ত বয়সে ওকে ভরপুর প্রোটিন দেওয়া দরকার, আমূল চীজকে ওর রোজকার রুটিনের সামিল করে নিলাম।সত্যি চীজে প্রোটিন এত বেশি থাকে যে মেনুতে মাংসের অভাবও পুরিয়ে দেয়। আর স্বাদ এমন ভুরভুরে যে আমূল নৈলে খোকনের জিভে রোচেইনা।
ওকে খুসী রাখতে তাইতো ওর টিফিনকৌটোয় রোজই চীজের একটা না একটা নূতন খাবার দিয়ে দিই। আমার মাথা খাটিয়ে বের করা আমূল চীজের রসালো ব্যঞ্জনও রোজই ওর সঙ্গেই স্কুলে যায়।
আমূল চীজ রোল্‌স
(২০টি রোলের মত)
১৫০ গ্রাম আমূল চীজ-কোরানো; ১/২ কাপ দুধ; ২টি ছোট পেঁয়াজ—মিহি কুচোনো; ১টি সিমলা মরিচ—মিহি কুচোনো; ২টি কাঁচালঙ্কা—মিহি কুচোনো; ২ সেমি আদা—মিহি কুচোনো; ১ চা-চামচ নুন; ৪০০ গ্রাম তাজা পাঁউরুটির শ্লাইস—ধারগুলো কেটে বাদদেওয়া; ভাজবার জন্য অল্প তেল।
দুধের সঙ্গে চীজ মিশিয়ে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা আর নুন ও ঢেলে দিন। এই মিশ্রণটি শ্লাইসের উপর মাখিয়ে, প্রতিটি শ্লাইস জ্যামরোলের মত রোল করে নিন। হাল্কা লাল করে ভাজুন। যদি বেক করতে চান তো সামান্য মাখন লাগিয়ে রোলগুলিকে মাখন-মাখানো আভেন-প্রুফ ডিশে ১০-১৫ মিনিট অবধি (১৫০° সেন্টিগ্রেড, গ্যাস ২) বেক করুন। সমানভাবে সেঁকার জন্য একবার উলটে দেবেন।
চিলি চিকেন মিনি বার্গার্‌স
(১৫টির মত)
১/২ মুরগী—সিদ্ধকরা, ছালছাড়ানো, হাড় আলাদা করা ও মাংস মিহিভাবে কুচোনো; ৩ বড়চামচ ময়দা; ২ বড়চামচ চিলি সস; ১ বড়চামচ সয়া সস; ১/২ চা-চামচ গোলমরিচ-গুঁড়ো; ১/২ চা-চামচ চীনে নুন (আজিনোমটো); ভাজবার জন্য তেল; ২০টি আমূল চীজের শ্লাইস।
তেল ছাড়া বার্গারের সব উপকরণগুলি একত্র মেশান ও ১০টি বার্গারের আকার দিন। গরম তেলে বাদামী করে ভাজুন। পরিবেশনের সময়, শ্লাইসকরা একটি চীজ রেখে তার উপর একটি বার্গার রাখুন। আরেক শ্লাইস চীজ রাখুন। এবার টুথপিক (খড়কে) দিয়ে সমস্তটা গেঁথে গরমগরম পরিবেশন করুন।
চীজএর ১২০টি স্বাদেভরা ব্যঞ্জনের আমূল চীজ পুস্তিকা (কেবল ইংরাজীতে) চেয়ে এখানে লিখুন: পোঃ অঃ বক্স ১০১২৪, বম্বে ৪০০ ০০১। অনুগ্রহ করে আবেদনের সঙ্গে ১৫/- টাকার যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্রস্‌ড ডীমাণ্ড ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডার পাঠাবেন। অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড সেল্‌স কর্পোরেশনের নামে পাঠাতে হবে। আপনার পুরো ঠিকানাও এইসঙ্গে দেবেন।
আমূল চীজ
জিভে জল আসা
পুষ্টিতে ঠাসা
বিক্রীব্যবস্থা:
গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড। আনন্দ ৩৮৮ ০০১
OPERATION
FLOOD

জানকী রামচন্দ্রন, মধ্যমন্ত্রীত্বের উত্তরাধিকার!

চিত্রজগৎ থেকে রাজনীতির আসরে নেমে এম জি আর–ই ভারতের প্রথম অভিনেতা–মুখ্যমন্ত্রী। তারপর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই একরকম কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে যান।

তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য উৎসাহী দর্শনার্থীদের ভীড় সামলানো তাঁর জীবদ্দশাতে যেমন এক কঠিন কাজ ছিল–তাঁর মৃত্যুতেও জনগণের এই ইচ্ছে ছিল তেমনই ব্যাকুল। বিভিন্ন শোকসভায় বিতরিত প্রসাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের ভীড় ছিল অকল্পনীয়। জনগণের এই অপার স্নেহ এবং ভালবাসা সম্ভবত দেশের আর কোন মুখ্যমন্ত্রী লাভ করতে পারেন নি। তাই বিগত তিন বছর ধরে কার্যত একরকম পঙ্গু অবস্তাতেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আসীন ছিলেন।

তাঁর দশ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বে এম জি আর–কে বহুবার বিরোধীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে নেমে সকলেই হারের মুখ দেখেছেন। তা তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধিই হোন কিংবা মন্ত্রীমণ্ডলের সদস্য এম·ডি· সোমসুন্দরম। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও কোন সময়েই কম ছিল না। ভ্রষ্টাচার, সরকারী সংস্থার ক্রমাবনিত, পার্টি কিংবা রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্বাসরোধ–বিভিন্ন সময় তিনি নানান অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তা কখনই এম জি আর কিংবা রাজ্যজুড়ে তাঁর ভক্তদের আত্মবিশ্বাস এতটুকু টলাতে পারেনি। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত অবিসংবাদী নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। শারীরিকভাবে চরম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এক আধ জন নয় দশ-দশ জন মন্ত্রীকে অপসারণের দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই রেখে গেছেন।

রাজনৈতিক কূটকৌশলেও এম জি আর ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা যেই গড়ুক না কেন কারো সঙ্গেই তিনি বিরোধিতার পথ অনুসরণ করেন নি। অথচ রাজ্যের জন্য অধিকতর কেন্দ্রীয় সাহায্য আদায় করাই ছিল তাঁর মূল নীতি।

এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ, বিশেষ করে তাঁর সংশোধন নীতির জন্য এম জি আর বরাবর বহু বিবাদ-বিসংবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সস্তা জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষী হিসেবেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু কখনই তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। তাঁর নীতিগুলির মধ্যে তামিনাড়ুর ৩৫ লক্ষ স্কুলের বাচ্চাদের জন্য বিনামূল্যে দুপুরের আহারের সংস্থান এক অভূতপূর্ব সাফল্য–পরে যা অন্যান্য রাজ্যেও অনুসৃত হয়।

নামমাত্র সাংগঠনিক বল নিয়ে বিগত দশ বছর ধরে যিনি তামিলনাড়ুর অবিসংবাদী নেতা হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন, তাঁর মৃত্যুতে শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতেই যে একটা অপূরণীয় শূন্যের সৃষ্টি হবে তাই নয়, সমগ্র ভারতে এর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা সম্পর্কিত ভারতীয় নীতির উপর এর প্রভাব ব্যাপক হবে বলেই পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

প্রচুর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এম জি আর মানুষ হয়েছেন। ১৭ জানুয়ারি ১৯১৭ সালে তিনি শ্রীলংকার ক্যাণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোপাল কৃষ্ণাণ ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেবেলাতেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং সহায়সম্বলহীন পরিবারের সামনে দেখা দেয় প্রবল অর্থ সংকট। রুজি-রুটির সমস্যা চরমে ওঠে। তখন তাঁর মা সত্যভামা দেবী তাঁকে এবং তাঁর বড় ভাই এম জি চক্রপাণিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে চলে আসেন। এরপর কিছুদিন কেরলে কাটানোর পর তাঁরা তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনম গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। পরিবারের কোনরকম আর্থিক আয় না থাকায় দুই ভাইকে ওই অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছেড়ে একটি নাটক কোম্পানীতে নাম লেখাতে হয়।

এম জি আর চিত্রজগতে প্রবেশ করেন ১৯৩৫ সালে। জেমিনী ফিল্মস–এর 'সতী লীলাবতী'তে তিনি একটি ছোটখাট ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ পান। এরপর প্রায় দশ বছর তিনি এরকমই বিভিন্ন ছোটখাট চরিত্রে কাজ করতে থাকেন। মুখ্য চরিত্রে 'রাজকুমারী' ছবিতে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে তামিল চিত্রজগতে স্টার হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর অভিনীত একের পর এক ছবি অর্থনৈতিক ভাবে সফল হয় এবং তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। বিশেষ করে গরীব তামিল জনগণের কাছে তাঁর অভিনীত ছবিগুলি প্রচুর সমাদর লাভ করে। 'ঋছকরণ' ছবিতে কাজ করার জন্য তাঁকে ভারত সরকার 'ভারত' পুরস্কারে ভূষিত করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ করেও এম জি আর তৎক্ষনাৎ চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেন নি।

জয়ললিতা, যেহেতু স্ত্রী নন?

কাজ করার সুযোগ আসে ১৯৪৫ সালে। সে বছরই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি অভিনয় ছেড়ে দেবেন না। বস্তুত, ১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মদুরেমীতা সুন্দর পান্তিবন'ই এম· জি আর অভিনীত শেষ ছবি। সর্বসাকল্যে তিনি ১৩৬টি ছবিতে অভিনয় করেন।

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত এম·জি·আর–এর রাজনৈতিক জীবন প্রায় ত্রিশ বছর দীর্ঘ। চিত্রজগতের মাধ্যমেই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেই সময় তামিলনাড়ুতে 'দ্রাবিড়' আন্দোলন ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সি এন আন্নাদুরাই তাঁকে এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯৪২ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম'–এ যোগ দেন।

১৯৬৩ সালে তিনি তামিলনাড়ু বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু দু'বছর পরই তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহী নন–এবং বিধান পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। অবশ্য ১৯৫৯ এবং ১৯৬২–র বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নিজের দলের হয়ে জোরদার প্রচারাভিযান চালান। ১৯৬৭ সাল এম জি আর এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগাম দুইয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বছরেই এম জি আর দ্বিতীয় জীবন লাভ করেন এবং মুন্নেত্র কাজাগাম ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ডি এম কে ক্ষমতা লাভের পেছনেও ছিলেন এম জি আর। ঘটনাটি ছিল এইরকম–এম জি আর–এর ছবিতে খলনায়ক হিসেবে কাজ করতেন জনৈক এম আর রাধাকৃষ্ণ। তিনি হঠাৎ এম জি আর–এর ঘাড়ে গুলি করে বসেন। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নির্বাচনে ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ সহ এম জি আর–এর ছবি

৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

উত্তরবঙ্গে শংকরদেব মন্দির কি উগ্রপন্থার কেন্দ্র হতে চলেছে ?
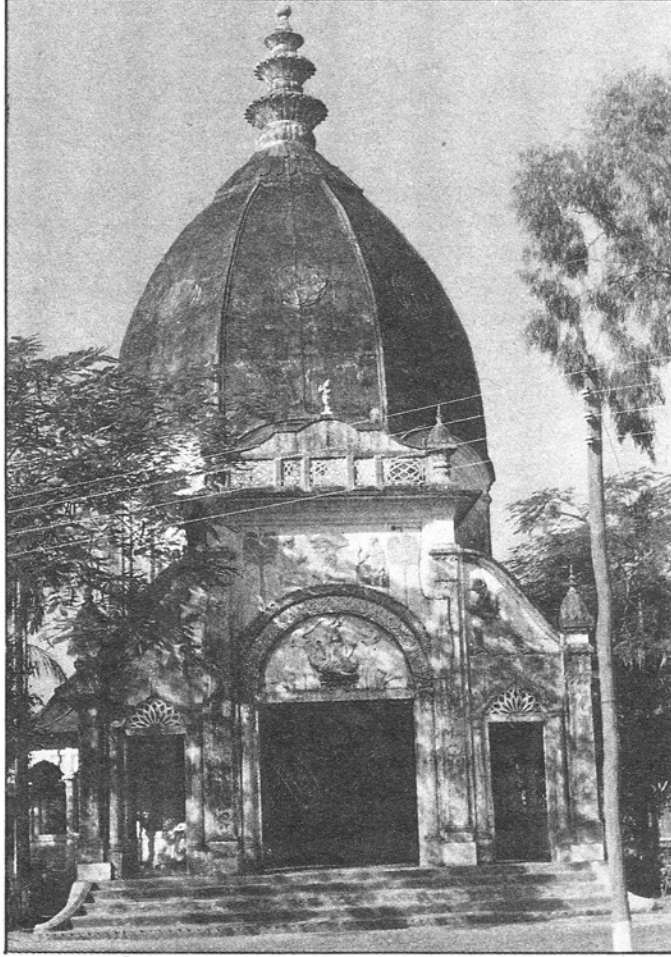
শংকরদেব মন্দির

আসাম-বাংলার ধর্মসংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র মধুপুরের শংকরদেব মন্দির ঘিরে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের জঙ্গী কর্মীরা ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছেন। আসামের মন্ত্রীরা কেন বারবার মন্দির ঘুরে যান। প্রফুল্ল মহন্ত শংকরদেব মন্দিরে এসেছিলেন কেন? তবে কি অ গ প-উত্তরখণ্ডী আঁতাতের এটাই পীঠস্থান। উত্তরখণ্ডীদের জঙ্গী আন্দোলনের হুমকি কি এই মন্দিরকে স্বর্ণমন্দিরে রূপান্তর করবে? তামাম উত্তরবঙ্গের বিতর্কিত মন্দিরের প্রেক্ষাপট নিয়ে সরজমিন প্রতিবেদন।

৫ জুলাই '৮৭ তারিখে আসাম থেকে উড়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত যখন মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোয় মধুপুর ধামে প্রস্তর ফলক উন্মুক্ত করে ধামের উন্নতি কল্পে একলক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন মন্দির প্রাঙ্গণে উচ্ছসিত ভক্তের উপচানো ভীড়। শিল্পীর কণ্ঠে উদাত্ত ভাষণ। বাতাসে ধূপের পবিত্র গন্ধ।

সেদিন মধুপুরে ফুলে আর শাঁখের আওয়াজে যখন সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মীয় বাতাবরণ, মধুপুরের বাইরে ঠিক সেই মুহূর্তেই বঙ্গজ বুদ্ধিজীবীদের মগজে কিছু জিজ্ঞাসাবোধক, কিছু বিস্ময়সূচক চিহ্ন। কারণ, ওই দিনটি উত্তরবঙ্গের স্নায়বিক বিকার বিচ্ছিন্নতাকামী 'উত্তরখণ্ড' দলের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে চিহ্নিত তাই সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হতে থাকল সচেতন ঈশান কোণে। ক্রমশ কানাকানি কলরবে পরিণত হল বারক্লাবে, কফি হাউসে, জনপদে, সর্বত্র। শুধু তাই নয়, মহন্তর মধুপুর ধাম পরিদশন উত্তরখণ্ডীদের সাথে তাঁর কূটচক্রান্তের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যাত হল পত্র পত্রিকাতেও।

মধুপুর ধামে উত্তরখণ্ডীদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মজুত করার সন্দেহ শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়। প্রশাসনও বেশ কয়েকবার পুলিশি তদন্ত চালিয়েছে বলে মধুপুর ধামের সত্তাধিকারী ফটিক হাজারিকা জানিয়েছেন। মধুপুর ধামে উত্তরখণ্ডীদের আগ্নেয়াস্ত্রে মজুত এবং আসামে সরকারের গোপন সহযোগিতার সন্দেহের প্রখরতা আপাতত কিছুটা থিতিয়ে গেছে। কিন্তু সংশয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ছায়াঘেরা সবুজ জনপদে।

বৈষ্ণবতীর্থ মধুপুর নিয়ে কেন এই আতংক? প্রফুল্ল মোহন্তর প্রকৃত ভূমিকাই কি? এসব প্রশ্নে আসার আগে ধামের ইতিহাস একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ১০১ পৃষ্ঠায় দেখুন

৬২ পৃষ্ঠার পর

পরও কেন আবার শিলঘাটে নয়া রাজধানী গড়ে তোলার ব্যাপারে অ গ প সরকারের নেতৃবর্গ সচেষ্ট সে বিষয়ে জোরদার প্রশ্ন উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ—প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার সময় থেকে আজ অবদি কংগ্রেস এবং অ গ প উভয় রাজ্য সরকারই দিসপুর থেকে প্রশাসন চালিয়েছেন। অথচ অ গ প সরকার আচমকা রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কেন? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে।

অভিযোগকারীরা শুধু মাত্র অ গ প সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক স্বার্থ কায়েমের প্রচেষ্টাকেই নিন্দা করেন নি, জনগণের সামনে তাঁরা অ গ প সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন রাজ্য সরকার কিভাবে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন। তাঁদের অভিযোগ আসামে বিদেশি চিহ্নিতকরণ এবং

COMMITTEE FOR SELECTION OF SITE FOR PERMANENT CAPITAL OF ASSAM.

Shri Prafulla Kumar Mahanta,
Hon.Chief Minister of Assam,
Dispur.

SELECTION FOR THE PERMANENT CAPITAL OF ASSAM
– SUBMISSION OF FINAL REPORT.

We invite your kind reference to Government Notification No. CAG(A)309/86/16 of 20th January, 1987 by which a Committee was constituted to recommend a suitable site for the permanent capital of Assam.

The Committee had submitted its Interim Report to Government on 30th March, 1987, recommending Silghat as the only site suitable for locating the Capital of Assam, out of the three alternatives mentioned in the Govt. Notification. We now take pleasure in presenting to you our Final Report. The Committee had desired to complete this Report much earlier, but it could not do so for reasons beyond its control.

It is our earnest hope that the recommendations made this Final Report would be acceptable to Government.

Thanking you.

Yours faithfully,
for & on behalf
of the Committee,

(AJIT KR. SARMA)
CHAIRMAN.

অজিত শর্মার রিপোর্ট

বিতাড়ন প্রভৃতি বেশ কিছু জরুরি ও স্পর্শকাতর বিষয়ে রাজ্য সরকার নিজস্ব অসফলতার উপর থেকে আসামের জনগণের রোষ দৃষ্টি সরিয়ে ফেলতেই পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই নয়া রাজধানী স্থাপনে উদ্যোগী হচ্ছেন। কামরূপ জেলা থেকে সরিয়ে প্রস্তাবিত রাজধানী নওগাঁ জেলার শিলঘাটে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে তাঁরা অভিযোগ তোলেন—গৌহাটি এবং সন্নিকট-বর্তী বর্তমান রাজধানী দিসপুর আজও ঐতিহ্যগতভাবে আসামের প্রশাসন, রাজনীতি, ব্যবসায় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র। পরিবহন এবং যোগাযোগের দিক দিয়েও গৌহাটি ও তৎসংলগ্ন দিসপুরের গুরুত্ব শিলঘাটের তুলনায় অনেক বেশি। রাজ্য সরকারের এই ঝটিতি সিদ্ধান্তে শিলঘাটে নতুন রাজধানী স্থাপিত হলে গৌহাটি এবং দিসপুর তার গুরুত্ব হারাবে। শুধু তাই নয়, উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলে চিহ্নিত এই গৌহাটির ঐতিহ্যগত গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অবস্থানগত অঙ্গচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল।

এদিকে আসুর শাখা সংগঠন আকডসুর প্রকাশ্য প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আসামের অ গ প মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত শিলঘাটেই নয়া রাজধানী স্থাপনের জন্য কেন জোরদার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সে কারণটিও এখন জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী কোলিয়াবারের যে আসনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তা প্রস্তাবিত নয়া রাজধানীর অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী। বাস্তবে যদি রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটি রূপায়িত হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে একটি বিপুল জনসমর্থন লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অন্যদিকে কামরূপের বিধানসভা সদস্যরা তাঁদের সমর্থক-

অসম ও তার নয়া রাজধানী

দের বৃহৎ একাংশকে হারাবেন বলে গভীর আশংকা বোধ করছেন। তাঁদের মতে স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কার উদ্রেক হয়েছে, গৌহাটি থেকে দিসপুরে রাজধানী স্থানান্তরের সময় কংগ্রেস যেমন বিপুল সংখ্যক জনসমর্থন হারিয়েছিল, তাঁদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক মহলের ধারণা সেই আশংকার বশবর্তী হয়েই কামরূপ জেলার কিছু অ গ প বিধানসভা সদস্য আকডসুর প্রত্যক্ষ বিক্ষোভের পেছনে সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে সামিল হয়েছেন।

আসাম থেকে শিলংকে বিচ্ছিন্ন করার পর অস্থায়ী রাজধানী হয় গৌহাটিতে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন গৌহাটি থেকে রাজধানী স্থানান্তর করা হয় দিসপুরে। দিসপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও শইকিয়া আসামের একটি পাকাপোক্ত এবং পরিকল্পিত নতুন রাজধানী চাইছিলেন। আর সেই ইচ্ছাপূরণকল্পে তিনি ১৯৭৬ সালে রাজস্থান সরকারের প্রধান নগর পরিকল্পক এবং স্থাপত্য নির্মাণ উপদেষ্টা বি কামবোর নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটি আসামের পাঁচটি বিশেষ স্থানের মূল্যায়নের শেষে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে শিলঘাটে নতুন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে শিলঘাট সম্পর্কে বলা হয়, অবস্থানগত দিক দিয়ে শিলঘাটের গুরুত্ব অনেকখানি, এখানে রাজধানী হলে প্রয়োজনীয় বাড়ি গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে, সরকারী কর্মীদের আবাসন এবং জলের সমস্যাও হবে না। শুধুমাত্র শিলঘাট ও আপার

রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কামরূপে আসু-র একাংশের ধর্মঘট

আসামের রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিষয়েই তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেন। ১৯৮০ সালেও শিলঘাটে রাজধানী স্থাপন নিয়ে মন্ত্রী মণ্ডলীর মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে, কিন্তু স্থির কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। ১৯৮৩ সালে এইচ কে মেওয়াদা গৌহাটির পরিবর্তে চন্দ্রপুরকে রাজধানী করতে প্রস্তাব দেন। অবস্থানগত বৈশিষ্ঠ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের কারণে এ প্রস্তাব খারিজ করা হয়। ওই বছরের শেষাশেষি আসামের মধ্যবর্তী কোন জায়গাকে রাজধানী হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রয়াস চালানো হয়। ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়াকে একটি নকশা তৈরি করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কোরিয়া চন্দ্রপুরের অঞ্চলটিকে রাজধানী হবার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস সরকার তবু চন্দ্রপুরেই রাজধানী গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে দৃঢ়সংকল্প থাকেন। হিতেশ্বর শইকিয়া এ নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নি। আসামে কংগ্রেস সরকার পতনের পর দায়িত্ব ভার আসে গণ পরিষদের উপর।

হিতেশ্বর শইকিয়ার আমল থেকে প্রফুল্ল মহন্তর শাসনকাল পর্যন্ত মাঝে মাঝেই রাজধানী স্থানান্তরের প্রসঙ্গ উঠলেও জনসাধারণ কিংবা

আকুড়সু নেতা পার্থপ্রতিম ভরালি

কোন রাজনৈতিক দল এ নিয়ে এত মাথা ঘামায় নি। কিন্তু গত ১৮ অকটোবর মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত কামরূপ জেলার দিসপুর থেকে সরিয়ে নওগাঁ জেলার শিলঘাটে নতুন রাজধানী স্থাপন সংক্রান্ত শর্মা কমিশনের সুপারিশটি বিধানসভায় দাখিল করতেই অবস্থা চরমে পৌঁছয়। সভার মধ্যেই সি পি আই এম এল এ নন্দেশ্বর তালুকদার এটির প্রতিবাদ জানান। অসম গণ পরিষদের নেতা ও রাজ্যের আইন মন্ত্রী সুরেন বেধিও সভার মধ্যে বিক্ষোভ জানান।

আসাম যুব কংগ্রেস (ই) সভাপতি আবদুল মজিদ

যে কোন রাজ্য সরকারই একটি পুরনো রাজধানীর উন্নয়ন সাধনের চেয়ে নতুন কোন রাজধানী গড়ে তোলার ব্যাপারে বেশি উৎসাহী হয়। স্বাভাবিক কারণেই অসম গণপরিষদও ক্ষমতায় আসার পর নতুন রাজধানী স্থাপনের উপর বেশি জোর দেয়।

পরদিনই আকড়সু সারা আসামে বন্ধের ডাক দেয় এবং অ গ প সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। কামরূপ জেলার বিক্ষুব্ধ কিছু বিধানসভা সদস্য এই সিদ্ধান্তের পরোক্ষ বিরোধিতা করে আসুর শাখা সংগঠন আকড়সুকে সমর্থন জানায়। এক কথায় এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অ গ প সরকারের বিরুদ্ধে একটি জোরাল জনমত গড়ে তোলা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোন রাজ্য সরকারই একটি পুরনো রাজধানীর উন্নয়ন সাধনের চেয়ে নতুন কোন রাজধানী গড়ে তোলার ব্যাপারে বেশি উৎসাহী হয়। স্বাভাবিক কারণেই অসম গণ-পরিষদও ক্ষমতায় আসার পর নতুন রাজধানী স্থাপনের উপর বেশি জোর দেয়। সেই মত অয়েল ইন্ডিয়ার প্রাক্তন একজিকিউটিভ এ কে শর্মার নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা হয়। দশ মাসের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সুপারিশ পত্র পেশ করেন। সুপ্যারিশ পত্রে নওগাঁ জেলার শিলঘাটই নতুন রাজধানী স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হবে বলে প্রস্তাব করা হয়। শর্মা কমিটির সুপারিশটি বিধানসভায় পেশ করা নিয়েই সমূহ বিতর্কের সূচনা। এ কে ডি এস ইউ নেতৃবৃন্দ সোচ্চার অভিযোগ তোলেন—স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবে মুখ্যমন্ত্রী শিলঘাটে রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সবচাইতে বড় কথা রিপোর্টটি বিধানসভায় পেশ করার আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে ক্যাবিনেট পর্যায়ে কোনরকম আলোচনাই করেন নি। পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী নয়া রাজধানী স্থাপনের এই ঝটতি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। বিক্ষোভকারীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে এখন নয়া রাজধানীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টালমাটাল পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসু-র দেওয়াল-লিখন

এদিকে অসম গণ পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে—শিলঘাট থেকে বিমানবন্দর তেজপুরের দূরত্ব মাত্র ২১ কিমি এবং সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রের উপর দ্বিতীয় সেতু সম্পন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া কাজিরাঙার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্যের দাক্ষিণ্যে শিলঘাটের পর্যটন মূল্যও বেড়ে যাবে। বিপক্ষের তোলা রাজ্যসরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ কায়েমের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিবৃতিতে একথাও বলা হয়েছে—শিলঘাটে নয়া রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা এই নতুন নয়, ১৯৭৬ সালেও কংগ্রেস রাজ্য সরকার এখানে রাজধানী স্থাপন বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। শিলঘাটের উপযুক্ততা নিয়ে ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়—কাঠামোগত এবং সুরক্ষাগত দিক দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরও শিলঘাটকে অধিক পছন্দ করবেন।

প্রথমত কোন কথা না বলতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত রাজধানী বিতর্ক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত আলোকপাতের প্রতিনিধিকে পুরো ৪৮ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে বলেন, '—আমাদের বিরুদ্ধে এরকম অপ্রত্যাশিত অভিযোগ অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। আমার আসনে নির্বাচনের সাফল্য আশা করেই যদি রাজধানী স্থাপনের কথা ভাবতাম তাহলে কোন কমিটি গঠনের প্রয়োজন ছিল না। শর্মা কমিটির কাছে চন্দ্রপুর, শিলঘাট ও বেটকুচি (গৌহাটির সন্নিকটবর্তী)—এই তিনটি জায়গা মূল্যায়নের জন্য জানানো হয়। ওঁরা শিলঘাটকে যদি রাজধানী হিসেবে উপযুক্ত বলে রিপোর্ট দেন সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কায়েমের প্রশ্নই বা আসে কোথা থেকে? আর এ কথাও সত্যি, কোন কাজের উদ্যোগ নেওয়ার সময় তার বিরোধিতা করা এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলঘাটে রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবার পরও এঁরা সকলেই সবরকম সুযোগ ভোগ করবেন, আবার সমালোচনাও করবেন। গণতন্ত্রে নাগরিকের বাক স্বাধীনতা আছে, বক্তব্য ওঁরা রাখতেই পারেন, আর কারও মুখ বন্ধ করা আমাদের কাজ নয়। আসুর শাখা সংগঠন আকডসুর বিরোধিতার প্রশ্নে প্রফুল্ল মহন্ত মন্তব্য করেন—শুধুমাত্র আকডসুই বিরোধিতা করছেন তা নয়, আমাদের কাছে খবর আছে এর পেছনে অনেকেই মদত দিচ্ছেন, ঘটনাটি যাইই হোক না কেন, আমাদের কাছে তা নিশ্চিতভাবেই দুর্ভাগ্যজনক।'

পূর্তমন্ত্রী অতুল বরাকে স্থায়ী রাজধানী নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শ্রী বরা বলেন, 'যে কোন রাজ্য সরকারই স্থায়ী রাজধানীর ব্যাপারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উদ্যোগী হবেন। সেক্ষেত্রে শিলঘাটে রাজধানী স্থাপন ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আগ্রহ মোটেই অযৌক্তিক নয়। আর আর্থিক প্রশ্ন বিষয়ে বলতে গেলে একথা তো স্বীকার করে নিতেই হবে যে বর্তমান ব্যয় বাহুল্যের সময়ে নতুন রাজধানী স্থাপনে একটি মোটা অংকের অর্থব্যয় আছে। কিন্তু অন্যান্য দপ্তরের ব্যয় সংকোচ করেই নতুন রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে জনসাধারণ এমন কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল করা হবে। জনগণের স্বার্থক্ষুণ্ণ হবে রাজ্য সরকার এমন কোন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই নিচ্ছেন না। বাস্তবিক পক্ষে দিসপুরে রাজধানীর প্রয়োজনীয় স্থানসংকুলানও ঘটছে না। অভিযোগকারীরা অনর্থক অপচয়ের প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু ওঁরা স্থায়ী রাজধানীর গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন না।'

স্থায়ী রাজধানী স্থাপন নিয়ে যে যে কমিটি কাজ করেছেন

কোন সালে?	নেতৃত্ব দেন কে?	দাখিল করা রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার
১৯৭০–৭১	**এস·কে· মল্লিক** (আই·এ·এস· অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অব আসাম)	এই কমিটি কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছননি। তাঁরা শুধু নিম্নোক্ত স্থলগুলির সুবিধে অসুবিধে নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন: ক৷ আমচাং–পানিখাইতি–চন্দ্রপুর খ৷ সোনাইখুলি (সংলগ্ন বৌকুচি অঞ্চল সহ) গ৷ সোনাপুর–ডিগারু ঘ৷ শিলঘাট।
১৯৭৩–৭৬	**বি·ডি· কামবো** (চিফ টাউন প্ল্যানার এণ্ড আর্কিটেকটচ্যারাল অ্যাডভাইসার, রাজস্থান গভর্নমেন্ট)	ভৌগোলিক অবস্থান, স্থান সংকুলান প্রভৃতি দিক দিয়ে শিলঘাটকে নতুন রাজধানীর উপযুক্ত বলে সুপারিশ করেন।
১৯৮০	**এন·জে· কামাথ** (সেক্রেটারি টু গভ: অব ইণ্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অব ওয়ার্কস এণ্ড হাউসিং)	চন্দ্রপুরকে রাজধানী হিসেবে অনুপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
১৯৮৩	**এইচ·কে· মেওয়াদা** (রিটায়ার্ড চিফ টাউন প্ল্যানার এণ্ড আর্কিটেকট, গভ: অব গুজরাট)	চন্দ্রপুরকে রাজধানী করার সুপারিশ করা হয়।
১৯৮৪	**সি·এম·কোরিয়া** (আর্কিটেক্ট অব বোম্বে)	অপ্রশস্ত অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল হবার দরুন চন্দ্রপুরকে রাজধানী হবার অনুপযুক্ত বলে সুপারিশ করা হয়।
১৯৮৭	**অজিত কুমার শর্মা** (রিটায়ার্ড চিফ রেসিডেন্ট একজিকিউটিভ, অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড)	শিলঘাটকে রাজধানী করার সুপারিশ করা হয় রিপোর্টে।

আসাম যুব কংগ্রেস (ই) সভাপতি আবদুল মজিদ, গৌহাটি জেলা কংগ্রেস (ই) সভাপতি ফণী শর্মা শিলঘাটে স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করার ব্যাপারে সরাসরি বিরোধিতা না করলেও, তাঁরা বলেন—রাজ্য সরকার তুঘলকী কেতায় নয়া রাজধানী স্থাপন নিয়ে মাতোয়ারা আছেন। স্থায়ী রাজধানীর প্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসাবে শর্মা কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করতেই খরচ হবে প্রায় ৬৩০ কোটি টাকা। এই ব্যয় অবশ্যই রাজ্যের আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে। দিসপুরেই রাজধানী রেখে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন করে রাজ্য সরকার অনায়াসেই প্রশাসনিক কাজ কর্ম চালিয়ে নিতে পারতেন। একথাও তো ঠিক শিলঘাটের চেয়ে গৌহাটি–দিসপুর ঐতিহ্য–সংস্কৃতি ও অবস্থানগত দিক দিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপর্ণ।

এক কথায় রাজধানী বিতর্ক নিয়ে আসামের মাটি এখন উত্তপ্ত। মন্ত্রী মণ্ডলীকে এ বিষয়ে কোনরকম বিবৃতি না দেওয়ার সরকারি নির্দেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অসম গণ পরিষদের বেশ কিছু সদস্য এখন ক্ষুব্ধ। আপার আসাম লোয়ার আসাম বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে অ গ প–রই কামরূপের বেশ কিছু বিধানসভা সদস্যের আশংকাই রাজধানী বিতর্ককে জোরালো করে তুলেছেন; অবস্থা কোন দিকে গড়ায় এখন তারই প্রতীক্ষা।

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

ধর্ষিতা মেয়েরা কোথায় যাবে ?

অর্চনা মণ্ডল, মালা চক্রবর্তী আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে ছবি: সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার আদালতগুলিতে নিরপরাধ বন্দিনী-মুক্তি পর্বে জানা গেছে চাঞ্চল্যকর কিছু নারী-নির্যাতন উপাখ্যান। সেই নির্যাতনের নিরিখে জেগে উঠেছে এক জ্বলন্ত প্রশ্ন, ধর্ষিতা মেয়েরা কোথায় যাবে? বর্ধমানের জোৎস্না, হাওড়ার কমলা, ২৪ পরগণার গঙ্গাঁ, বিষ্ণুপুরের অর্চনা, ক্যানিং–এর মালতী, তিলজলার রীতা, বারুইপুরের শিপ্রা, কাটোয়ার মালা চক্রবর্তীদের মত শত শত নিরপরাধ ধর্ষিতারা কোথায় আশ্রয় পাবে? কেন এদের মা বুকে পাথর চেপে মেয়েকে তাড়িয়ে দেন? মেয়েদের উদ্ধার আশ্রম 'লিলুয়া হোম' নিয়েও এত অভিযোগ কেন? রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি? নারী-নির্যাতনের অকথিত পট উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রঞ্জিত রায়।

আজ থেকে চার বছর আগের ঘটনা। জানুয়ারি মাস। ঘন কুয়াশায় ঢাকা, শীতার্ত এক সকাল। দক্ষিণ কলকাতায় অভিজাত পল্লী রিজেন্ট পার্কে তখনও কর্মব্যস্ততা শুরু হয় নি। স্বাস্থ্যান্বেষী কিছু মানুষ শুধু সেই কুয়াশা জড়ানো কাকভোরে মরনিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। তাঁদেরই কয়েক-জনের চোখে পড়েছিল সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী বছর উনিশ-কুড়ির একটি মেয়ে খোলা ফুটপাথে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। পরনের শাড়ি এবং শরীরের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যুবতীটি নারীমাংসলোভী পশুদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।

স্বাস্থ্যান্বেষীদের মধ্যে স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দলের একজন কর্মী ছিলেন। মধ্য বয়সী এই ভদ্রলোক সবার আগে এগিয়ে এসে যুবতীটিকে ফুটপাথ থেকে রিক্সায় তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। পরে ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর পরিচর্যায় কিছুটা সুস্থ হয়ে ধর্ষিতা মেয়েটি তার করুণ কাহিনী বলে। নাম, গঙ্গা দলুই। বয়স উনিশ। বাড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপে। হত দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বাপ মা অর্থের অভাবে পাত্রস্থ করতে পারে নি। গঙ্গা তার পরিবারে এক বোঝা মাত্র। তার এই অন্ধকার দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনে যখন বেঁচে থাকাই একটা সমস্যা ঠিক তখনই তার গ্রামের একটি মেয়ে তাকে আশার আলো দেখায়। মেয়েটি গ্রামের আর পাঁচজনের সঙ্গে চালের বস্তা নিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি বাড়ি চাল বিক্রি করে উপার্জন করে। শহরের এই এলাকার ধনী পরিবারের মানুষজন সরকারি রেশনের নিকৃষ্ট মানের চাল কেনেন না। রিচি রোডের এমনি একটি পরিবার গঙ্গার বান্ধবীকে বলে রেখেছিল কাজের একটি মেয়ে খুঁজে দিতে। আপাত-দৃষ্টিতে শিক্ষিত পরিবার। বাড়ির মালিক সত্তর বছরের বৃদ্ধ ডাক্তার। একটি মাত্র ছেলে। সেনাবাহিনীতে বড় অফিসার। পুত্রবধূ একটি নামকরা আধা বিদেশী সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে জুনিয়ার অফিসার। স্বচ্ছল অবস্থা। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই কাজে বেরিয়ে যান। তাই বৃদ্ধ, অসুস্থ বাবাকে দেখাশুনা করার জন্য একটি অভাবী পরিবারের মেয়ে পরিচারিকা চাই।

গঙ্গাকে দেখা মাত্রই পরিবারের সকলের পছন্দ হয়ে গেল। দু'বেলা পেটপুরে খেতে না পেলেও গ্রামের খোলা মুক্ত আবহাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য ভালই। একটা গ্রাম্য সরলতার আলগা চটক আছে। নতুন আশ্রয়ে প্রথম মাসটা ভালই কাটলো। তারপরই বিপর্যয়। বাড়ির কর্ত্রী গঙ্গার উপর স্বামী শ্বশুরকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে কয়েকদিনের জন্যে বাপের বাড়ি গেলেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রথম রাতেই কর্ণেল সাহেব গঙ্গাকে ধর্ষণ করে। এখানেই শেষ নয়। ভদ্রলোক যৌন বিকারগ্রস্থ স্যাডিস্ট। পরপর তিনরাত জঘন্য পাশবিক যৌন অত্যাচারের পর মরিয়া গঙ্গা ভোররাতে বাড়ি থেকে পালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য গঙ্গার, সে কলকাতার পথঘাট কিছুই চেনে না। বহু পথ ঘোরাঘুরি করে কালিঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে ফুটপাথে জ্ঞান হারায়।

এর পরের ঘটনাগুলি খুবই দ্রুত ঘটে যায়। রাজনৈতিক নেতার গৃহে আশ্রয়। থানায় অভিযোগ (রিজেন্ট পার্ক থানা, কেস নং ১৬ (৫) ৮৪)। কর্ণেল সাহেব গ্রেপ্তার। পরে জামিনে খালাস। কিন্তু দুর্ভাগ্য যার পিছু নিয়েছে শান্তি সে পাবে কোথায়? গঙ্গার রূপ যৌবনই তার বড় শত্রু। একদিন নির্জন দুপুরে স্ত্রী যখন অফিসে, বেকার রাজনৈতিক নেতা গঙ্গাকে ধর্ষণ করলো। গঙ্গা এখন কি করবে! যাকে সে নিজের দাদার মত ভক্তি করেছিল, যাকে তার দুর্ভাগ্যের আর অত্যাচারের অন্ধকারে পরিত্রাতা বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল তার চোখেও আদিম কামনার আগুন দেখে গঙ্গা সমাজের উপর বিশ্বাস হারালো। সে আবার পালালো।

এবার কসবা এলাকা। গঙ্গাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে এক রিক্সাওয়ালা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসে। আশ্বাস দিয়ে বলে, কাকদ্বীপে তার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। তারপর নাইট-শো সিনেমা। সেখান থেকে রিক্সাওয়ালার ঝুপড়ি। আবার ধর্ষণ। ভোররাত্রে পলায়ন। বাসে উঠে গ্রামে ফেরার চেষ্টা। টিকিট কাটতে না পারায় সন্তোষপুরের কাছে বাস থেকে কণ্ডাকটরের নামিয়ে দেওয়া, সবই ঘটে দ্রুতগতিতে। সঙ্গে একটি পয়সা নেই। খিদেয় পেট জ্বলছে। ঠিক এইরকম একটা অবস্থায় চারজন স্থানীয় সমাজবিরোধী যুবকের খপ্পরে পড়ে গঙ্গা। তারা একটি ফাঁকা পোড়ো বাড়িতে তাকে বন্দিনী রেখে সারা রাত ধরে গণধর্ষণ চালায়। পরের দিন পাড়ার লোক অচৈতন্য গঙ্গাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে সে চার মাস্তানের নাম বলে। সেইদিনই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং গঙ্গাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল এবং পরে লিলুয়া সরকারি উদ্ধার আশ্রমে পাঠানো হয়। বলাবাহুল্য, প্রমাণাভাবে দুষ্কৃতকারীরা সকলেই ছাড়া পায়। কিন্তু গঙ্গার বন্দিনীদশা ঘোচে না। আমাদের রক্ষণশীল সমাজে সে অস্পৃশ্যা। গঙ্গার সামনে আজ অপেক্ষা করছে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ।

গঙ্গা একা নয়। তারই মত শত শত অভাগিনী তরুণী বিনা অপরাধে বন্দিনী আছে জেলে। যারা ফৌজদারী দণ্ড বিধির কোন ধারায় অপরাধী নয়। যারা ঈশ্বরের আদালতে নিরপরাধ। ফুলের মত পবিত্র। সুন্দর। কিন্তু মানুষের সমাজে অপবিত্র। অচ্ছুৎ। কারণ তারা পাশবিক অত্যাচারের বলি। নরপশুদের কামনার শিকার। এরা কোথায় যাবে? এইসব তরুণীরা প্রায় সকলেই দরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আভি-জাত্যের অহংকার, শিক্ষার শক্তি, বন্ধু, পথপ্রদর্শক কিছুই নেই তাদের। এরা কি চিরকাল আশ্রয়ের নামে সরকারি উদ্ধার-আশ্রমের অন্ধকূপে তিলতিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে?

সরকারি উদ্ধার আশ্রমগুলি কি এইসব হতভাগিনী তরুণীদের যথার্থ আশ্রয়স্থল? অন্তত সেখানের বাসিন্দা অসহায়া মহিলাদের অভিজ্ঞতা অন্য। শিপ্রা ঘোষ। বয়স কুড়ি-একুশ। দীর্ঘকাল মহিলাদের জন্য লিলুয়ায় সরকারি উদ্ধার আশ্রমে বাসিন্দা। আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় সে এক সংক্ষিপ্ত আবেদনপত্র পাঠায় আলিপুর জেলা জজের আদালতে। আবেদনপত্রটি গোপনে নিয়ে যায় তাঁরই মত অসহায়া এক নারী। তার পাশবিক অত্যাচারের অপরাধের বিচার চলছিল তখন আলিপুর জেলা আদালতে। গোপনে এই আবেদনপত্রটি সে তরুণ আইনজীবী শিবশংকর চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেয়। সতের আঠারো লাইনের এই ছোট্ট আবেদনপত্রের কালো আঁকাবাঁকা অক্ষরে অক্ষরে লুকিয়ে আছে লিলুয়া উদ্ধার আশ্রমের করুণ জীবনযাত্রার আর্তি। শিপ্রা লিখেছে যে সে গত দু'তিন বছর এই সরকারি উদ্ধার আশ্রমের বন্দিনী। এখানের পরিবেশ তার ভাল লাগে না। এখানে থাকাও খুব বিপজ্জনক। শিপ্রার কথায়, 'আমাকে অপমানজনক কথা বলে। সে সব কথা মুখে আনা যায় না। এর চেয়ে আগের প্রেসিডেন্সী জেল অনেক ভাল ছিল।' শিপ্রা তার এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল।

কিন্তু কে এই শিপ্রা? কেনই বা সে উদ্ধার আশ্রমের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দিনী? শিপ্রার খবর জানতে গেলে আমাদের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বারুইপুর এলাকায় যেতে হবে। এখানেরই এক বনেদী রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। স্থানীয় স্কুলে যাতায়াতের পথে জনৈক সুদর্শন মুসলিম যুবকের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রেম। আর এই প্রেমের পরিণতিতে একদিন শিপ্রা সেই যুবকের হাত ধরে ঘর ছাড়লো। বয়স তখন তার চৌদ্দ কি পনের। নিরুদ্দেশ শিপ্রার সন্ধানে তার দাদা বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পিতৃহীন শিপ্রার বাড়িতে বড় দাদাই অভিভাবক। শিপ্রার সঙ্গে মুসলিম যুবকটির অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারটি তাঁর জানা ছিল। সেই যুবকটিই যে তাঁর বোনকে ফুসলে নিয়ে গেছে এই সন্দেহের কথাও তিনি পুলিশকে জানান। শিপ্রা আর তার প্রেমিকের ধরা পড়তে দেরী হয় না। নাবালিকাকে ফুসলানো এবং ধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিক যুবকটিকে আলিপুর জেলা আদালতে সোর্পদ্দ করা হয়। আর ধর্ষিতা কিশোরী শিপ্রাকে পাঠানো হয় প্রেসিডেন্সী জেলের তথাকথিত 'সেফ কাস্টডি'তে। মাসের পর মাস বিচার চলার সময় শিপ্রা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় অস্বীকার করে যে তাকে অভিযুক্ত যুবকটি ফুসলে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায়। বাড়ির লোকজন, সরকারি আইনজীবীর রক্তচক্ষু কিছুই তাকে টলাতে পারে না। স্পষ্ট ভাষায় সে বলে যে সে স্বেচ্ছায় ভালবেসে যুবকটির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে এবং তাকেই সে স্বামী বলে জানে। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর বলাৎকার করা হয়েছে। সে স্বেচ্ছায় সহবাসে অগ্রসর হয়েছে। এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব তার একার।

শিপ্রার সাক্ষ্যের ফলে আদালতে মামলা দাঁড়ায় না। বিচারক যুবকটিকে খালাস করে দেন। কিন্তু শিপ্রা মুক্তি পায় না। তাকে মুক্তি দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট আদেশ না থাকায় সে প্রেসিডেন্সী জেলের অন্ধকার সেলে 'নিরপরাধ বন্দিনী' হিসাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর পচতে থাকে। পরে জেলে স্থানাভাবের কারণে তাকে অন্যান্য নিরপরাধ বন্দিনীদের সঙ্গে একদিন লিলুয়া সরকারি উদ্ধার আশ্রমে পাঠানো হয়।

শিপ্রার আবেদন হাতে পাবার পর তরুণ আইনজীবী শিবশংকর তার মুক্তির জন্য আলিপুর জেলা আদালতে আইনের লড়াই শুরু করেন। সেদিন এই আদর্শবাদী আইনজীবীর পাশে একটি দরদী মানুষও এসে দাঁড়ায় নি। ফি পাওয়া তো দূরের কথা। মামলার খরচও শিবশংকরকে নিজে বহন করতে হয়েছিল। আদালত শিপ্রাকে মুক্তির আদেশ দেয়। মুক্তি পেয়ে সে যাবে কোথায়? আমাদের রক্ষণশীল সমাজ ধর্ষিতা মেয়েদের ক্ষমা করে না। তারপর সে মেয়ে পাঁচবছর জেল খেটে এসেছে। হোক না সে নিরপরাধ। শিপ্রার জন্য তার বাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। যে দাদা তার বোনের উপর অত্যাচারের প্রতিকারে একদিন থানা আদালত এক করে দিয়েছিল আজ সেই বোনকে সে চিনতেও পারলো না। শিপ্রার পরিবারের চোখে সে মৃত। তার কোন অস্তিত্বই নেই।

শিপ্রা তারই মত যে হতভাগিনীর হাত দিয়ে লিলুয়া উদ্ধার আশ্রম থেকে

জ্যোৎস্না মিস্ত্রী

চিঠি পাঠিয়েছিল তার নাম জ্যোৎস্না মিস্ত্রি। জ্যোৎস্নার কথায় পরে আসছি। তার আগে আরেক নিরপরাধ বন্দিনীর কথা বলি। জ্যোৎস্না যাকে একইভাবে সাহায্য করেছিল লিলুয়ার উদ্ধার আশ্রমের অন্ধকার পংকিল জীবন থেকে মুক্ত হতে। তার নাম মালা চক্রবর্তী। বাবার নাম, অশোক চক্রবর্তী। বাড়ি বর্ধমান। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পরিচিত এক স্থানীয় পরিবারের যোগাযোগে তাকে মাত্র দশ বছর বয়সে কলকাতায় একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজে পাঠানো হয়। কয়েক মাস শান্তিতে কাটলেও শিশু মালার জীবনে হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে একদিন। হঠাৎ আলমারী থেকে বাড়ির গৃহিনীর সোনার হার চুরি হয়। কে এর জন্য দায়ী সে অনুসন্ধানে না গিয়ে বাড়ির কর্তা-গিন্নি অপরাধী সাব্যস্ত করলেন শিশুটিকে। হার আদায়ের জন্য চললো অকথ্য নির্যাতন প্রহার। খেতে না দিয়ে সারারাত অন্ধকার ঘরে আটক রাখা সব কিছু। বিপর্যস্ত, আতংকিত মালা প্রথম সুযোগেই বাড়ি থেকে পালালো। কিন্তু পালিয়ে সে যাবে কোথায়! গ্রামের মেয়ে। এই প্রথম কলকাতায় আসা। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে কয়েকজন পথচারী লেক থানায় জমা দেন মালাকে। সেখান থেকে প্রথমে বর্ধমান জেল পরে প্রেসিডেন্সী জেল ঘুরে লিলুয়া সরকারি উদ্ধার আশ্রমে।

মালা দীর্ঘ দশ বছর পর মুক্তির আবেদন জানিয়ে আদালতে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছিল তার আইনজীবীর মারফৎ তার কিছুটা আপনাদের শোনাচ্ছি। 'আমার বয়স আজ বাইশ বছর। আজ বারো বছর বন্দীদশায় দিন কাটছে। আমার কি বাইরের জগৎটা কেমন দেখতে ইচ্ছা করে না? আমি এখন লিলুয়া হোমে থাকি? এই হোমে থাকতে ভাল লাগে না। এখানে মারধোর খেতে হয়। এই হোমটা কত বাজে আমার জানাতে লজ্জা হচ্ছে। এখানে মা মাসীদের এবং কিছু মেয়ের ব্যবহার খুব জঘন্য। তারা রাতে যে সব কাজ করে তা জানাতে পারবো না। এখানে যদি আপনারা থাকতেন তবে বুঝতেন। যখন আমার বয়স বারো বছর ছিল তখনই আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে স্যারকে বলেছিলাম আমাকে ভাল জায়গায় পাঠিয়ে দিন। কিন্তু দেয় নি। আমি সেই ছোটবেলা থেকে কষ্ট করছি। আর কতদিন কষ্ট করবো? দাদা, আপনি আমার জন্য এমন পথ বেছে দেবেন যেন আমি চিরদিন ভালভাবে থাকতে পারি।

মালার লিখিত আবেদনপত্রটি লিলুয়া উদ্ধার আশ্রমের বাসিন্দা জ্যোৎস্না মিস্ত্রি তার শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে এনে তার আইনজীবী শিবশংকর চক্রবর্তীর হাতে দেয়। শিবশংকরবাবু মালার পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয়া বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীরের এজলাসে তার মুক্তির জন্য রিট পিটিশন দাখিল করেন। যুক্তি দেখানো হয় যে মালার বয়স ২১ বছরের বেশি। সুতরাং তাকে আটক রাখার কোন অধিকার রাজ্য সরকারের নেই।

কিন্তু লিলুয়া হোমের কর্তৃপক্ষ মালাকে ছেড়ে দিতে নারাজ। কর্তৃপক্ষের ভয় এই প্রতিবাদী মেয়েটি হয়তো সেখানের 'সেকসুয়াল টরচারের' গোপন কাহিনী ফাঁস করে দেবেন। হোমের কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে জোর করে মালাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় যে সে সেখানে অতি সুখে আছে। হোমের পরিবেশ নির্মল। ব্যবস্থা সুন্দর। সেখানে সকল আশ্রিতা মেয়েরা পরম আনন্দে দিন কাটায়। মালার এই দ্বিতীয় চিঠিটিও হাইকোর্টে দাখিল করা হয়।

যাইহোক হাইকোর্টের নির্দেশে মালার বিচার স্থানান্তরিত হয় বর্ধমান সদর আদালতে। কারণ মালার বাড়ি ছিল কাটোয়ায় এবং তার নিখোঁজ হবার খবরটিও প্রথম কাটোয়া থানায় লিপিবদ্ধ হয়। বর্ধমান জেলা জজের আদালতে মামলা উঠলে মালা স্পষ্ট ভাষায় বলে লিলুয়া হোমের কর্তৃপক্ষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিবৃতি লিখিয়ে নিয়েছেন। সে সাবালিকা এবং তাকে আটক রাখার কোন অধিকার কারো নেই। বারোটা বছর যে মেয়ে মুখবুজে সমাজের সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করেছে তার সেই বিদ্রোহিনী রূপ দেখে হোমের কর্তৃপক্ষ এবার ভয় পেলেন। আদালত মালার মুক্তির আদেশ দিলেন। মালা এখন টালিগঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল মিশন অফ হোপে আছে। ভাল আছে। লেখাপড়া শিখছে। জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপযুক্ত শিক্ষা নিতে আজ সে ব্যস্ত।

সবাই মালার মত ভাগ্যবতী নয়। পাশবিক যৌন অত্যাচারের বলি মেয়েদের বেশিরভাগই বাড়িতে স্থান পায় না। সে তখন পরিবারের লজ্জা। অবাঞ্ছিতা। কেউ তাকে চায় না। অর্চনা পাল তাদেরই একজন। আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার পথে সে নিখোঁজ হয়। পিতৃহীন অর্চনার মা বিষ্ণুপুর এবং বেহালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুন্দরবন এলাকায় একটি গ্রাম থেকে অর্চনাকে উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার হয় আসরাফ নামে একটি মুসলিম যুবক। আসরাফের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ফুসলানো এবং ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় আলিপুর জেলা আদালতে। অল্প কিছুদিন পরেই আসরাফ জামিনে খালাস পায়। অর্চনা 'সেফ কাস্টডি'র কঠোর নিয়মে বন্দী থাকে প্রেসিডেন্সী জেলে। পরে উদ্ধার আশ্রমে। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময়ই তার একটি মেয়ে জন্মায়। সেই শিশুটিও জন্মের পর থেকে বিনা অপরাধে মা'র-সঙ্গে বন্দী জীবন কাটাতে থাকে। বছরের পর বছর কেটে যায়। মামলার নিষ্পত্তি হয় না। অর্চনা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে মুক্তির আশায় দিন গোনে। একদিন সত্যি মুক্তি এলো। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অর্চনার ধর্ষণের মামলা খারিজ হয়ে গেল। আদালতের বাইরে এসে সে ভেবেছিল হয়তো দেখবে তার মা আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা করছে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু হায়! কোথায় অর্চনার মা, কোথায় তার আত্মীয় প্রিয়জন! যে মা তার মুক্তির জন্য দিনের পর দিন পুলিশ আদালত করেছে আজ যখন সত্যি সেই পরম লগ্ন এলো তখন তিনি নেই। অর্চনার মা'র নাম পাষাণী পাল। নামের মত সত্যি কি তাঁর হৃদয় পাষাণ? জানার জন্য দেখা করেছিলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুরের এক অজ এলাকায় পাষাণী পালের সঙ্গে। অনাহার অপুষ্টিতে রিক্ত এই বিধবার তখন চোখের জল ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই। অবৈধ সন্তান সহ অর্চনাকে ঘরে নিলে সমাজ তাকে একঘরে করবে। ধর্মে সে পতিত হবে। আত্মীয় পরিজন সকলেই তাকে ত্যাগ করবে। তাই সে বুকে পাথর চাপিয়ে আজ যথার্থ পাষাণী পাল হয়েছে। তবে অর্চনা কোথায় যাবে?

আজ কোথায় সে আছে? দয়া করে প্রশ্ন করবেন না। আমি জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। অর্চনা পাল একা নয়। তারই মত একটি ধর্ষিতা মেয়ে কমলা দাস। হাওড়া জেলে নবজাত একটি মেয়ে কোলে সেও বছরের পর বছর বিনা বিচারে দিন কাটিয়েছে। অর্চনার মামলা চলার সময় আইনজীবী এবং সংবাদপত্রের চাপে পড়ে রাজ্য কারাদপ্তর বাধ্য হয় কোন জেলে কত নিরপরাধ বন্দিনী আছে তার খোঁজ খবর করতে। তখনই কমলা দাসের কথা জানা যায়। কমলারও আত্মীয় পরিজন সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছিল, সেও আর নিজের বাড়ি ফিরে যেতে চায়নি। তবে সে কোথায় গেল? আবার বলছি আমি জানি না। অত্যাচারিতা মেয়েরা এমনিভাবেই হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন গতি নেই। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ স্বামীর চিতায় যুবতী বধূর পুড়ে মরাকে মহৎ কাজ বলে মনে করে। সতী নারীর স্মরণে লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির গড়া হয়। আর সমাজের লালসার আগুনে যে মেয়েরা পুড়ে সতী হলো তাদের কি হবে? আপনি, আমি, আমরা সকলেই জানি তাদের স্থান মন্দিরে নয়। তাদের আমরা আরো বেশি অন্ধকারে ঠেলে দেব। তারা বেঁচে থাকবে জীবন্ত প্রেতিনী রূপে।

আমার সাংবাদিক জীবনে পেছনে ফিরে তাকালে এমনি অনেক মেয়ের বেদনার্ত মুখ আমি দেখতে পাই। এরা সকলেই এক মুহূর্তের কোন ভুল বা অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণের সর্ব-নাশের মাশুল গুনছে সারা জীবন। একদিন যারা পাশে ছিল, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো তারা সব ভোজবাজির মত আজ উধাও। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে মালতী নস্করের কথা। সতের আঠারো বছরের একটি মেয়ে। ক্যানিং থানা এলাকায় বাড়ি। গ্রামের জোতদারের বখা ছেলের নজর পড়েছিল ওর উপর। দিনরাত মোটর সাইকেলে চড়ে ভটভট্ শব্দে মালতীদের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতো। সুযোগ পেলেই চলতো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী। একে বড়লোকের ছেলে তাই পাড়ার মস্তান। ভয়ে কেউ কিছু বলতো না। সুযোগ একদিন এলো। মালতী গিয়েছিল ট্যাংরাখালির সাতমুখী হাটে এক দর্জির দোকানে। ব্লাউজের ডেলিভারি নিতে। মালতীর জানা ছিল না দর্জি দোকানের মালিক জোতদারের ছেলের সাগ্‌রেদ। রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটা। দর্জির দোকানে দরজা বন্ধ করে মালতীর উপর অত্যাচার করা হয়। মালতীর আর্ত চিৎকারে হাটের লোকজন ছুটে এসে অপরাধী যুবকটিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ক্যানিং থানায় মালতী নিজেই অভিযোগ দায়ের করে (ক্যানিং থানা, কেস নং ১২(৭)৮৪)। দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা চলে। মালতী বন্দী থাকে। প্রথমে জেলে, পরে উদ্ধার আশ্রমে। একদিন মামলার নিষ্পত্তি হয়। মালতীকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্ষিতা এই মেয়েটি কি আজো সেখানে আছে? আদালতের আদেশে পুলিশের গাড়িতে চড়িয়ে মালতীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। তাকে তার পরিবার সমাজ গ্রহণ করলো কি না তা দেখার দায় নিশ্চয় আদালত বা পুলিশের নয়।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যে গরীব ঘরের মেয়েরাই সমাজের নারী সম্ভোগলোভী পশুদের লালসার শিকার হয়। বোধহয় দুর্বলের উপর অত্যাচার সহজ বলেই। যেমন রীতা রায়। তিলজলায় বাড়ি। মা'র সঙ্গে দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে কোনরকমে সংসার চালাতো।

নিরপরাধ বন্দিনী : মন্ত্রীর বক্তব্য

এদের ভবিষ্যৎ কি?

ছবি : সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারাগারে নিরপরাধ বন্দিনীদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তর কি সত্যি আগ্রহী? বর্তমানে সরকার তাঁদের সম্পর্কে কি ধরনের চিন্তাভাবনা করছেন? এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের কারা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন---.

প্র:– কিছু দুষ্কৃতকারীর ভোগ লালসার শিকার নিরপরাধ মেয়েদের কেন এই অন্ধকার কারাগারে বন্দিনী রাখা হবে?

বিশ্বনাথবাবু:– সমস্ত নিরপরাধ বন্দিনীরাই যে ধর্ষিতা বা ভোগ লালসার শিকার এ'কথা ঠিক নয়। তবে এদের সংখ্যাই বেশি। আজকের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় বহু মহিলা কক্ষচ্যুত উল্কার মত সমাজবৃত্তের বাইরে এসে পড়ে। এর কারণ হয়তো কোনক্ষেত্রে সংসারে মনোমালিন্য, স্বামী-পরিত্যক্তা। দারিদ্র অথবা নিছকই প্রেমের টানে। সাধারণত এইসব পথভ্রষ্টা যুবতীরা দুষ্ট নারীলোভী চক্রের শিকার হয়ে পড়ে। রেলস্টেশন, বাস স্টপ, মেলা, ধর্মশালা এইসব জায়গায় পরোপকারীর ছদ্মবেশে শয়তানরা এই যুবতীদের জন্য ফাঁদ পাতে। কাউকে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে বিপথে নিয়ে যায়।

প্র:– তাইতো জানতে চাই এদের কারাগারে পাঠানো হয় কেন?

বিশ্বনাথবাবু:– আমরা যে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাস করি সেখানে এটাই সাধারণ নিয়ম। যেমন পুলিশ অত্যাচারিতা পথভ্রষ্টা মেয়েদের উদ্ধার করে আদালতে পাঠায়। বিচারক আশ্রয়হীনা মেয়েদের সার্বিক সুরক্ষার জন্য কারাগারে পাঠান। সেখানে সে পায় আহার, আশ্রয় ও নিরাপত্তা। কারাগারে পাঠানোর জন্য বিচারক যে আদেশনামা দেন তাতে মহিলার সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকে না। কেবল শ্রেণী ভাগ করা হয়। যেমন হারিয়ে যাওয়া, দুস্থ, গৃহত্যাগী, লালসার বলি অথবা কেবল নিরাপত্তার কারণে।

প্রশ্ন:– আমরা পাশবিক প্রবৃত্তির বলি মেয়েদের কথা জানতে চাই। তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিশ্বনাথবাবু:– এই অভাগিনীরা কারাগারে আবদ্ধ থাকেন বিচার বিভাগের প্রয়োজনে। যে অপরাধী তার বিচার চলাকালীন এই মহিলার সাক্ষ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। মহিলার ডাক্তারী পরীক্ষা ও সাক্ষ্য প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাই তাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হয়।

যদিও এই মহিলারা কোর্টের আদেশেই কারাগারে থাকেন তবুও এরা অপরাধী নন। কিন্তু কারাগারে থাকার সময় এদের নানা ধরনের অপরাধীদের সঙ্গেই বাস করতে হয়। কারণ এঁদের পৃথকীকরণের কোন ব্যবস্থা কারাগারে বর্তমানে নেই। তাই অনেক সময় এঁরা কারাগারে স্বভাব অপরাধীদের অন্ধকারময় দূষিত সংস্পর্শে এসে সেই ঘৃণ্য জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে অভিযুক্ত পুরুষের বিচার শেষ হওয়ার পরও এই নিরপরাধ মেয়েরা বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায় না। আপনার সঙ্গে আমারও প্রশ্ন এই বন্দীত্ব কার পাপে?

প্র:– আপনি কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে এই নিরপরাধ বন্দিনীদের জন্য কতটুকু করেছেন?

বিশ্বনাথবাবু:– আমি গত মার্চ মাসে এই দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তার আগে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের মার্চের আগে পশ্চিমবাংলার কারাগারে নিরপরাধ বন্দিনীর সংখ্যা ছিল ১২৫ জন। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ছিল আঠারো বছরের বেশি। আমি দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই এই বন্দিনীদের নিজ গৃহে অথবা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পরিচালিত আবাসগুলিতে পাঠানোর আদেশ দিই। এই আদেশের ফলে ৩১শে এপ্রিলের মধ্যেই ১২৫ জনের মধ্যে ২৭ জনকে তাদের নিজ বাড়িতে অভিভাবকের কাছে পাঠানো সম্ভবপর হয়েছে। বাকি ৯৮ জন কারাগারে আছেন। তারা কোন কোন কারাগারে আছে তার তালিকা দিচ্ছি--

(১)	প্রেসিডেন্সী কারা	৩১ জন
(২)	বর্ধমান কারা	২৯ জন
(৩)	মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারা	৯ জন
(৪)	বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা	২ জন
(৫)	আসানসোল (বিশেষ) কারা	৩ জন
(৬)	পুরুলিয়া কারা	২ জন
(৭)	জলপাইগুড়ি কারা	২ জন
(৮)	শিলিগুড়ি (বিশেষ) কারা	৩ জন
(৯)	কুচবিহার কারা	২ জন
(১০)	সিউড়ি কারা	১ জন
(১১)	হুগলী কারা	৯ জন
(১২)	দার্জিলিং কারা	১ জন
(১৩)	শ্রীরামপুর মহকুমা কারা	২ জন
(১৪)	রানাঘাট মহকুমা কারা	১ জন
(১৫)	ইসলামপুর মহকুমা কারা	১ জন
	মোট	৯৮ জন

প্র:– সুপ্রীম কোর্টে কে সুব্বা অনন্তী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলার রায়ে নিরপরাধ বন্দিনীদের হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে সরকারি মত কি?

বিশ্বনাথবাবু:– মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বামফ্রন্ট সরকার স্বাগত জানিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব এই মহিলাদের সরকারি আবাসে নিয়ে এসে নানা ধরনের জীবিকার ট্রেনিং দেওয়া হোক। যাতে তাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই তাঁদের বাইরের জগতে রক্ষা করবে। এর প্রয়োজন আছে। অনেকেই আর গৃহে স্থান পাবেন না। কারণ আমাদের সমাজের অভিভাবকরা যথেষ্ট উদার নন। বর্তমানে সরকারি হোমে মেয়েদের হাতের কাজ, দর্জির কাজ, তাঁতবোনা ইত্যাদি শেখানো হয়।

প্র:– সুপ্রীম কোর্টের আদেশ আপনার দপ্তর কতটা কার্যকর করেছে?

বিশ্বনাথবাবু:– আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা হলো এইসব মেয়েদের তাদের অভিভাবকদের কাছে পাঠানো। তবে সব সময় সম্ভব হয় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জেলে এদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু বহুক্ষেত্রে তারা বাড়ির ঠিকানা বলতে পারে নি। হয়তো নানা কারণে অনেকে বলতেও চান না। যাইহোক সম্প্রতি গন্তব্যস্থলবিহীন ৬৩ জন মহিলাকে বিভিন্ন হোমে পাঠানো

হয়েছে। তার একটা তালিকা দিলাম––

প্রঃ– রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে এমন অনেক নিরপরাধ বন্দিনী আছেন যাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তাঁদের জন্য কি করা হয়েছে?

বিশ্বনাথবাবুঃ– নিরপরাধ বন্দিনীদের কারাগার থেকে স্থানান্তরীকরণের সময় দেখা গেছে যে, অনেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন, জড়বুদ্ধি বা অবসাদগ্রস্থ। এঁদের সুচিকিৎসার আশু প্রয়োজন। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের (আদেশ নং এইচ·টি·বি–৬১/৮৭) গত জুলাই মাসে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে যে বিভিন্ন কারাগারের মানসিক ভারসাম্যহীনাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন হাসপাতালের মনোরোগ চিকিৎসকরা। যেমন ক্যালকাটা পাভলভ হসপিটালের দায়িত্বে আছে প্রেসিডেন্সী ও হাওড়া কারা, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দায়িত্বে বর্ধমান, আসানসোল ও সিউড়ি কারা, বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালের দায়িত্বে বাঁকুড়া কারা, পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের দায়িত্বে আছে পুরুলিয়া কারা। ঠিক এইভাবে বহরমপুর, মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, চুঁচুড়া, নদীয়া সদর হাসপাতালের অধীনে আনা হয়েছে সেখানের স্থানীয় কারাগারের মানসিক ভারসাম্যহীন বন্দিনীদের।

কারাগার থেকে হোমে প্রেরিত নিরপরাধ মহিলাদের তালিকাঃ–

ক্রমিক নং	কারাগারের নাম	প্রেরিত বন্দিনীদের সংখ্যা	কোথায় প্রেরিত
(১)	পুরুলিয়া কারা	২	রিফর্মেটরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, পুরুলিয়া
(২)	জলপাইগুড়ি কারা	২	শহীদ বন্দনা মহিলা আবাস, কুচবিহার
(৩)	বর্ধমান কারা	২১	বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন, মেদিনীপুর
(৪)	প্রেসিডেন্সী কারা	৫	এস·এম·এম· হোম, লিলুয়া
		৫	এ্যাসোশিয়েশন ফর সোসাল হেলথ্, কলিকাতা।
(৫)	মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারা	৭	বিদ্যাসাগর বালিকাভবন, মেদিনীপুর
		২	এস·এম·এম·হোম, লিলুয়া
(৬)	কুচবিহার জেলা কারা	২	শহীদ বন্দনা মহিলা আবাস, কুচবিহার
(৭)	বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা	২	মালদহ জেলা আশ্রয়াবাস
(৮)	আসানসোল বিশেষ কারা	৩	বর্ধমান জেলা আশ্রয়াবাস
(৯)	দার্জিলিং জেলা কারা	১	নিজ বাটীতে গৃহীত হয়েছে।
(১০)	ইসলামপুর মহকুমা কারা	১	শহীদ বন্দনা মহিলা আবাস, কুচবিহার
(১১)	শ্রীরামপুর কারা	২	নিঃস্বদের আবাস–উত্তরপাড়া
(১২)	রানাঘাট কারা	১	এস·এম·এম· হোম, লিলুয়া
(১৩)	বর্ধমান কারা	৫	সারা বাংলা মহিলা আবাস ইলিয়ট রোড, কলিকাতা
(১৪)	হুগলী কারা	২	পিতামাতার নিকট প্রেরণের উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ।
		মোট ৬৩ জন	

হঠাৎ পাড়ার মাস্তানদের চোখ পড়লো। ব্যস্, একরাতে ঘরের ভেতর থেকে তারা রীতাকে তুলে নিয়ে গেল। গণধর্ষণ। থানা, আদালত। জেলখানা। উদ্ধার আশ্রম। তারপর আবার পাপের অন্ধকারে চিরকালের মত হারিয়ে যাওয়া। রীতাদের জন্য কেউ চোখের জল ফেলে না। এইসব মেয়েরা বোধহয় জন্ম হতেই সমাজবিরোধীদের কাছে বলি প্রদত্ত। রীতা একা নয়। তারই মত একটি গরীব ঘরের কিশোরীকে বিনা অপরাধে উদ্ধার আশ্রমের চার দেওয়ালের আড়ালে বছরের পর বছর মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে হয়েছিল। ষোল বছরের এই কিশোরীটির নাম দীপালী দাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলপি থানার মশামারি গ্রামের মেয়ে। যাদবপুরের বাঘা যতীনে তার দিদি জামাইবাবুর বাড়ি এসেছিল বেড়াতে। রাতে খেতে বসে তুচ্ছ একটা ব্যাপারে জামাইবাবু কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। রাগ করে সেই রাতেই দীপালী বাড়ি ছেড়ে নিজের গ্রামে ফেরার চেষ্টা করে। অথচ কোন ট্রেন কোথায় যায় সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। দীপালী ক্যানিং–গামী শেষ লোকালে উঠে চম্পাহাটি স্টেশনে নামে। গভীর রাতে স্টেশনের বেঞ্চে একটি বেওয়ারিশ কিশোরীকে হাতে পেয়ে স্টেশন এলাকার চোলাই মদের কারবারী সমাজ-বিরোধীরা যথেচ্ছ মজা লুটে নেয়। পরে পুলিশ সন্দেহবশে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। দীপালীকে উদ্ধার আশ্রমে চালান দেওয়া হয়। পরে যথারীতি প্রমাণাভাবে মামলা ফেঁসে যায়। কিন্তু অত্যাচারিতা দীপালীর মুক্তি মেলে না।

সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অমান্য করে রাজ্যসরকার এখনো বহু নিরপরাধ নারীকে জেলে আটক করে রেখেছেন। যা এখন আইনগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার করতে পারেন না।

আমাদের দেশে অপরাধীদের বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু নিরপরাধ বন্দিনীরা যাদের উপর অপরাধ করা হয়েছে তারা কেন শাস্তি পাবে? এরা সমাজ পরিত্যক্তা বিনা দোষে। এঁদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা আছে কি? সরকারি ব্যবস্থা যা আছে তা না থাকারই নামান্তর। সারা পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষিতা নারীদের জন্য মাত্র দুটি 'রেসকিউ হোম' আছে। এ ছাড়া তিনটি জেলায় আশ্রয়হীনা মেয়েদের আবাস-ভবন আছে। এইসব মিলিয়ে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত ২৫৫টি মেয়েকে রাখার ব্যবস্থা সারা পশ্চিমবঙ্গে করতে পেরেছেন। এর ফলে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অমান্য করে রাজ্য সরকার এখনো বহু নিরপরাধ নারীকে জেলে আটক করে রেখেছেন। যা এখন আইনগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার করতে পারেন না।

সুপ্রীম কোর্ট গত ২৭শে এপ্রিল এক আদেশে বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত যত শীঘ্র সম্ভব এই সব অনাথিনী অত্যাচারিতা মেয়েদের যথার্থ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই রাজ্য সরকার নেয় নি। আজো বহু মেয়ে জেলখানার অন্ধকারে তিলে তিলে পচছে। সুপ্রীম কোর্টে জেলে আটক মেয়েদের মুক্তি ও পুনর্বাসন দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন আনেন যে ভদ্রলোক তিনি আমাদের রাজ্যের মানুষ নন। তিনি দিল্লির একজন সমাজসেবী। নাম, কে·সুব্বা অনন্তি। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় শ্রী এ·পি· সেন এবং শ্রী কে·সি· রায়ের এজলাসে দীর্ঘ শুনানীর পর তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারীকল্যাণমূলক কাজকর্মের সমালোচনা করে আদেশ দেন যে জেলে বিনা বিচারে বিনা অপরাধে কাউকে আটক রাখা যাবে না। তবু আটক আছে। কারণ তারা যাবে কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অবহেলিত দপ্তর হলো কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। উদ্ধার আশ্রমের আশ্রিতা মেয়েদের জন্য মাথা পিছু সরকারি ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হলো মাসিক মাত্র ১২৫ টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যেই তাদের অন্ন, বস্ত্র এমনকি রোগের চিকিৎসার খরচ ধরা হয়েছে। এই ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে মাথা পিছু দু'শো টাকা করার প্রস্তাব আজ আটমাস আগে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অর্থমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন। আজো সেই অনুমোদন মেলে নি। কারণ সরকারি অর্থ সংকট। অথচ এই নিদারুণ অর্থ সংকটের মধ্যেই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সাফ গেমস্ করেছেন। নেহেরু গোল্ডকাপ ফুটবল হচ্ছে। রুশ উৎসব হচ্ছে। আসলে আমাদের মন্ত্রীরাতো এই রক্ষণশীল সমাজেরই মানুষ। রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক। ধর্ষিতা মেয়েদের আমরা ঘৃণার চোখেই দেখি।

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ
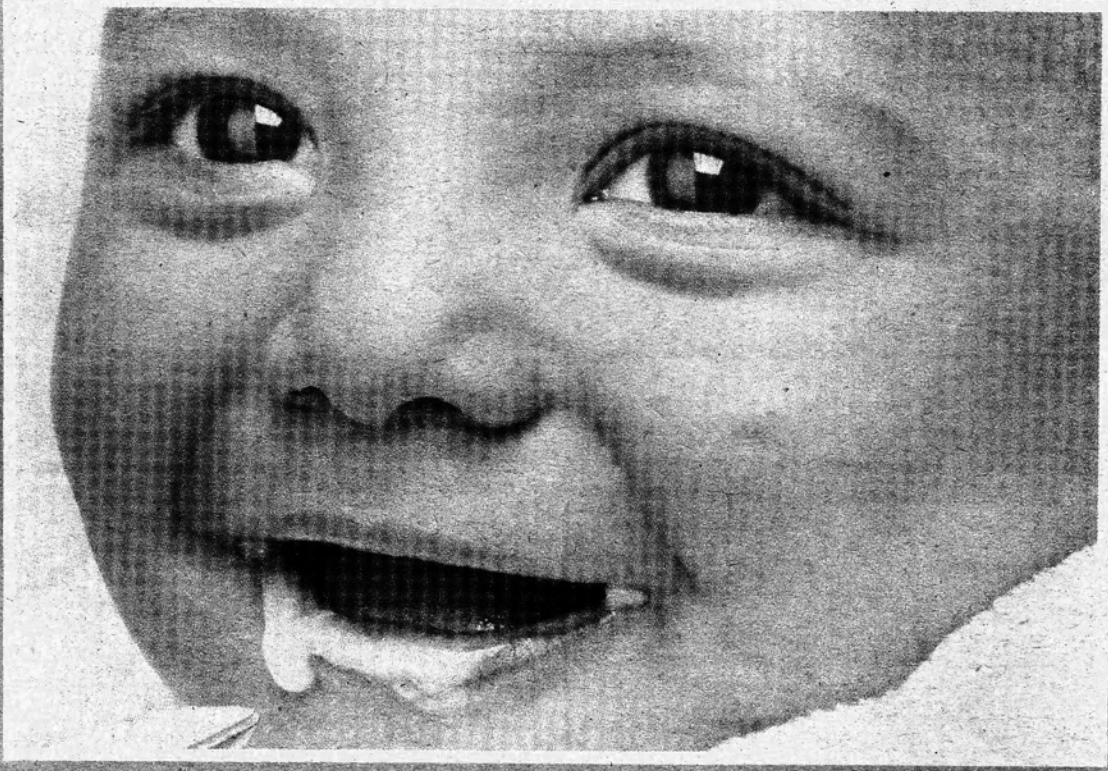
শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ ঃ সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান—প্রোটিন, কার্বো হাইড্রেটস্, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে তৈরী করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ ঃ সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয় চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন পছন্দ।

সময় বাঁচার লাভ ঃ সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো—চট্‌পট্ খাবার তৈরী।

পছন্দ ক'রে নেবার লাভ ঃ বাচ্চার আহারকে আরো আনন্দময় ক'রে তুলতে এখন সেরেল্যাক আপনি পাচ্ছেন দু'রকম স্বাদের। ৪-মাসে থেকে ওকে দিন সেরেল্যাক হুইট এবং ৬-মাস থেকে নতুন সেরেল্যাক আপেল।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দ্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক ভাবে পালন করুন।

বিনামূল্যে
নতুন সেরেল্যাক আপেল
বেজি'জ হেলথ রেকর্ড বুকের জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন ঃ সেরেল্যাক
পোষ্ট বক্স নং-3
নিউ দিল্লী-110 008

Nestlé

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অনন্য

RKSWAMY/FSL/4757 BEN

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

১৯৮৮
রাজীব কি টিকবেন ?

সারা দেশে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য রাজীব গান্ধী পর্যন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন। সারিস্কার বৈঠকে কংগ্রেস বাঁচানোর উদ্দেশ্য কি বিশ্বস্ততার নিরিখে স্থির হয়েছে? কংগ্রেস কি রাজীবের নেতৃত্বে ফের হৃতগৌরব ফিরে পাবে? ১৯৮৮ সালে রাজীব তথা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিবেদন।

কজন বিশিষ্ট মন্ত্রী সারিস্কার অভয়ারণ্যের মনোরম দৃশ্য দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লি ফিরে এসেছিলেন। হিসেব অনুযায়ী, তাকে যথেষ্ট মুগ্ধ এবং উৎসাহিত দেখালেও আসলে তিনি ভেতরে ভেতরে সশংয়ান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। নিজের বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁকে সারিস্কার ৬টি বৈঠকে মোট ১৬ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়েছিল। বৈঠক শেষে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত চিন্তায় আচ্ছন্ন, দিল্লি এবং এলাহাবাদের নির্বাচন সামনেই। এ ছাড়া সাধারণ নির্বাচনের ১৯৮৯ সাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনে হারলে দলের অবস্থা তেমন সুবিধেজনক হবে না। তাঁর মতে, রাজীবের যুদ্ধকালীন ধাঁচের ব্যস্ততা রীতিমত চিন্তার বিষয়। কারণ তিনি তাঁর বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তবে রাজীব যতই নিজেকে তৈরি করুননা কেন, ওই মন্ত্রীটির চিন্তা কিছুতেই দূরীভূত হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি সারিস্কার ঘটনাবলী পেশ করেছেন।

দল ও সরকারের আগামী তিন বছরের কর্মসূচী নির্ধারণ ও বিরোধীদের ঘায়েল করার জন্যে তিনি সারিস্কাতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা হিন্দু উগ্রবাদকে সামাল দেওয়ার বিষয়টিও অন্যতম প্রতি-পাদ্য ছিল। এছাড়া শারদ জোশির বিষয়টিও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। এইসব সমস্যাগুলি মোকা-বিলা করার জন্য কংগ্রেসের হাতে আছে ৫টি রাজ্য–(১) উত্তর প্রদেশ (২) বিহার (৩) মধ্যপ্রদেশ (৪)
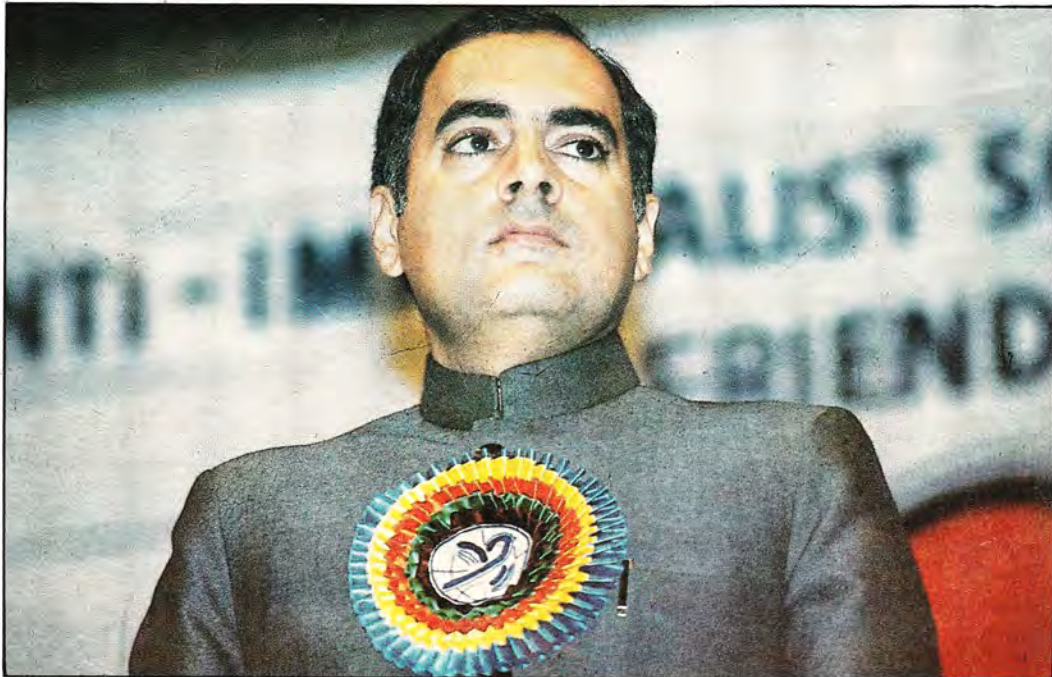
রাজস্থান আর (৫) উড়িষ্যা। রাজীবের মন্ত্রীসভার সকলেই এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত। কিন্তু যখনই কম্প্যুটার কার্ড তারা দেখলেন তখনই তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে পড়ল। এমন কি রাজীব গান্ধী যখন সারিস্কাতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন, তখন অনেকেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে নেহরু ও শ্রীমতী গান্ধীর পদাংক অনুসরণ করছেন রাজীব। কিন্তু এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই মাদ্রাজে তিনি স্পষ্ট জানালেন যে সমাজবাদে তার কোন নিষ্ঠা নেই। পরে অবশ্য আবার রাজীবকে সমাজবাদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে হতে দেখা গেল।

সারিস্কার আলোচনার নীটফল যাই হোক না কেন, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল—অভিজাত শ্রেণীদের দাবিয়ে সাধারণ মানুষদের উন্নতি সাধন। তবে সমাজবাদ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির টিকিও দেখা গেল না এখানে। ওই বিশিষ্ট মন্ত্রীটির আক্ষেপ ছিল যে তার প্রতি অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি নাকি সারিস্কাতে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। মন্ত্রীর কথা সত্যি হতে চলেছিল কারণ বৈঠক শেষেই দলে বাড়তে শুরু করেছিল অন্তর্বিরোধ। তবে বৈঠকে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলি কি সত্যিই ভিত্তিহীন?

অনেক কংগ্রেসির মতে ওই বৈঠক সারিস্কাতে না হয়ে দিল্লিতেই হতে পারত। সেক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হতো। এটা নিশ্চয়ই রাজীব প্রচার করতে চান নি যে জর্ডনের শাহের দেওয়া মার্সিডিজ গাড়িতে তিন ঘন্টা কম লেগেছে সারিস্কা যেতে। এ ধরনের কাজে অনেকেই খুশি হননি। বলা বাহুল্য, তাদের মতে, যে দলকে সাধারণ মানুষেরা জিতিয়েছেন, তাদের উচিত সাধারণ মানুষের কথা ভাবা। পাশ্চাত্যের সঙ্গে রাজীবের মাখামাখির ব্যাপারটাকে যারা আগে প্রশংসার চোখে দেখতেন, তারাও ইদানীং তার কটু সমালোচনা করে থাকেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক গিরিলাল জৈন সারিস্কা সম্পর্কে বেশ কভারেজ দিয়েছিলেন এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাজীব এইভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। তাঁর মতে সারিস্কাতে অত বড় বৈঠক না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। বহু ঝানু কংগ্রেসি আছেন যাঁরা জানেন কাকে কোন কাজে লাগানো প্রয়োজন। কিন্তু রাজীব অপ্রয়োজনীয় লোকেদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে এক করে-ছিলেন।

রাজীবের পদক্ষেপের অনেক-গুলিই কিন্তু ভুল। যেমন এবার তিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হরিদেও যোশীকে ভর্ৎসনা করেছেন। স্মরণ করা যেতে পারে আজ থেকে ৫ বছর আগে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী টি· আনজাইয়াকে বেগমপেট বিমান-বন্দরে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছিলেন তিনি। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। অন্ধ্র থেকে কংগ্রেসকে সরে যেতে হয়। আজ যোশীকে পছন্দ না হবার কারণ তিনি পাশ্চাত্যভাবের বুদ্ধিজীবী নন, সমবেতদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। ভদ্রলোক ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। চিন্তার বিষয় এই যে শ্রীমতী গান্ধী যেক্ষেত্রে ভর্ৎসনা করার পরে আবার নিজে এগিয়ে এসে মিটমাটের চেষ্টা করতেন, সেক্ষেত্রে রাজীব এসব ব্যাপারে দ্বিতীয়বার আর ভাবেন না। তবে এবার ভর্ৎসনার পরে বোধহয় রাজীব ব্যাপারটা বুঝে হরিদেও যোশীকে ডিনারে ডেকেছিলেন।

বর্ষীয়ানদের প্রতি মনোভাব

আসল ব্যাপার হলো রাজীবের

৮৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

এই জনসমর্থনে [illegible] এ কি ভাটার টান এসেছে?

ওয়ান ওয়াল থিয়েটার টলিউডে নয়া ক্রেজ

'লালপাথর'-এ দিলীপ রায় ও বিদিশা মুখার্জি

নাট্য মহল্লায় নতুন ক্রেজ ওয়ান ওয়াল ড্রামা। কলকাতার ফিল্মীস্থান থেকে উঠে আসা এই ত্রিমাত্রিক থিয়েটার শুধু চিৎপুরের যাত্রা পাড়াকেই গ্রাস করতে উদ্যত নয়, ধাক্কা দিয়েছে বাণিজ্যিক থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার এমন কি খোদ টলিউডকেও। ওয়ান ওয়ালের নতুনত্ব কি? কিভাবে বাংলা নাট্যজগতে জাঁকিয়ে বসল? টলিউডের চত্বর ছেড়ে কারা এসে ভিড়ছেন এই নাট্যহুজুগে? বাংলার নাট্য-সংস্কৃতির বিপজ্জনক বাঁকের দিকে সময়ানুগ আলোকপাত।

সুপ্রিয়া দেবী

তাপস পাল, সন্ধ্যা রায়

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে টানা আট ন'দিনের বহির্দৃশ্য গ্রহণের তোড়জোর শুরু করেছিলেন পরিচালক প্রভাত রায়। শু'টিং হবে শিলিগুড়ি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে। সময় কম, যেভাবে হোক, শুটিং শেষ করতেই হবে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ছবির অন্যতম নায়ক তাপস পালকে নিয়ে। তাপস শুটিং–এ রোজই অংশ নিতে পারবে, সেরকমই কথা আছে। কিন্তু মুশকিল হলো, মাঝের একটি সন্ধ্যে নিয়ে। ওইদিন কলকাতার যাদবপুরে আছে চিত্রসফল 'সাহেব' কাহিনীর নাট্যরূপ–এর অভিনয়। কোনভাবেই ওই নাটক বন্ধ করা সম্ভব নয়। আবার সারাদিন শিলিগুড়িতে অভিনয় করে রাত্রে যাদবপুরে অভিনয় করা কখনোই হয়ে উঠবে না। সমস্যা এখানেই, তাপস না পারছেন নাটক বন্ধ করতে, না পারছেন শুটিং বন্ধ করতে। নাটকে বহু টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে, তখন তাপস অভিনয় না করলে এখানে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।

আসলে তাপস জানতেন না শুটিংটা হবে শিলিগুড়িতে। ওর ধারণা ছিল, শুটিং হবে কলকাতায়। আর তা হলে কোন সমস্যাই ছিল না। সারাদিন শুটিং করে রাত্রে যাদবপুরে অভিনয়

করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর তাই ভেবে তাপস 'সাহেব' অভিনয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এখন শুটিং শিলিগুড়িতে হবে শুনে, তাপস পড়লেন অকুল পাথারে। সেইসঙ্গে আরও অনেকে। তবে এ ছবির প্রযোজকের কানে খবরটা যেতেই উনি খুবই সহজে সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

সমাধানের সূত্রটি হলো এই যে, তাপস 'সাহেব' অভিনয়ের দিন ছবির কোন শুটিং করবেন না। ওইদিন সকালের প্লেন ধরে বাগডোগরা থেকে আসবেন দমদম। রাত্রে 'ওয়ান ওয়াল' নাটকে অংশ নিয়ে পরদিন ভোরের ফ্লাইট ধরে ফিরে যাবেন বাগডোগরা, আর ওইদিন থেকেই ছবির কাজ করবেন।

সেইমত প্লেনে আসা-যাওয়া করে তাপস 'সাহেব' নামক ওয়ান ওয়াল নাটকে কাজ করলেন।

ট্যালিগঞ্জের স্টুডিওতে একটানা কাজ চলছে কোন একটি ছবির। ছবির নায়িকা একদিন সন্ধ্যেবেলা পরিচালকের কাছে সবিনয়ে জানতে চাইলেন, কাল তাকে ক'টার সময় আসতে হবে?

এটাই দস্তুর! পরদিন শুটিং থাকলে পরিচালকের কাছ থেকে জেনে নিতে হয় কখন তাকে আসতে হবে? নায়িকাটিও তাই করলেন। পরিচালক বললেন, কাল ঠিক দশটার সময় তোমার প্রথম শট্ নেওয়া হবে।

এ কথা শুনেই নায়িকাটি বললেন, অসম্ভব।

পরিচালক অবাক হয়ে বললেন, অসম্ভব কেন? ন'টার সময় টেকনিশিয়ানদের আসতে বলেছি। দশটার সময় প্রথম শট্ নেব।

নায়িকাটি বড় বড় চোখ করে বললেন, প্রথম শট্ আপনি নিতে পারবেন না—একথা আমি কখন বললাম। আমি বলছিলাম, দশটার প্রথম শর্টে আমার থাকা সম্ভব নয়।

—কেন?

—কি করে আসবো বলুন। এই এখন যাবো কাঁথি। রাত এগারোটা থেকে ওয়ান ওয়াল শো। রাত দুটো আড়াইটেতে ভাঙবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাতটা সাড়ে সাতটা বাজবে। তারপর একটু বিশ্রাম না নিয়ে কি করে আসি বলুন তো? রাত জাগা আমার ওই চেহারা দেখে তো আপনিই কনটিনিউটি ব্রেক হচ্ছে বলে আমায় তাড়িয়ে দেবেন। তার থেকে আমার কাজ লাঞ্চের পর রাখুন, সবদিক থেকেই ভালো হয়। কাল বৃহস্পতিবার আমার আবার স্টেজে নাটক আছে, তার উপর আপনার শুটিং সারাদিন। সকালে একটু না ঘুমোলে আমি পারব না। প্লিজ একটু অ্যালাউ করুন।

পরিচালকের গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই পরিচালক নায়িকার শর্তে রাজি হলেন। না হয়েই বা উপায় কি?

এবারে আসুন টালিগঞ্জ ছেড়ে একটু চিৎপুরে যাত্রা পাড়ার দিকে যাওয়া যাক।

যাত্রার গদিঘর থেকেই বায়না হবে ওয়ান ওয়াল থিয়েটারটির। কাগজে সেইমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। যার বক্তব্য হলো, আজ সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত গদিতে উপস্থিত থাকবেন নাটকের শিল্পীরা, অতএব নায়েকেরা এইসময় এসে শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিতে পারবেন।

ওই বিজ্ঞাপন বেরনোর পর থেকেই গদিঘরে ভিড় শুরু হয়ে গেল। শিল্পীরা আসবেন দশটায়। সকাল সাড়ে আটটা থেকেই আগ্রহী নায়েকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। শিল্পীরা আসতেই বাঁধন ছেঁড়া সেই ভিড় সামলাতে কিছু স্বাস্থ্যবান যুবকের প্রয়োজন হলো।

তবে গদিঘরের আসল মালিক পড়লেন বিপদে। উনি সামান্য কমিশনের বিনিময়ে ওয়ান ওয়াল নাটকটির বায়নার অনুমতি দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, কমিশন বাবদ কিছু রোজগার। দুই, ওয়ান ওয়ালের ফিরিয়ে দেওয়া পার্টিগুলোর কাছে নিজের দলের যাত্রাপালাকে গছিয়ে দেওয়া।

কার্যক্ষেত্রে ঘটল অন্য। দরে বা ডেটে না পোষানো নায়েকেরা কিন্তু যাত্রার দিকে ঘুরেও দেখলেন না, তারা নিজেদের সুবিধামত অন্য ওয়ান ওয়াল নাটক বুক করলেন। যাত্রা করার অনুরোধ তাঁদের পক্ষে রাখা সম্ভব হলো না, কেননা উদ্যোক্তরা সকলেই মনে প্রাণে নাকি চেয়েছেন, যাত্রা নয়, যে কোনও মূল্যে ওয়ান ওয়াল চাই।

এমন খণ্ডচিত্র এ মুহূর্তে টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়া কি চিৎপুরের যাত্রার গদিঘরগুলিতে চোখ-কান খোলা রেখে ঘুরলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখা যাবে গ্রাম-বাংলার মানুষজন কিভাবে দ্রুত নিজেদের রুচি পাল্টে ফেলছেন। এখন আর তারা পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক একঘেয়ে পালায় ভুলতে রাজি নন। এখন আর তারা উঠতি কি কম প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পী, কি পরিচালক বা কোন দলের প্রতি আর তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না।

ওইসঙ্গে একই শিল্পী কি একই ধরনের যাত্রা দেখে দেখে সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মুখ বদলের জন্য দর্শকেরা আজ উন্মুখ। আর ঠিক সেইসময় ওয়ান ওয়াল নাটক এসে পড়ায়, সকলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছে। আর তাই চিৎপুরে ক্রমশই বাড়ছে ওয়ান ওয়াল নাটক বুক করে এমন অফিসের সংখ্যা।

যাত্রা মালিকেরাও এ সত্যটা বুঝেছেন, তাই তারা নানাভাবে চেষ্টা করছেন যাত্রার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য। তারা দেখেছেন ওয়ান ওয়ালের সাফল্যের পিছনে নাটক নয়, কাজ করছে এর জোরদার শিল্পী তালিকা। অতএব যাত্রাতেও রাঢ়াত্ত শিল্পী আকর্ষণ। লাখ লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে এ বছরও একাধিক নামী চলচ্চিত্র শিল্পীকে নিয়ে গেছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর আরও কিছু বিশিষ্ট শিল্পী নাকি যাত্রাতে যোগ দেবেন।

অর্থাৎ যাত্রাদলের মালিকেরাও আজ কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছেন। যেভাবে হোক, ওয়ান ওয়াল নাটককে আটকাবার জন্য। যার জন্য চিৎপুরের যে কোন গদিঘরে গেলেই আপনি শুনতে পাবেন, ওয়ান ওয়াল নাটকের অসফলতা সম্পর্কিত নানা কথাবার্তা।

এমন হওয়ার কারণ কি?

সোমা মুখার্জি
ওয়ান ওয়াল

ছবি: অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ওয়ান ওয়াল নাটকের সত্যিই যদি কোন 'ইমপ্যাক্ট' না থাকত তাহলে কি যাত্রাওয়ালারা তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন না। কই তারা তো তা করতে পারছেন না, বরঞ্চ দিনের পর দিন তাদের ভয়টা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

প্রতি বছরই শোনা যাচ্ছে একই কথার পুনরাবৃত্তি, 'আরে এ বছরটা যেতে দিন না সামনের বছর ওয়ান ওয়াল কোথায় থাকে দেখবেন? মানুষের আর্টিস্ট দেখার স্বাদ একবারই হয়, বারেবার নয়?'

মজার ব্যাপার হলো, যে আর্টিস্টদের দর্শকেরা একাধিক বার দেখে ফেলেছেন সেই সব 'দেখে ফেলা' শিল্পীদের আকাশ ছোঁয়া অংকের পারিশ্রমিক দিয়ে যাত্রা মালিকরা নিজ দলে নিচ্ছেন। তখন কিন্তু শিল্পীকে দর্শকদের দেখা হয়ে গেছে এ কথা ভাবছেন না বা ও প্রসঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। এমন কি সত্যি জনপ্রিয় কোন চিত্রতারকাকে নিয়ে কোন যাত্রা দলের লোকসানও হয়েছে।

সঠিক জানা না গেলেও মোটামুটিভাবে যাত্রায় ঐতিহ্য প্রায় দুশো বছর বলে অনুমান করে নেওয়া যায়। সে তুলনায় ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের বয়স দশও পেরোয়নি। কাজেই দশ বছরের কোন শিশু যদি বয়স্ককে নাস্তানাবুদ করতে থাকে তাহলে তো অস্বস্তি হবেই। বিশেষ করে যেখানে ওয়ান ওয়াল নাটক আর যাত্রা খুবই কাছাকাছি।

ওয়ান ওয়াল নাটক বা তিনদিক খোলা মঞ্চের ওই নাটক অনুষ্ঠিত হয় নিরাভরণ মঞ্চে। যাত্রা হয় চারদিক খোলা মঞ্চে, ওয়ান ওয়ালে খোলা থাকে তিনদিক। যাত্রায় মঞ্চে থাকেন বাজনদারেরা, এখানে গান বা আবহসঙ্গীতের পুরো ব্যাপারটাই ঘটে টেপ রেকর্ডে মঞ্চের পিছন থেকে। যাত্রায় যেমন বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটলে মঞ্চে কোন উপকরণ আনা হয় না, ওয়ান ওয়ালেও তাই। যাত্রার সময়সীমা না হলেও ওই সময়ের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যাত্রার সঙ্গে এর বিশেষ কোন তফাৎ নেই, তাই কেউ কেউ একে বড়লোকের যাত্রা বলেও অভিহিত করে থাকে।

এর সূচনা কবে হয়েছে এ নিয়েও রয়েছে নানা মতভেদ।

তবে নানা তথ্য ও বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে তা এরকম—

সত্তর দশকের শেষ দিকে বাংলা নাটকের চাহিদা খুব বেড়েছিল। কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলের থিয়েটার পাড়ার প্রধান দর্শকেরাই হলেন গ্রাম বাংলার বাসিন্দা। প্রতি শো-তে এদের সংখ্যাধিক্য যে কোন হলের সামনে দাঁড়ালেই দেখা যায়। ওই সময় যাত্রাও আর তেমন দর্শক টানতে পারছিল না। বড় বড় প্রোডাকশনগুলি একে একে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। এমত অবস্থায় উদ্যোক্তরা ঝুঁকে পড়েছিলেন হাতিবাগানের থিয়েটারগুলোর দিকে। যদি বিখ্যাত নাটকগুলো গ্রামে নিয়ে গিয়ে অভিনয় করানো হয়, তাহলে লাভের অংক

রঞ্জিত মল্লিক, সিনেমা **থেকে** তিনদিক **খোলা মঞ্চে**

বাড়বেই। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত একটা যাত্রাদলের যা পারিশ্রমিক তা দিয়েই নাটকগুলো তখন পাওয়া যেত। নাটক তো হলোই উপরন্তু ফাউ হিসাবে কিছু নামী চিত্রতারকাকে কাছে থেকেও দেখা হয়ে গেল, আবার নাটক দেখার জন্য হাতিবাগান যাওয়ার পরিশ্রমও করতে হবে না। সব মিলিয়ে নিশ্চিন্ত ব্যবসা। কিন্তু গোল বাধালো, নাটকের সাজ-সরঞ্জাম এবং রিভলভিং স্টেজ। গ্রামে অত লট বহর নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়, তার উপর গ্রামে রিভলভিং স্টেজ পাওয়া যাবে কোথায়?

শুধুমাত্র এ কারণেই শুরু হলো নাটকের সংশোধনের চিন্তা ভাবনা। দুটো চারটে অতিরিক্ত সংলাপ জুড়ে দিয়ে নাটকটিকে তিনদিক খোলা মঞ্চের উপযোগী, সব ঝামেলা শূন্য করে নেওয়া শুরু হয়ে গেল, এমন কি এর ফলে খরচও গেল কমে। একটা পুরো সাজসজ্জা সম্বলিত নাটক ভাড়া করতে যে টাকা লাগতো, সেই নাটকই ওয়ান ওয়াল হয়ে যেতে টাকাও অনেক কম লাগতে লাগল। উদ্যোক্তদের এতে সুবিধাই হলো, ওরা তো নাম বেচতে বসেছেন, নাটকের কোয়ালিটি নয়।

এ কথা রটে যেতেই কিংবা এ প্রক্রিয়ায় ভাল ফল পাওয়া যেতেই, সাড়া পড়ে গেল শিল্পীমহলে। নাটক করেন না এমন শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। ওয়ান ওয়ালের রূপালি টাকার হাতছানিতে তারাও প্রলুব্ধ হলেন। আর অমনি খোঁজা শুরু হয়ে গেল, পুরনো নাটকের। অতীতের মঞ্চসফল নাটকগুলোকে ধুলো ঝেড়ে খুঁজে বের করা হলো। অল্প স্বল্প পরিবর্তন করে সেগুলিকে আবার নতুন জীবন পাইয়ে দেওয়া হলো।

ওইসঙ্গে চলচ্চিত্রে সফল ছবিরও নাট্যরূপ দেওয়া চলতে লাগল। ওইসব নাটকে, চলচ্চিত্রে যারা অভিনয় করেছিলেন, তারাই সেই সেই চরিত্রে অভিনয় করতে লাগলেন। ফলে আকর্ষণ আরও বেড়ে যেতে লাগল।

এ মুহূর্তে হাতিবাগানের জনপ্রিয় নাটকগুলি ছাড়াও প্রায় গোটা কুড়ি ওয়ান ওয়াল নাটকের অভিনয় চলছে।

সকলেই জানেন, বাংলা ছবির কাজ অনেক বেড়ে গেছে এখন। কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরই এখন দম ফেলার ফুরসৎ নেই। এরই মধ্যে প্রতি মাসেই পাঁচ সাতটা দিন অনেকেই ওয়ান ওয়ালের জন্য ব্যয় করে থাকেন। এর কারণ একটাই, মোটা প্রাপ্তিযোগ। যা চলচ্চিত্রে একদিন অভিনয় করে পাওয়া যায় না, তাই পাওয়া যেতে লাগল একদিন নাটকে অভিনয় করে। এতে পরিশ্রম হয়তো বেশি কিন্তু বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাও কম নয়। ফলে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওয়ান ওয়াল করার ব্যাপারে।

শুধু শিল্পী নয়, পরিচালক, সুরকারেরাও আগ্রহী হয়েছেন ওয়ান ওয়াল নাটক নিয়ে। তাদের আগ্রহের কারণ অর্থ। এক্ষেত্রে তাঁরা যে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পেয়ে থাকেন তাকে অনেকই বলতে হয়। আজ তাই বাংলা ছবির অনেক নামী দামী পরিচালক, সুরকার কি নাট্যকার বিশেষ আগ্রহী হচ্ছেন ওয়ান ওয়ালের ব্যাপারে।

এদের সবার পারিশ্রমিক নিয়ে একটি ওয়ান ওয়াল নাটকের টাকা খুব একটা কম নয়। তবে যাত্রায় যেমন বিভিন্ন টাকার দল পাওয়া যায়, ওয়ান ওয়ালও তেমনি। পাঁচ সাত হাজার থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। ফলে, এখন তিনদিক খোলা মঞ্চের নাটক ক্রমশই ঐতিহ্যবাহী যাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। শুধু শিল্পী দেখিয়েই ওয়ান ওয়াল নাটক যে বাজি মারছে না, যাত্রার দলগুলি তা বুঝে ফেলেছে। তাই তারা নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন যাত্রার আকর্ষণ বাড়াতে। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারেও ওয়ান ওয়াল দলগুলিও পিছিয়ে নেই। তবে যাত্রা মালিকদের কাছে আশার কথা, ওয়ান ওয়াল নাটকগুলির পক্ষে শিল্পীদের ব্যস্ততার জন্য নিয়মিত অভিনয় করা সম্ভব নয়। আশার আলো এটুকুই। অল্প অভিনয়ের জোরে ওয়ান ওয়াল নাটক যেভাবে আলোড়ন তুলেছে তাতে শংকিত হওয়ার কারণ আছে। নতুন জোয়ারে যাত্রার যাবতীয় রক্ষণশীলতা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে তিনদিক খোলা মঞ্চের নাটকগুলো। চলচ্চিত্রের প্রতিভাবান সেই সেই সঙ্গে জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গে লড়াই করা মোটেই যাত্রার শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যাত্রা যেখানে শিল্পীর অপ্রতুলতায় ভুগছে!

এসব কারণেই যাত্রার মালিকেরা নানাভাবে পালার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে চাইছেন। তা কি মুক্তির পথ? স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে দিতে যাত্রা আজ তার পুরাতন ঐতিহ্য তলানিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কাজেই ওয়ান ওয়াল নাটকের দাপট ক্রমশই যে বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি?

—নাট্য প্রতিনিধি।

শুভার পৃথিবী

দিব্যেন্দু পালিত

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁকে আসতে দেখল শুভা। একজন অন্য মানুষ। ভারী সুন্দর তাঁর আসা। হঠাৎ দেখলে বোঝা যাবে না কোথা থেকে এলেন তিনি। ওদিকের বড়ো বাড়িটার নিচে যেখানে ঘুপচি অন্ধকার চাপ বেঁধে আছে এখনো, ভুতুড়ে আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাড়ি আর তিন চার সারি থাম—সেখান থেকে একটা কুকুরের ডাক উঠতে উঠতেই থেমে গেছে একটু আগে। কিংবা তারও আগে, যখন অন্ধকারে হেডলাইট জ্বেলে উল্টোদিকের রাস্তায় খুব দ্রুত চলে গেল একটা গাড়ি। এইসব অস্পষ্টতার মধ্যে থেকেই সম্ভবত ভোরের প্রথম আলোয় দেখা গেল তাঁকে।

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

এইসময় সাধারণত ঘুমে কাদা হয়ে থাকে মানুষ। অন্যরকম হাওয়ায় শীত করে ওঠে শরীর। ইচ্ছে করে চাদর জড়াতে কিংবা যদি কেউ কাছে থাকে, চলে যেতে তার ঘনিষ্ঠ তাপের মধ্যে। তবে সকলেই কি আর হয় এমন! ওরই মধ্যে কেউ কেউ জেগে ওঠে শীতে, অভ্যাসেই হয়তো ঘুম ভেঙে যায় কারও। আশপাশে তাকিয়ে নিজের ভিতরে চলে যেতে যেতে মনে হয় বড়ো বেশি ফাঁকা চারদিক—বড়ো বেশি শূন্যতা।

আশপাশের অনেকটা জায়গা একার করে নিয়ে একটু দাঁড়ালেন তিনি। সুন্দর দু'টি চোখ তুলে তাকালেন আকাশে। শুভা জানে, এই মুহূর্তে চোখের সৌন্দর্য বলতে যা ভাবা যায় তা তারই মনে হওয়া তবু এমন কেন হবে যে তিনি চোখ তুলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে যা ছিল তার চেয়ে আরও একটু বেশি আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ, হঠাৎই আরও একটু সচল হয়ে উঠল হাওয়া।

এর পরেই শুরু হয়ে যায় তাঁর চলা। চমৎকার পা ফেলে। জোরে জোরে নয়, কিন্তু মন্থর নয়—হয়তো যেভাবে হাঁটা উচিত মানুষের। ওপর থেকে দেখা হলেও ভুল থাকে না দেখায়। এই ভোরেও পোশাকে মালিন্য নেই তাঁর, নেই কোনো বাহুল্য। এরকম উচ্চতা তাঁকেই মানায়। প্রশান্ত কপালের যেখান থেকে ওঠা উচিত সেখান থেকেই উঠে গেছে ঘন কেশরেখা। যথাযথ নাক, মুখ, চোয়াল, চিবুক। গাত্র বর্ণে চাঁপা ফুলের মসৃণতা। দূরত্বে থেকে যায় সযত্নে দেখা। এর বেশি খুঁটিয়ে দেখা যায় না।

বড়ো সুখের সময় এটা। একটা রাত কেটে গেল—যেটা আসলে ছিল আরও একটা রাত, আবছা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভোরের আলো। স্পর্শে জুড়োবার জন্য হাওয়া নিয়ে আসছে নতুন টান। এখনই সময় যখন ভরে উঠতে চায় স্মৃতি, মন চায় সম্মোহন। ভালো লাগে দূর কোন ভাবনায় জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু, সে যে একা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, তাঁকে দেখার আগ্রহে অদ্ভুত লাবণ্যে ভরে উঠছে বুক, তিনি তা দেখবেন না। দেখবেন কি? ওপরে আকাশ দেখার সময় নিশ্চয়ই তাঁর চোখ ছুঁয়ে গিয়েছিল শুভাকে। কিন্তু দেখেন নি যে, বোঝাই যায়। কিংবা, দেখেও

ছিলেন হয়তো, যেভাবে দেখেছিলেন গোটা বাড়িটাকে–বিভিন্ন জানলা ও বারান্দাগুলিকে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা পাম গাছটিকে এবং শেষে আকাশটিকে। এমনই নিরপেক্ষ তাঁর দেখার ধরন যে মনে হয় চারদিকের আলো হাওয়া সংস্পর্শের মধ্যে প্রাপ্ত সব কিছুই আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছেন তিনি। আলাদাভাবে গ্রহণ করবার জন্যে থামছেন না কোথাও।

ভারী সুন্দর তাঁর যাওয়া। শুভা দেখতে লাগল। ফুটপাথ বদল করে এইমাত্র পা রাখলেন অন্য ফুটপাথে। যেমন রাখেন তিনি, প্রতিদিন। কিন্তু আজ কি অন্যমনস্ক তিনি! এক ফুটপাথ থেকে রাস্তা পার হয়ে অন্য ফুটপাথে যাওয়ার সময়টুকুতে প্রায় তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল একটা ট্রাক। মুহূর্তের জন্যে বুক কেঁপে উঠল শুভার। এই বুঝি চাপা দিল তাঁকে। ট্রাকটা যখন পেরিয়ে গেল এবং আড়াল থেকে তিনিও উঠে এলেন ফুটপাথে, স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল সে। এতোখানি অন্যমনস্কতা ভালো নয়। ভাবল, তিনি কি জানেন, কতো অনিশ্চিত আমাদের চারপাশ–কেউ কারুর জন্যে ভাবে না এখানে, এতোটুকু দয়ামায়া দেখায় না কেউ। স্বার্থপরতা, নিচতা, ক্লেদ আর কখনো বা নিষ্ঠুরতা–এইসব নিয়েই আমাদের বাঁচা। তবু থেকে যায় বাঁচার ইচ্ছে!

যে বারান্দায় শুভা দাঁড়িয়ে সেটা সোজাসুজি ধরে রেখেছে সামনের রাস্তাটাকে। সরল রেখায় সোজাসুজি বলেই বহুদূর পর্যন্ত দেখতে অসুবিধে হয় না কোনো। কাল যেমন দেখেছিল, কিংবা তারও আগে একদিন, শুভা দেখল ভোরের রাস্তায় নিঃসঙ্গ ও ছাড়া ছাড়া আরও কোনো মানুষের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। জানেন না, কোনোদিন বুঝতেও পারবেন না হয়তো, যে আর একজন গভীর চোখে লক্ষ্য রাখছে তাঁর ওপর। আর একটু পরে যখন আরও দূরে ক্রমশ মিলিয়ে গেলেন তিনি, আর শুভার চোখে লেগে থাকল শুধু তাঁর যাওয়ার পথটুকু, তখনও এই একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল শুভা। ভাবল, ভোরে বেড়ানোর ইচ্ছা থেকেই এখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহদূর বিস্তৃত মাঠের পাশের রাস্তায়। এক রাস্তা থেকে চলে যাচ্ছেন অন্য রাস্তায়। মাঠের মাঝখানে সরোবর, ঘোড়ার খুরের আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। জলজ গন্ধ মিশে এখন আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে হাওয়া। স্নিগ্ধতা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁকে, যাঁরা তাঁর কাছাকাছি, তাঁদেরও। প্রত্যূষের এই স্নিগ্ধ সংস্পর্শের যদি কোনো মানে থাকে, তা কি সকলের মনেই সঞ্চারিত হয় একই ভাবে? সকলেরই কি ইচ্ছে করে অভ্যাসে আক্রান্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে অন্যরকম হই একটু? যা আছি তার চেয়ে একটু বেশি পবিত্র–খুঁজে নিই বেঁচে থাকার আর কোনো উপলক্ষ?

প্রশ্নগুলো এমনিই চলে আসে মনে। যদিও শুভা জানে না এসব প্রশ্নের সত্যিই কোনো মানে আছে কি না। নাকি এগুলো শুধুই তার অলস মনের ভাবনা–ভাবতে ভালো লাগে বলেই ইচ্ছে করে ভাবতে! বাস্তবিক তার ও তার চারপাশের যে জীবন, তার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কোথায়!

শুভা দাঁড়িয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকল সেই রাস্তার দিকে, যেখান দিয়ে একটু আগেই হেঁটে গেছেন তিনি। যে রাস্তা দিয়ে আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো ফিরতে দেখা যাবে তাঁকে। সে অপেক্ষা করবে। দেখবে। এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় বস্তুত এইভাবে চেয়ে থাকার জন্যেই জন্ম হয়েছিল তার। এইভাবেই চেয়ে থাকবে।

চিন্তা বিচ্ছিন্ন হলো। অনুমানে বুঝল একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ঘাম আর অরণ্যের মিশ্র গন্ধ তার শরীরে, কিছু বা রাত্রিরও।

চোখ তুলে লোকটির দিকে তাকাল শুভা।

সরোজের মুখেই লেখা থাকে 'স্বামী' কথাটা। বলল, 'কী ব্যাপার! এই ভোরে উঠে এসেছ?'

'দেখছি।'

'কী?'

'ভোর হওয়া–'

শুভার কথায় অনিশ্চয়তা নেই কোনো। শুধু সামান্য কেঁপে গেল তার গলা। আর কিছু নয়।

তবু খটকা লাগল সরোজের। নিজেও চোখ তুলে তাকায় সে। প্রথমে আকাশে–অপর্যাপ্ত ধূসরের মাঝখান থেকে যেখানে ক্রমশ বিচ্ছুরিত হচ্ছে অস্পষ্ট লালের উজ্জ্বলতা। তারপর পাম গাছটার দিকে। কসাইয়ের দোকানের উচ্ছিষ্ট মুখে একটা চিল খুব নিচু দিয়ে উড়তে উড়তে চলে আসে সেখানে। খাঁজখোঁজে নিজেকে লুকোবার জন্য। ডানা মুড়ে বসার পর এক হয়ে মিশে যায় গাছের সঙ্গে।

'ভোর তো রোজই হয়।' শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় সরোজ বলল, 'এতো দেখার আছেটা কি!'

শুভা বুঝতে পারে না তার বিস্ময় কোথায়, কিংবা কীভাবে জবাব দেবে সরোজের প্রশ্নের। সে কি সত্যিই জানে কেন তার অপেক্ষা, কেনই বা চেয়ে থাকা। চকিত চোখ তুলে সে তাকায় একটিই দিকে–যেখান দিয়ে একটু আগেই হেঁটে গেছেন তিনি। মনে পড়ে স্বপ্ন, ভারী সুন্দর ছিল তাঁর যাওয়া। মনে হয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একটিই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আনমনে সরোজের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে শুভা। বিশাল চেহারা লোকটার। বুক ভর্তি ঘন রোম মিশে আছে ঘনবদ্ধ পেশীর সঙ্গে। আন্ডারওয়্যারের স্বল্পতার নিচে তার প্রবল জানুদ্বয় উঁচু হয়ে নেমে এসেছে কঠিন হাঁটুর দিকে–রোমশ পা দু'টি কাঠের গুঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে আঙুল ছড়ানো পায়ের পাতার ওপর। হঠাৎ মনে পড়ে, এই পায়ে প্যাডেলে একটু চাপ দিলেই ভটভট করে ওঠে সরোজের রাগী মোটরবাইক–বাতাস কেটে উড়তে থাকে গাঁ গাঁ করে। ব্যাংক লুঠ না করেও সে ফিরে আসে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে, মদের বোতল আর থিকথিকে ঝাল মেশানো মাংস নিয়ে। শুভাকে আদর করে, ভালোবাসা দেয়।

শুভা বুঝতে পারে না তার বিস্ময় কোথায়। হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের জন্যে কেনই বা ভারী হতে থাকে বুক!

লোকটা হাসে। আস্তে থাবা রাখে তার পিঠে। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় তাকে। মুখের ওপর নিঃশ্বাসের বাসী গন্ধ ছড়িয়ে তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে যেতে বলে, 'তুমি বড়ো রোমান্টিক!'

॥ ২ ॥

শুভা দেখল, প্যাডেলে পা দেবার আগে দু'হাতে তার রাগী মোটর বাইকের হ্যান্ডেল চেপে ধরেছে সরোজ। মাথা, মুখ ঝুঁকিয়ে এনেছে শরীরের যত শক্তি সব একাগ্র করবার জন্যে। দৃশ্যটা অচেনা নয়। রাতের অন্ধকার যে মুখ দেখা যায় না, দেখা যায় না পেশীবহুল যে শরীরটার প্রচণ্ড একাগ্রতা, দিনের আলোয় সেই মুখ ও শারীরিক একাগ্রতা লক্ষ্য করে সে তন্ময় হয়ে, ঠোঁটে দাঁত ফুটিয়ে। সবল পায়ের একটি ঝাঁকু-নিতেই চেঁচিয়ে উঠল তার বাইক। লাফিয়ে সীটে বসার আগে জীন শার্টের পকেট থেকে সানগ্লাসটা বের করে চোখে এঁটে নিল সরোজ। তারপর হ্যান্ডেল চেপে ধরে দুরন্ত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুভা দেখল সরোজ ছুটে যাচ্ছে, তার আগে আগে ছুটছে বাইকের ভট্‌ভট্, গাঁ গাঁ শব্দ। রাস্তার ওপর থেকে সভয়ে সরে যাচ্ছে মানুষজন, ব্যস্তভাবে কেউ কেউ উঠে পড়ছে ফুটপাথে। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে যায় লোকটা। নীলে কালোয় মেশা একটি আকৃতি ছোট থেকে ছোট হতে হতে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায় আরও দূর রাস্তায়। শুধু পোড়া পেট্রলের গন্ধ আর একটা রাগী শব্দ ঘুরে বেড়ায় হাওয়ায়। অনেকক্ষণ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে মাথার মধ্যে। চোখ ফেরাতে পারে না শুভা।

চারদিকের ব্যস্ততায় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের বাঁচা। ডানদিক থেকে বাঁ দিকে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ক্রমাগত ছুটে চলেছে মানুষ। লম্বা মানুষ, বেঁটে মানুষ, রোগা মানুষ, মোটা মানুষ, নীল মানুষ এবং আরও বিভিন্ন রঙের মানুষ–মুখের আদলে ধরা যায় না তাদের, শুধু পোশাকেই চিনিয়ে দেয় কে কেমন। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে এবং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বিভিন্ন শব্দ তুলে ছোটাছুটি করে বাস আর ট্যাকসি আর মোটর

আর স্কুটার আর সাইকেল। কে কোথায় যায়, কী তাদের ইচ্ছে বোঝা যায় না ঠিক। শুধু মনে হয় সমবেতভাবে টিকে থাকছে কিন্তু একটা। ধাঁধা লেগে থাকে চোখে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চমকে উঠল শুভা। দৃষ্টি একাগ্র থাকলেও সে কি দেখছিল না কিছু!

হঠাৎ দেখল, অন্য মানুষ আসছেন। অদ্ভুত শান্ত তাঁর হাঁটার ভঙ্গি। ভিড় ও শব্দের মাঝখানে থেকেও সাবধানে আগলে রেখেছেন নিজেকে। আজ তাঁর পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। রোদ্দুর চিকচিক করছে কপালে। আসতে আসতেই চোখ তুলে তাকালেন ওপরে। যেভাবে তাকান তিনি, অদ্ভুত নিরপেক্ষতা ছুঁয়ে যায় আশপাশের দৃশ্য। যার মধ্যে শুভাও থাকে হয়তো। এইভাবে আস্তে আস্তে দৃশ্যের বাইরে চলে যান তিনি।

কিন্তু আজ বোধহয় অন্যরকম কিছু হবে।

শুভা দেখল, আসতে আসতেই থেমে দাঁড়ালেন তিনি। ঠিক সেখানে, যেখান থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাকে। তাকালেন তারই দিকে। এখান থেকে দেখা যায় তাঁর সুস্মিত মুখ, তাঁর মায়াময় দুটি চোখ। ওই হাসি ও দৃষ্টি লজ্জায় কাঁপিয়ে দিল শুভাকে। এ যাবৎ অপরিচিত আনন্দে চোখ বন্ধ করল সে।

মুহূর্ত পরে যখন চোখ খুলল, দেখল কেউ নেই কোথাও। যেমন ছিল তেমনি, তাদের নিজস্ব রূপ নিয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলি হুবহু ফিরে এলো তার কাছে।

তাহলে কি সে ভুল দেখেছিল? না কি এতোদিনের ইচ্ছেটাকে আজই ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পেরেছিল সে–নিঃশব্দ পায়ে ক্রমশ উঠে আসছেন তিনি–শুভার কাছাকাছি! এইভাবে উঠে আসার যেটুকু সময় লাগে তা লাগবেই, তার পরেই সাড়া পড়বে দরজায়!

বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে এলো শুভা। সে যেমন তেমনই থাকল, শুধু শাড়ির আঁচল বুলিয়ে মুছে নিল ঘামে আদ্র মুখ। টের পেল শরীরের সমস্ত আকুলতা ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে হাতের শিরায়, মধুর এক চাঞ্চল্য শিরশির করছে আঙুলের ডগায়। বন্ধ্যাত্বের নিঃশব্দ অনুভূতি নিয়ে সে এই হাত আর আঙুলের সমগ্র আগ্রহ নিয়ে নব ঘোরাবে দরজার। তিনি নিশ্চয়ই জানেন একটু আগে মোটরবাইকের রাগী শব্দ তুলে, সানগ্লাস চোখে বেরিয়ে গেছে সরোজ। ফিরবে সেই সন্ধ্যে পেরিয়ে, রাতে। তার আগের ঘন্টার পর ঘন্টা সময় শুভার একার। বহুদিন হলো এইভাবেই আছে সে–নিঃশ্বাসে সময়ের ভার আর বন্ধ্যাত্বের নিঃশব্দ অনুভূতি নিয়ে, সারাক্ষণের সংশয় নিয়ে, অপেক্ষায়। যে আসবে তার জন্যে কোনো অভাব হবে না সময়ের।

দরজায় শব্দ হতেই নিজের ছড়িয়ে যাওয়া অংশগুলোকে জড়ো করে নিল শুভা। কিছু বা অসংলগ্ন ছুটে গেল দরজার দিকে। কাঁপা হাতে দরজা খুলল।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি অদ্ভুত যুবক। জিনস্ আর রঙিন শার্ট তাদের পরনে। লম্বা ও চওড়ায় ঠিক ততোখানি যতোটা হলে দরজায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আড়াল করে দেওয়া যায় শুভাকে। যে মাঝখানে তার চোখে পারদ লাগানো সানগ্লাস। যে বাঁদিকে তার ঠোঁটে জ্বলছে সিগারেট। যে ডানদিকে তার হাতের কব্জিতে স্টিলের বালা। ঘাড় পর্যন্ত নামা এলোমেলো চুলে আর চামড়ার খসখসে রঙে সান্ত্বনা নেই কোনো। চাপা হাসি লেগে আছে মুখে।

যেভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে শুভা, সেইভাবেই এখানেও দাঁড়িয়ে থাকল চিত্রার্পিত। শুধু দৃষ্টিতে ঢুকে পড়ল ভয়, ঠোঁট-দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে।

'দাদা এখন বাড়িতে নেই, আমরা জানি।' সানগ্লাস বলল, 'বউদিকে একা পাবো জেনেই চলে এলাম–'

শুভা বুঝতে পারল না এসব কথার মানে কী। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে শংকিত গলায় সে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনারা?'

'চেনেন না আমাদের!' বালা–পরা হাত বলল, 'সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে বারান্দায়, অথচ আমাদেরই চেনেন না। চুলবুলে চোখে কী দ্যাখেন মাইরি!'

ওদের মুখ চোখের রুক্ষতাই বুঝিয়ে দেয় মতলব ভালো নয়। এতক্ষণের ধারণা থেকে নিজেকে টেনে বের করল শুভা। যতোটা সম্ভব কঠিন গলায় বলল, 'কেন এসেছেন। কী চান?'

সিগারেট মুখে যুবকটি এবার ঢুকে পড়ল ভিতরে। শুভার সামনেই জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিল মেঝেয়। অপরিচ্ছন্ন জুতোর তলায় ঘষতে লাগল সেটা–সেইভাবেই বলল, 'আমরা পাড়ার ছেলে। দাদারা যখন বাইরে যায় তখন আমরাই পাহারা দিই। আশপাশে বদলোক কি কম। আমরা চোখ রাখি কে কোথায় আসছে। কে কোথায় যাচ্ছে। সব বিনে পয়সায়––মাগনায়––'

সিগারেট মুখের যুবকটি মুখে আর সিগারেট নেই এখন। শুধু ঠোঁটে লেগে আছে সাদা কাগজের টুকরো। ইশারায় অন্য দু'জনকে ভিতরে ডেকে নিল সে। শুভার মনে হলো তার হাঁটুতে জোর নেই কোনো। এইবার পড়ে যাবে।

সানগ্লাস হাসতে লাগল। কিংবা তা চশমার পারদ। শুভাকে দেখতে দেখতেই বলল, 'এক বোতল মদ চাই–হুইস্কি–'

'মদ'! কোনোক্রমে বলল শুভা, 'আমি কোথায় পাবো!'

'বাড়িতেই। শুধু একটা বোতল।' বালা–পরা হাত বলল, 'কাল রাত্রে অনেকগুলো নিয়ে এসেছে দাদা। আমরা দেখেছি–'

সোফায় বসে পড়ল সে। অন্য দু'জনেও। সানগ্লাস বলল, 'প্লীজ! দাদাকে বলবেন না কিন্তু––'

সামান্য ক্ষয়ে যায় শুভা। সময়েও তবু ভার কমে না বুকের। মন খারাপে ঢুকে পড়ে বিষণ্ণতা। টের পায় ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে দিন। রাত বড়ো হচ্ছে ক্রমশ। গাঢ় কুয়াশার ভিতর দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দে। এরকম প্রায়ই। কে যায়? প্রশ্নটা ছুঁয়ে থাকে তাকে। একটা সম্ভাবনায় চকিত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।

তারপর সবই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তখনো ভোর হয় না ভালো করে। আলোয় বিচ্ছুরিত হবার আগে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে আকাশ–রাতের ঘুমে যে পাশ ফিরবে ক্লান্তিতে, তার জন্যে রেখে যায় আরও একটু সময়। তবু সময়ের আগেই ঘুম ভেঙে যায় শুভার। হাই ওঠে। আর ঘুম আসে না চোখে। আস্তে আস্তে উঠে আসে বারান্দায়।

দ্যাখে, নিঃশব্দ ভ্রমণে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ একটু বা ক্লান্ত, একটু বা বিস্মৃত। তাঁর চলে যাওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে খরখর করে উড়ে যায় এঁটো শালপাতা। থামে, উড়ে যায় আবার।

রোজই যে দেখা পায় তা নয়। মাঝে মাঝে। তখন মনে হয় এসব কেন হবে! তাহলে কি দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে তার? তাহলে কি দেরি হয়ে যাচ্ছে? না কি দৃষ্টি ও সময়ের মাঝখানে আছে আর কোনো রহস্য, যা সে ধরতে পারছে না ঠিকঠাক!

তাকিয়ে থাকতেই বালি এসে যায় শুভার চোখে।

ডানদিক থেকে বাঁদিকে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রমাগত যাতায়াত করে মানুষ ও গাড়ি। দৃশ্যে তারতম্য থাকে না কোনো। মাঝে মাঝে নাকে উঠে আসে পোড়া পেট্রলের গন্ধ। দূর থেকে আরও দূরে চলে যাওয়া একটা রাগী শব্দ ঝাঁ ঝাঁ করে মাথায়। বিস্তারিত দু'টি হাতে প্রবল পেশী সঞ্চারিত করে যেভাবে বাইকের হ্যান্ডেল চেপে ধরে সরোজ, ঠিক সেইভাবে অন্ধকারে ঝুঁকে আসে তার মুখের ওপর, ঝোড়ো হাওয়ার তাপ বয়ে যায় তার নিঃশ্বাসে। সেখানে টাকার গন্ধ, মদের গন্ধ, খুব ঝাল দিয়ে রান্না করা মাংসের গন্ধ। শুভা জানে, সরোজ যখন থাকে না, তখনো তার পাহারাদারেরা ঘুরে বেড়ায় আশপাশে।

সে তবু অপেক্ষা করে। সতর্ক চোখে, কান খাড়া করে।

৭৮ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে পশ্চিমী ছায়া পড়তে শুরু করার পর তিনি অনেক ব্যাপারেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারতেন না। পশ্চিমী ভাবধারার লোকজনদেরই গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে বসতেন। এইসব অরাজনৈতিক লোকেদের অনেককেই হঠাৎ বহিষ্কার করেছেন পরে। সিদ্ধার্থ রেডডিকে রাজীব খুব

বৃদ্ধদের কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায়!

পছন্দ করতেন, হায়দ্রাবাদে তিনি বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যেতে হল। এরপর ক্যাপ্টেন সতীশ শর্মা আমেথির দেখভাল শুরু করেছেন। ১৯৮২তে রাজনীতিতে প্রবেশের পর থেকে রাজীব নিজের সঙ্গীসাথীকে সাফারি পরিয়ে রাখতেন। এটা জনগণ কতটা নিয়েছে সেটা সংশয়ের! কমলাপতি ত্রিপাঠি, উমাশংকর দীক্ষিত, দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্রের মত অভিজ্ঞ লোকজনেরা রয়েছেন কোণে পড়ে। অরুণ সিং, অমিতাভ বচ্চন, শিবেন্দ্র বাহাদুর সিং, রমেশ ভাণ্ডারিরা উজ্জ্বল হয়ে এসেছেন, ছিটকেও গিয়েছেন।

রাজীব তাঁর দলে তাঁদেরই বড় বড় পদ দিয়েছেন, যাঁদের যোগ্যতা হলো তাঁরা রাজীবের গুণগানকীর্তন করেন। এদের মধ্যে কে·এন·সিং, এন·সি· চতুর্বেদী, রামরতন রাম এবং গুলাম নবী আজাদ বেশ প্রখ্যাত। এরা কয়েকবার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করে ফেলেছেনও। একবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী সংক্রান্ত বিষয়ে কে এন সিং ভারসাম্যহীন বক্তব্য রেখে অবস্থা তোলপাড় করে দেন। অবস্থা সামাল দিতে হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রীকে বোম্বাইয়ে ছুটে যেতে হয়েছিল। কে·এন সিং জানিয়েছিলেন মাধব রাও সিন্ধিয়ার পরিবারে রাজকীয় বিয়ের বিষয়টি

রোমি চোপড়া-র মত দুন স্কুল সহপাঠিদের আগমন

সাঁ সুসি অবকাশযাপনের রুচি

রাজীব তাঁর দলে তাঁদেরই বড় বড় পদ দিয়েছেন, যাঁদের যোগ্যতা হলো তাঁরা রাজীবের গুণগানকীর্তন করেন। এদের মধ্যে কে·এন·সি·, এন·সি· চতুর্বেদী, রামরতন রাম এবং গুলাম নবী আজাদ বেশ প্রখ্যাত।

সারাদেশে ঝড় তুলেছে। এবং তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হবে। আবার গুলাম নবী আজাদ এই তথ্যের বিরোধিতা করে তার বক্তব্যকে একরকম উড়িয়েই দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস দল মোতিলাল ভোরা, অর্জুন সিং এবং মাধব রাও সিন্ধিয়ার গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কংগ্রেসের লোকজন এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি মাধব রাও এর থেকে শত হাত দূরে থাকবে না তাকে বড় নেতা বলে স্বীকার করে নেবে? মহারাষ্ট্র আর রাজস্থানেও ব্যাপার এইরকমই। মজার ব্যাপার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং এর সঙ্গে রাজীবের যথেষ্ট খাতির রয়েছে।

ইতিমধ্যেই গুজব ধূমায়িত হয়েছে, তা হলো শীঘ্রই বীরবাহাদুরকে দিল্লিতে আনা হতে পারে। পাশাপাশি এও শোনা যাচ্ছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবে তার মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য এক আই·এ·এস· পাত্রকে প্রচুর পণ দিয়েছেন। কমলাপতি ত্রিপাঠীর সমর্থন রাজীবের প্রতি সুনিশ্চিত কারণ লোকপতি ত্রিপাঠীকে মুখ্যমন্ত্রী করার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে বহুদিন ধরেই সুপ্ত রয়েছে। তবে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতে, দল ও রাজীব গান্ধীর কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেক রাজ্যের কংগ্রেসিদেরই নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলা দরকার। ওদিকে উড়িষ্যার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়ক তাঁর হটিয়ে দেবার অপেক্ষাই করছেন একরকম আর বিহারে তো জগন্নাথ মিশ্র রোজই দুবের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে চলেছেন। এ সময় রাজীবের হাবভাবও আক্রমণাত্মক—বোধহয় তিনি এর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন! পোড় খাওয়া রাজনীতিকরা অবশ্য রাজীবের আচরণের নিন্দা করতে ছাড়ছেন না। তাদের মতে, রাজীব যেভাবে যে ধরনের উঠতি নব্যবাবুগোছের পরামর্শ দাতাদের নিয়ে চলছেন, সেটা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ঘরানায় গ্রহণযোগ্য হলেও ভারতের মাটিতে তা চলবে না। এই লোকগুলি কোনভাবে রাজনৈতিক যোগ্যতার অধিকারী নন। বর্ষীয়ান নেতাদের ভাবনার বিষয় হলো এই বছর রাজীব কি কংগ্রেসকে আবার এক করতে পারবেন, না পশ্চিমী কায়দায় শিক্ষিত তাঁর পরামর্শদাতাদের রবরবাই বজায় থাকবে?

মজার গল্প

সংসদ সদস্য স্যাম পিত্রোদা সম্পর্কে একটি মজার গল্প চালু আছে। স্যাম একজন ইলেকট্রনিকস ও টেলিকম্যুনিকেশন বিশেষজ্ঞ। এই কারণে রাজীব তাকে ভারতে নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেন। রাজীবের নির্দেশেই পিত্রোদা দলের নেতাদের অপদার্থতা ও যোগ্যতা প্রমাণের জন্য একটি স্ট্যাটিসটিকাল পরিকল্পনা করে দলকে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে তিনি কম্পিউটার থেকে কিছু সূত্র বার করেন। রাজীব পিত্রোদাকে বলেন যে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই প্রকল্প বর্ষীয়ান নেতা উমাশংকর দীক্ষিতকে দেখিয়ে নিতে। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করেও পিত্রোদা তার সঙ্গে দেখা করতে সফল হলেন না। শোনা যায়, পিত্রোদা নামের মধ্যে বিদেশি বিদেশি গন্ধ থাকায় দীক্ষিত নাকি তাকে এড়িয়ে চলেছিলেন। আরো শোনা যায়, দলকে কোন বৈজ্ঞানিক সাহায্য করবেন, এটাও তাদের মনঃপুত হয়নি। পিত্রোদা যখন দীক্ষিতের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে অসফল হলেন, তখন তিনি রাজীবের কাছেই এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌছলো দীক্ষিতের কাছে। তারপর বৈঠকও হলো। দীক্ষিত পিত্রোদার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কথা শুনলেন এবং জানতে চাইলেন বোগাস সদস্যদের হটাবার উপায় আছে কি না। পিত্রোদার প্রজেক্টে এই বিষয়টি
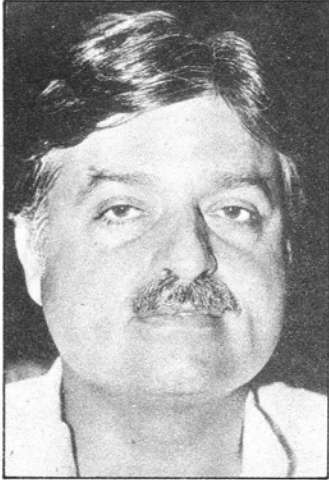
সতীশ শর্মা, পাইলট থেকে রাজনীতিতে, প্রধানমন্ত্রীর মতই

স্যাম পেট্রোডা, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ

মাখনলাল ফোতেদার, পরামর্শদাতা

ছিল না—ফলে উত্তরও দিতে পারেন নি। এরপরই দীক্ষিত নাকি সমস্ত কাগজপত্র নিজের দখলে রেখে দেন। এবং বলেন—এ ব্যাপারে তিনি রাজীবের সঙ্গেই কথা বলে নেবেন। ব্যাপারটি অর্ধসমাপ্ত হয়ে থাকে।

তবে দলের সদস্যদের ভাবনার বিষয় হলো রাজীব যে হারে দল চালাতে গিয়ে পশ্চিমী ট্রিটমেন্টের ওপর আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন, তাতে সমস্যা কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে। রাজীব অবশ্য প্রশাসনে আধুনিকীকরণ আনতে গিয়ে উন্নত দেশগুলির অনেক কিছুহ এদেশে চালাতে চাইছেন। বন্ধুদেশগুলির উন্নতিতে রাজীব বোধহয় চমৎকৃত।

রাজীব গান্ধীর দুন স্কুলে ও এয়ারলাইন্স এর বন্ধুদের পছন্দ করেন, কারণ তাদেরও রাজীবকে পছন্দ। আসলে মানুষ কোনভাবে ইন্দিরা গান্ধী বা নেহরুর অবদান ভুলতে পারছে না। এবং রাজীবের পক্ষেও সেই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। অনেকের মতে, যদি রাজীব গান্ধী ফোতেদার আর শর্মার উপর বেশি নির্ভর না করতেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য ছোট-বড়দের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন—সেক্ষেত্রে এধরনের বিক্ষোভ ধূমায়িত হতো না। কেউ কেউ একথাও মনে করছেন যে রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অরাজনৈতিক লোক নিয়োগ মোটেই শুভপ্রদ নয়। আবার শারদ পাওয়ারকে ধুমধাম করে দলে ফেরত নেওয়া হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে শারদ পাওয়ার দলে ফিরলেও তার পরিস্থিতি তেমন সুখকর নয়। আর পাওয়ারের সমর্থকেরা কয়েক সপ্তাহ আগে রাজীবের এক অনুচরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিন যে পাওয়ারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই অথবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাকে নিতে হবে। পাওয়ারের অভিযোগ তিনি রাজীবের সান্নিধ্য তেমনভাবে পান না। এতে স্পষ্টতই তাঁর ও তার সমর্থকদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে।
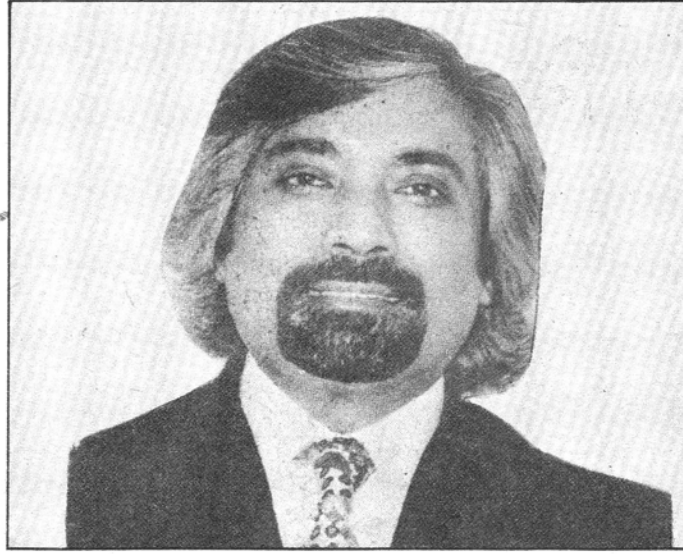
কিছু দিন ধরে নাকি দিল্লিতে গুজব ছড়িয়েছে যে পি·বি· নরসিমা রাও এবং নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। এ ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রীর অরাজনৈতিক বিভিন্ন কলাকৌশল লাগিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এ কারণেই বোধহয় রাজীব আজকাল তাদের সঙ্গে দেখা করছেন না। অর্জুন সিং সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

এই ধরনের দূরত্ববোধ থেকে ক্রমেই রাজীবের সঙ্গে দলের নেতা মন্ত্রীদের একটা বিরোধ গড়ে উঠছে।

এইসব বিরোধের পর থেকেই সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে রাজীব যদি অরাজনৈতিক লোকজনের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন, সেক্ষেত্রে সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে।

তবে আসন্ন দুটি নির্বাচন-এলাহাবাদ ও দিল্লি নির্বাচনের কথা ভেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচিত ওখানে এমন কিছু না করা, যাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। এবং নির্বাচন দুটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এবং এসবের দায়িত্ব তাদেরই দেওয়া দরকার, যাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনতা আমলে এমন অনেক ব্যক্তি ক্ষমতা পেয়েছিলেন, যাদের ন্যূনতম রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল না। আবার কোন কোন সংসদ সদস্য বলছেন যে সুদূর দিল্লিতে বসে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। আবার দেখুন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবে ও জানকীবল্লভ পট্টনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগের খামতি নেই—এ কারণে তাঁদের হটিয়ে দেবার জন্য রাজীবও মনে মনে প্রস্তুত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি দুর্নীতির জন্য এদের সর .ত হয়—সেক্ষেত্রে তো বহু মন্ত্রীকে একই কারণে সরাতে হয়। কিন্তু তিনি কি তা করতে পারবেন?
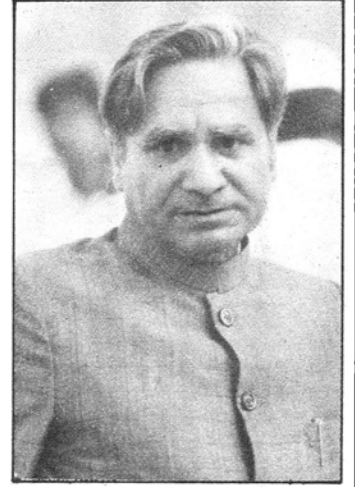
দলের সদস্যদের ভাবনার বিষয় হলো রাজীব যে হারে দল চালাতে গিয়ে পশ্চিমী ট্রিটমেন্টের ওপর আস্থাশীল হয়ে পড়েছেন, তাতে সমস্যা কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে।

সারিস্কার কংগ্রেসের বৈঠকে রাজীবের বাসনাকে চরিতার্থ করতে সকলেই বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কারণ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। তবে এই সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রাজীবকে এগোতে হবে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজীবের ভবিষ্যৎ। কারণ নিজের দলের কর্মীরা যদি ঠিক না থাকেন, সেক্ষেত্রে বিপদ আসতেই পারে। তার এখন ভাবা দরকার—এই পরিস্থিতির মূল কোথায়?

বিজয় দত্ত

আসাম কি আবার ভাগ হচ্ছে?

জাতিগত সমস্যায় এ পর্যন্ত চারবার ভাগ করা হয়েছে আসামকে। ফের আসামকে ভাগ করার দাবিতে তিন উপজাতি সংগঠন 'বোড়োল্যাণ্ড' দাবি করেছে। অন্যদিকে কারবি আলংরা তাদের জেলা নিয়ে পৃথক রাজ্য চায়। কাছাড়ও বাঙালি বিতাড়ন নিয়ে অ গ প সরকারকে ভাল চোখে দেখছে না। আসাম ভাঙার দাবির মুখে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল মহন্ত কি ভাবছেন? কংগ্রেস কি উপজাতি সংগঠনগুলির সঙ্গে কোন গোপন আঁতাত করেছে। আসামের বর্তমান আন্দোলনগুলি এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত ঘোষ।

অসম গণপরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর ডিসেম্বর মাসের বৈঠকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সভাপতি প্রফুল্ল মহন্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন, উপজাতি আন্দোলন যে পথেই এগোক না কেন, কোন অবস্থাতেই আসামকে আর ভাগ করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে উপজাতি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাংশে এবং কারবি আলং এলাকার জেলাগুলিতে দলীয় নিরিখে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ঠিক এর পরদিনই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের বৈঠকের পর সাধারণ সম্পাদক অতুল বোরা ঘোষণা করলেন,

প্রফুল্ল মহন্ত, সমস্যাক্লিষ্ট!

ছবি: সজল মুখার্জি

পঞ্চমবারের মত আসাম ভাঙার চক্রান্ত চলছে। এর আগে আসামকে চারবার ভাঙা হয়েছে। এখন লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপজাতিদের একাংশকে। দিল্লিতে আসাম বিরোধী মিছিলকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রিয় নেতারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে দেখা করে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের উৎসাহ। এ সবই চক্রান্তের অঙ্গ। আসু কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করবে না এসব।জাতিগত সমস্যার সুড়সুড়ি দিয়ে আর ভাঙতে দেওয়া হবে না আসামকে। প্রয়োজনে সর্বত্র প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। বাধা দেওয়া হবে বিচ্ছিন্নতাকামীদের।

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অসম গণপরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না, বিদেশি বাছাই, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, অভিবাসী সংশোধন আইন প্রভৃতি ইস্যুগুলিতে প্রায়শই তারা দ্বিমত পোষণ করতেন। কিন্তু আসামে পৃথক রাজ্য দাবীর প্রতিরোধে অ গ প এবং আসু এবার এককাট্টা হল।

কলকাতার প্রেসক্লাবে বক্তব্য রাখছেন 'আকসা' সভাপতি প্রদীপ দত্তরায় ছবি: হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্থ

কারবি আলং জেলার কারবি ছাত্ররা পৃথক রাজ্যের দাবীতে এ বছরের জানুয়ারি থেকেই আন্দোলন শুরু করেছিল পূর্ণোদ্যমে। কিন্তু ১৫ নভেম্বর আসামের তিন উপজাতি সংগঠন ইউনাইটেড ট্রাইবাল ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট, অল বোড়ো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং অল আসাম ট্রাইবাল উইমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশের ৬টি জেলা নিয়ে পৃথক রাজ্য বোড়োল্যাণ্ড গঠনের ডাক দিয়েছে। কিন্তু উক্ত সংগঠনগুলি এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। এই পৃথকরাজ্যের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তারা দক্ষিণ ব্রহ্মপুত্রের উপজাতিদের জন্য স্বশাসিত লখিমপুর, আলং জেলা কাউন্সিল গঠনের দাবী জানিয়েছে। আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা এ নিয়ে উক্ত তিনটি সংগঠনের তিন নেতা শ্রী দেউরি বোরা, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং শ্রীমতী প্রমীলা ব্রহ্ম প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে ওইসব দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে দিল্লিতে দু'হাজার উপজাতি নারী পুরুষের একটি সংগঠিত মিছিল বের করেছেন। তারা বলেন, পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদী। কিন্তু আমরাই তো অসমের আদি বাসিন্দা। আমরা তো আমাদের মাতৃভূমি মুক্ত করতে চাইব, আর এটাই স্বাভাবিক। অত্যাচারে, ছলনায় আর শোষণে ব্যতিব্যস্ত উপজাতিরা এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা অসমের অত্যাচারী অ গ প শাসকদের হাত থেকে মুক্তি চায়।

উপজাতি জঙ্গী ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংগঠন 'অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' বা 'আবসু'র সভাপতি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বললেন, 'ভারতবর্ষ আমাদের মা, জন্মভূমি। আমরা তো ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হতে চাই না, আমরা শুধু কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের দাবী করছি। তো, এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ এল কোত্থেকে? আসলে অসম গণপরিষদের নির্দেশে 'আসু'র এসব অপপ্রচার। নির্বাচনের আগে উপজাতিদের হাতে রাখতে অ গ প অনেক প্রতিশ্রুতির বন্যা ছুটিয়েছিল। নির্বাচনের পরে তার একটাও পালন করেনি। সব ব্যাপারে উপজাতিদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। মন্ত্রী সভাতে পর্যন্ত আমাদের উপজাতি সমাজের কোনও প্রতিনিধি নেই।

উপজাতি সংগঠনের মহিলা নেত্রী শ্রীমতী প্রমীলা ব্রহ্ম বললেন, বোড়োল্যাণ্ড গঠনের দাবী তো আমাদের আজকের দাবী নয়। এ দাবী আমরা করে আসছি ১৯৬৭ সাল থেকে। তখন তো আসু আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেনি। বরং বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের একাংশের সমর্থনও চেয়েছিল, অথচ আমাদের ভোট নিয়ে ক্ষমতা দখল করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরাংশের ছ'টি জেলায় ষাট শতাংশ উপজাতির কথা তারা ভুলে গেছে। তাই আর আপোষ নয়, এবার ক্রমেই আন্দোলন বাড়বে, যত দিন না পর্যন্ত 'বোড়োল্যাণ্ড' রাজ্য আদায় না হয়।

২০শে নভেম্বর ১৯৮৭। জংগী উপজাতি ছাত্র সংগঠন আবসুর নেতা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের ডাকে ২৬, ২৭, ২৮ নভেম্বর শুরু হয় রেল রোকো আন্দোলন। তারপর ৯,১০ ও ১১ ডিসেম্বর হয় জাতীয় সড়ক রোকো আন্দোলন। এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণের দুটি জেলা ও উত্তরের ছ'টি জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয়। শুরু হয় বিক্ষিপ্ত বন্ধ। অন্যদিকে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন সংলগ্ন এলাকায় এর পাল্টা আন্দোলনে নেমে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এখন দুই সংগঠনের চাপানউতোরে অগ্নিগর্ভ। আর অ গ প-র পক্ষে এই উপজাতি বিক্ষোভের মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভৃগুফুকন।

সম্প্রতি বরাক উপত্যকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে অসম গণপরিষদ শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে। এক তো বাঙালি বিতাড়নের আশংকা, দুই বরাক উপত্যকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে বাঙালিরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে ছাত্র সংস্থা 'আকসা'র নেতৃত্বে। অন্যদিকে আসু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বরাক উপত্যকার পক্ষে নয়। এ সম্পর্কে সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার সভাপতি শ্রী প্রদীপ দত্তরায় বলেন, আসামের বরাক উপত্যকায় একটি কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের গণদাবি এবং ঐ দাবী আদায়ের জন্য কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার ছাত্র যুবক এবং দাপামর বাসিন্দা লাগাতার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এই দাবীর যৌক্তিকতা কেন্দ্রিয় সরকারকে বহুবার বোঝানো হয়েছে এবং তা সরকারও স্বীকার করেছেন। কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে কেন্দ্রিয় শিক্ষা মন্ত্রী পর্যন্ত বরাকবাসীর এই গণদাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা দিল্লিতে ওই দাবী নিয়ে বহুবার দরবার করেছি। পেয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও ১৯৮৫ সালের নির্বাচনের সময় শিলচরে নির্বাচনী জনসভায় এবং ১৯৮৭তে মিজোরাম নির্বাচনের প্রচারে যাবার পথে শিলচর বিমান বন্দরে একই আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়েই প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আখ্যায়িত 'শান্তির দ্বীপ' বরাক উপত্যকায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি অক্ষুণ্ণ রেখেছি। ইতিমধ্যে অসম গণপরিষদ সরকার প্রস্তাবিত কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তেজপুরে স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন বলে প্রচার করা হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিদেশি হঠাও দাবীতে যে দীর্ঘসূত্রী ভ্রাতৃঘাতী আন্দোলন হয়েছিল, ওই উপত্যকার

কোন সংগঠনই কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন দাবীও জানায় নি। বিনা দাবীতে তাদের জন্য দুটি রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় দেওয়া হচ্ছে—এটা দুঃখজনক। অথচ বরাক উপত্যকার ২৮ লক্ষ মানুষ তাদের সন্তান সন্ততিদের উচ্চশিক্ষার পথ অক্ষুণ্ণ রাখার দাবীতে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। বিদেশি হঠাও আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যারা শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখেছে তাদের গণদাবিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বরাকবাসী কি শুধ 'শান্তির দ্বীপ' এর বাসিন্দা লেবেল এঁটেই বসে থাকবেন? দিল্লিশ্বরদের প্রতিশ্রুতি কি শুধু বৈতরণী পাড়ি দেবার কৌশল ছিল?—এসব প্রশ্ন বরাকবাসীকে ক্ষুব্ধ ও প্ররোচিত করে তুলেছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমাদের মনে এখন একটি ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কেন্দ্রিয় সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। এবং এভাবে দিল্লির টনক নড়বে না। এজন্য আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বরাকবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিপজ্জনক বহিঃপ্রকাশ হবার আগে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে শেষ বারের মত একটি স্মারকলিপি দিয়ে ৪ নভেম্বরের মধ্যে বরাকবাসীর গণদাবী পূরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানিয়েছি কেন্দ্রিয় বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মাধ্যমে, গত ৪ সেপ্টেম্বর। আজ পর্যন্ত কেন্দ্রিয় সরকার ওই আবেদন সম্পর্কে কোনও ধরনের উচ্চবাচ্য করেন নি। আমরা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে বরাকবাসীর এই দাবী আদায়ে আমরা আর 'শান্তির দ্বীপ'—এর তকমা এঁটে বসে থাকতে পারি না। ওই দাবী আদায়ে আমরা যে কোনও চরম ত্যাগের জন্য তৈরি। এ তো গেল কেন্দ্রিয় সরকারের কথা।

দিসপুরে ক্ষমতাসীন অ গ প সরকার বরাকবাসীর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেন—এখন তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এর কারণ হল বিদেশি হঠাও আন্দোলনে বরাকবাসীরা সামিল হননি। ভাষিক সংখ্যালঘুদের শায়েস্তা করার জন্য অ গ প সরকার মরিয়া হয়ে আছেন। কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে বেঁচে থাকার প্রতিটি পদক্ষেপে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বঞ্চিত। অসমীয়া ভাষায় কথা না বললেই সে বিদেশি। স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সার্টিফিকেট দিতে হয়রানি করা হচ্ছে। খেয়ালখুশি মত নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে শহর গ্রাম আর চা বাগানে। বংশানুক্রমে আসামে বসবাস করে কায়িক পরিশ্রম করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার পর তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য হয়রানি করা হচ্ছে। আর এসবের বিহিত না করে অ গ প সরকার বড় গলায় বলে চলেছেন কাউকে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে না। সরকারি পদে কর্মসংস্থানের বাছাই পরীক্ষায় অসমীয়া ভাষার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে বরাক

All Cachar-Karimganj Students' Association
CENTRAL COMMITTEE SILCHAR-788001, ASSAM.

[illegible] 4th Sept.,'87.

To
Shri Rajiv Gandhi,
[illegible] Prime Minister,
Govt. of India,
New Delhi.

Shri Priya Ranjan Das Munshi,
[illegible] Minister of State for Commerce,
Govt. of India,
[illegible] Silchar.

SUB: AN ULTIMATUM [illegible] BARAK VALLEY.

[illegible] people of Cachar and Karim[illegible] take the opportunity [illegible] submit [illegible] your immediate attention which [illegible] kept [illegible] for years together.

The background [illegible] this mass [illegible] has been explained to your honour [illegible] series [illegible] memorandums submitted and discussions held from time [illegible] The demand has both academic and material backing and we have tried to impress that the proposed Central University will not be [illegible] any [illegible] chauvinistic considerations. It will be a multi-lingual univ[illegible] which will go a long way in meeting the educational aspiration [illegible] of this valley but also of [illegible] Tripura.

Indira Gandhi did realise [illegible] reasons behind such a demand. Your honour too have also assured us of your sympathetic consideration. It would be pertinent [illegible] recall your electoral trip here in 1985 when you took [illegible] people of Barak valley into confidence and promised them of your reasoned consideration. Shri Priya Ranjan Das Munshi, Union Minister of State for Commerce, particularly restrained us from adopting an agitational course of action [illegible] our demand just on the

Contd..2.

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীতে 'আকসা'র স্মারকলিপি

উপত্যকায়। অথচ এই বরাক উপত্যকায় সরকারী ভাষা বাংলা। রাজ্যে বিশেষ পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে ৯৫২ জন কর্মীকে নিয়ে। তাতে এই উপত্যকার যুবকদের নিয়োগ করা হয়নি। গত ডিসেম্বরে অ গ প সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৮৭-র মার্চ পর্যন্ত কাছাড় জেলায় হাতে গোণা শিক্ষিত বেকার চাকরি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু ওই সময়ে বরাক উপত্যকার বাইরে থেকে আনা হয়েছে তিন গুণ বেশি কর্মী। অথচ গত ৩০ জুন পর্যন্ত শুধু কাছাড় জেলায় রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ৫৬ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ৩৯ হাজারই শিলচর মহকুমার। বরাক উপত্যকার স্কুলে বহু শিক্ষকের পদ শূন্য। শিলচর মেডিকেল কলেজে ৩২জন ডাক্তারের পদ শূন্য। দুই শ'রও বেশি নার্সের পদ শূন্য। বরাক উপত্যকার একমাত্র চিনিকল (কাছাড় সুগার মিল) আর্থিক দৈন্যতায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় কুড়ি হাজার লোক বেকার হয়ে পড়েছেন। রাস্তাঘাট যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ অর্থাভাবে। সার্বিক ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকাকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। রাজ্যে আইন শৃংখলার বালাই নেই বললেই চলে। একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটছে। হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে চলছে। রাজ্য সরকার নীরবদর্শকের ভূমিকায়। অসম সরকারের অ—সম আচরণ দৃষ্টিভঙ্গীর এই সামান্য কয়েকটি নজিরই বোধহয় যথেষ্ট হবে।

বরাকবাসী আপামর জনসাধারণের পিঠ এখন দেওয়ালে আটকে গেছে। একদিকে দিল্লির অ গ প তোষণ নীতি অন্যদিকে বরাকবাসীর প্রতি দিসপুরের বৈষম্যমূলক আচরণ—এই দুই তরফা আক্রমণে আমরা বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতির উত্তরণ কল্পে আমরা তৈরি হয়েছি। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের সৃষ্ট এই পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছে সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে। তা স্থির করতে আগামী ৫ নভেম্বর আকসা এক সভায় মিলিত হবে। বরাকবাসীর ন্যায্য দাবী আদায়ে সুদূরপ্রসারী লাগাতার আন্দোলনের বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে। ওই আন্দোলন রুখতে দিল্লির সি আর পি কিংবা অ গ প সরকারের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী—কারোরই দুঃসাহস হবে না।

প্রদীপ দত্তরায়ের এই ঘোষণাটি থেকে বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ বরাকের ছাত্ররাও ক্ষুব্ধ। এবং তাদের দাবী না মিটলে অশান্তির হুমকি। আসলে সারা আসামের ছাত্ররাই অশান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ায় হুমকি দিচ্ছে ক্রমাগত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে আবসু, কারবি আলং-এ কারবি ছাত্র ইউনিয়ন, বরাক উপত্যকায় আকসা—সকলেরই এক কথা—অ গ প সরকার অত্যাচারী। প্রয়োজনে শান্তির বাইরে থেকেও এদের সঙ্গে লড়াই হবে। আকসা তো শুধুমাত্র অশান্তির কথা বলেই ক্ষান্ত। তাদেরও দাবী একদিন উঠতে উঠতে স্বায়ত্তশাসন চেয়ে বসতে পারে। তহলে আসাম আর একক থাকবে কই? অসম গণপরিষদের কাণ্ডারীরা এখনও যদি সতর্ক না হন তাহলে তাঁদের কাজকর্মের দায়েই আসাম বিচ্ছিন্ন হবে। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তার অস্তিত্ব। এখন ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রবাহ ও ছাত্র আন্দোলনের দিকে নিছক তাকিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

শান্তিপর্ব

প্রফুল্ল রায়

॥ দশ ॥

কিরণকে দিল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়েছে দু'দিন আগে। সে এসেছিল দুপুরে। তার কয়েক ঘন্টা বাদে বেনারস থেকে স্বয়ং মুকুটনাথ মহেশ্বরীকে নিয়ে এসেছেন।

কিরণ আসার পর দুটো দিন অর্থাৎ আটচল্লিশটি ঘন্টা একরকম নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে বলা যায়। বিস্ফোরণ এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটে নি, যদিও কিরণের ধারণা যে কোনো মুহূর্তেই মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যাবে। এক একটি মিনিট কাটছে আর কিরণের স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হচ্ছে। ভাল করে সে খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না। সর্বক্ষণ প্রচণ্ড অস্বস্তি এবং টেনসানে তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাবে। এর চেয়ে মুকুটনাথ, মহেশ্বরী বা রেবতী যদি রিছু বলতেন সে তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলতে পারত। প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে সময় কাটানো যে কতটা কষ্টকর, প্রতি মুহূর্তে কিরণ টের পাচ্ছে।

এই দু'দিন বেশির ভাগ সময়টাই নিজের ঘরে কাটিয়ে দিয়েছে কিরণ। জানালার পাশে বা সামনের বারন্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ, পাখি, দূরের হাইওয়ে, ধরমপুরা টাউনের নানা দৃশ্য অথবা আরো দূরের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে বার বার প্রভাকরের মুখ যেন কোনো অদৃশ্য টি·ভি–র পর্দায় ফুটে উঠেছে। দিল্লীতে থাকতে শেষের দিকে রোজই প্রভাকরের সঙ্গে দেখা হ'ত। এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই দু'দিনেই মনে হচ্ছে, যেন কত বছর কি কত যুগ সে তাকে দেখে নি।

এর আটচল্লিশ ঘন্টায় রেবতী বা মুকুটনাথ একবারও তার ঘরে আসে নি। তবে সুষমা বার কয়েক দরজার সামনে এসে মুখ বাঁকিয়ে এমনভাবে তাকিয়েছে যাতে তার চোখ থেকে অসীম ঘৃণা, ঈর্ষা, রাগ ফেটে বেরিয়ে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই এই মেয়েটা তাকে ঈর্ষা করে আসছে। তার সঙ্গে সুষমার আজন্মের শত্রুতা। কিরণ যেন তাকে তার সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে অনবরত বঞ্চিত করে চলেছে।

সুষমা শুধু কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়েই চলে গেছে। তবে একটি কথাও বলে নি।

একমাত্র মহেশ্বরী একবার করে নিচে ডাকিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সদয়। কিরণকে কাছে বসিয়ে তার গালে মাথায় এবং পিঠে সস্নেহে শাঁসহীন কঙ্কালসার আঙুল বুলোতে বুলোতে দিল্লীর কথা, হোস্টেলের বন্ধুবান্ধব বা অধ্যাপিকাদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু যা শোনার জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তার ধারকাছ দিয়েও তিনি যান নি। অনাবশ্যক মধুর কথাবার্তাতেই সময় কাটিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুমার ঘরেই অবশ্য রেবতী, বশিষ্ঠনারায়ণ বা মুকুটনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কুলগুরু ছাড়া বাবা-মা কৃচিৎ দু-একটি কথা বলেছেন। যা বলেছেন তা থেকে আদৌ আঁচ পাওয়া যায় নি, আচমকা কেন, কোন উদ্দেশ্যে কিরণকে তাঁরা ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন।

দুটো দিন মারত্মক অনিশ্চয়তা এবং টেনসানে কাটাবার পর কিরণ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর অপেক্ষা করবে না। সরাসরি মুকুটনাথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন তোমরা কৌশলে, চতুর চাল চেলে এখানে ধরে এনেছ?

কিরণ জানে, এই প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে মুকুটনাথ রাগে এবং উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন। 'মিশ্র নিকেত'—এর তিনি একমাত্র ডিকটেটর। তাঁর মুখের ওপর এ পর্যন্ত কেউ কখনও কথা বলে নি, তাঁর কাজের প্রতিবাদ কেউ করে নি। এ বাড়িতে একটা অলিখিত নিয়ম আবহমান কাল চালু রয়েছে। সেটা এইরকম। 'মিশ্র নিকেত'—এর প্রধান পুরুষটি যা বলবে যা করবে তাতে নিঃশর্ত সায় দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষানুক্রমে মেয়েরা এখানে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

কিন্তু কিরণ কিছুতেই তা করবে না। এর ফলাফল যা—ই হোক না, কনফ্রনট্রেসন বা মুখোমুখি সংঘাতের জন্য এই আটচল্লিশ ঘন্টায় নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

তা ছাড়া এখানে থাকার আর উপায় নেই। দিল্লীতে তার প্রচুর কাজ। পরীক্ষাও এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাবার যে কারণটা সবচেয়ে প্রবল তা হল পেটের সেই ভ্রুণটি। প্রতিদিন সে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। এক আধ মাসের ভেতর কিরণের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে, সে গর্ভবতী।

তাড়াহুড়ো করে চলে আসার জন্য প্রভাকরের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে আসতে পারে নি কিরণ। তাকে একটা চিঠি লেখা খুবই দরকার। তার থেকেও যেটা বেশি জরুরী তা হল দিল্লীতে ফিরে যাওয়া।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আজ প্রভাকরকে চিঠি লিখতে বসেছে কিরণ। জানালা দিয়ে আকাশের একটা চৌকো টুকরো চোখে পড়ে। সেখানে ফাল্গুনের ঝলমলে রোদ আর ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশী 'শুগা'। এই বুনো টিয়ারা অঘ্রান পৌষে ধান পাকতে না পাকতেই দিগন্ত পেরিয়ে কোত্থেকে যেন ধরমপুরার চারপাশের শস্যক্ষেত্রগুলোতে চলে আসে। মাঠ থেকে ধান উঠে যাবার পরও কিছুদিন তারা এখানে থেকে যায়। তারপর শীতের দাপট কমে এলে ফাল্গুনের শুরু থেকেই তারা আবার ফিরে যেতে থাকে।

আকাশ, ফাল্গুনের অঢেল রোদ বা বুনো টিয়ার ঝাঁক, কোনো দিকেই লক্ষ ছিল না কিরণের। সে বিছানায় বসেই প্যাডের কাগজে চিঠি লিখে চলেছে কিন্তু দু-তিনটে লাইন লিখতে না লিখতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সুষমা। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কুটিল চোখে কিছুক্ষণ কিরণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। তারপর ডাকে, 'এই যে মেমসাব—'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। সুষমাকে এই মুহূর্তে সে এখানে আশা করে নি। মনে মনে নিজের এই ছোট বোনটিকে ভয় করে কিরণ, তাকে দেখলেই এক ধরনের অস্বস্তিতে তার ভেতরটা ভরে যায়।

কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবি?'
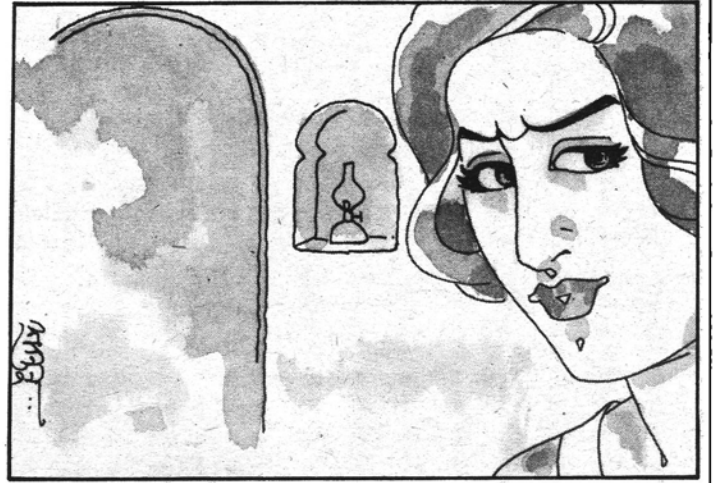
সুষমা বলে, 'নিচে দাদীর কামরায় তোকে ডাকছে—'

এ বাড়িতে আট দশটা নৌকর নৌকরনী থাকতে সুষমা নিজে কেন এই খবরটা দিতে এসেছে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। নিশ্চয়ই মহেশ্বরীর ঘরে গেলে আজ এমন কিছু ঘটবে যার ফলাফল কিরণের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। কিরণের লাঞ্ছনায় যে সব চেয়ে সুখী হয় সে সুষমা। সেই কারণেই সে এখানে ছুটে এসেছে।

কিরণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দাদীর ঘরে আমাকে কে যেতে বলেছে?'

সুষমা বলে, 'গেলেই দেখতে পাবি।'

একটু চিন্তা করে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কেন ডেকেছে জানিস?'

'জানি।' সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়েই চুপ করে যায় সুষমা।

'কেন?'

'বলব না। দের নেহী করনা মেমসাব। পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি করলে বাপুজি এসে চুলের ঝুঁটি ধরে তোকে নিয়ে যাবে।' বলে আর একটি মুহূর্তও দাঁড়ায় না সুষমা, দরজার কাছ থেকে একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যায়।

এটুকু জানা গেল, মহেশ্বরীর ঘরে মুকুটনাথ আছেন। আর কে কে আছে, অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। যে—ই থাক, মনে হচ্ছে কনফ্রনট্রেসনটা আজই হয়ে যাবে।

সুষমা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে না কিরণ। মনে মনে রণকৌশলটা সে স্থির করে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে প্যাড এবং কলমটা বিছানাতেই নামিয়ে রেখে সে ঘরের বাইরে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় মহেশ্বরীর ঘরের দিকে যেতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময়ই নেয়। মহেশ্বরী, মুকুটনাথ, রেবতী এবং কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ ছাড়া আর কেউ নেই। খানিকটা দূরে বারন্দার এক ধারে সুষমা দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই তাকে মহেশ্বরীর ঘরে যেতে বারণ করা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই হিংস্র ভঙ্গিতে সে কিরণের দিকে তাকায়, তবে এখন আর কিছু বলে না।

সুষমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিরণ মহেশ্বরীর ঘরের ভেতর চলে আসে। বশিষ্ঠনারায়ণকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের মুখ থমথমে, গম্ভীর। সে টের পায়, বিস্ফোরণটা আজ ঘটবেই।

কিরণ ঢুকতেই বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে কোমল স্বরে বলেন, 'আও, বেটী, ইঁহা বৈঠো—' মহেশ্বরীর সুবিশাল খাটের একটি কোণ দেখিয়ে দেন তিনি।

খাটের আরেক কোণে রেবতী বসে আছেন। একটু দূরে দু'টি চেয়ারে বসেছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ। কিরণ খাটের ধারে বসতেই মুকুটনাথ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসেন। কিরণ বুঝতে পারে, এই ঘরে যে উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেটা বাইরে

জানাজানি হোক, সেটা কেউ চান না।

স্নায়ুগুলো টান টান করে এক পলক সবাইকে লক্ষ করে কিরণ, তারপর অপেক্ষা করতে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণকে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে কিরণ। কোনো কারণেই তিনি উত্তেজিত হন না। পার্থিব সব ব্যাপারেই তাঁর অসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। সর্বক্ষণ তাঁর মুখে স্বর্গীয় মধুর হাসির একটি কোটিং লাগানো। হাত-পা বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই হাসিটি তাঁর জন্মসূত্রেই যেন পাওয়া।

প্রথম দু তিন মিনিট কেউ একটি কথাও বলেন না, 'মিশ্র নিকেত'–এর এই বিশাল ঘরটিতে অপার নৈঃশব্দ নেমে আসে। সমস্ত আবহাওয়াটাই অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

একসময় মুকুটনাথ এভাবে শুরু করেন, 'তোর কলেজ থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।'

পলকের জন্য কিরণের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা থমকে গিয়ে পরক্ষণেই প্রচণ্ড গতিতে লাফাতে থাকে। মনে হয় কয়েকশ তেজী ঘোড়া সেখানে ছুটে চলেছে।

কিরণ উত্তর দেয় না। সে বুঝতে পারে চিঠিটা লিখেছেন তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কী লিখেছেন তিনি? নিশ্চয়ই এমন কিছু মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে মুকুটনাথ খুবলাল উকীলকে দিল্লী পাঠিয়ে তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন। যতই বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করুক কিরণ কিংবা মনে মনে রণকৌশল ঠিক করে রাখুক, সে টের পায়–শ্বাস আটকে আসছে।

মুকুটনাথ ফের বলেন, 'চিঠিতে কী লিখেছে তুই জানিস না?'

কিরণ নীচু গলায় বলে, 'না।'

হঠাৎ ডান হাতটা কিরণের দিকে তুলে তর্জনী নাচাতে নাচাতে মুকুটনাথ কর্কশ গলায় বলে ওঠেন, 'মিশ্র বংশকে তুই নরকে নামিয়ে এনেছিস।'

তবে কি পেটের সেই ভ্রূণটার কথা জানিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল? কিন্তু প্রভাকর এবং সে ছাড়া এ খবর পৃথিবীর আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। তা হলে?

ক্ষীণ গলায় কিরণ বলে, 'তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না।'

স্বয়ংক্রিয় অদৃশ্য কোনো স্প্রিংয়ের ধাক্কায় যেন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। প্রচণ্ড রক্তচাপে তাঁর দুই চোখ যেন ফেটে যাবে। আরক্ত দৃষ্টিতে কিরণকে দেখতে দেখতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'বুঝতে পারছিস না?'

যে সাহসটুকু একটু আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেটা এবার ফিরে আসে কিরণের মধ্যে। এমনিতে মুকুটনাথের মস্তিষ্ক খুবই ঠাণ্ডা, তার ধাতে অসহিষ্ণুতা বলতে কিছু নেই। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের চিঠিতে বিস্ফোরণের এমন কিছু উপকরণ রয়েছে যাতে তাঁর সংযম বা ধৈর্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

রেবতী পারতপক্ষে সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকেন না। 'মিশ্র নিকেত'–এ তাঁর ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মতো। তিনি শুধু দেখেই যান, কখনও মন্তব্য করেন না। কিন্তু এবার বাড়ি আসার পর থেকেই কিরণ লক্ষ করেছে মায়ের মুখ সারাক্ষণ থমথমে, গম্ভীর। কিরণের কাছ থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন। তবে এই দু'দিন তাকে কিছুই বলেন নি।

এই মুহূর্তে তাঁর চিরকালের শান্ত নির্লিপ্ত স্বভাবটির কথা বুঝিবা ভুলেই গেলেন রেবতী। তীব্র, চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'তুই আমাদের সবার মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছিস। এই বংশে যা কোনোদিন ঘটে নি, তুই তাই করে বসলি।'

মায়ের এরকম উগ্র ভয়ঙ্কর চেহারা আগে কখনও দ্যাখে নি কিরণ। উত্তেজিত হতে গিয়েও নিজেকে দ্রুত সামলে নেয় সে। শান্ত মুখে বলে, 'তোমরা এভাবে বলছ কেন? আমি অন্যায় কিছু করিনি।'

আরক্ত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মুকুটনাথ। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে তিনি চেঁচাতে থাকেন, 'বেশরম লেড়কী, বংশের নাম ডুবিয়ে আবার সাফাই গাইছে, কিছু করি নি। তোকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলে দেব। এমন লেড়কীর দরকার নেই আমার।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে কী হবে, মুকুটনাথ যেভাবে চিৎকার করছেন তাতে আধ মাইল দূরের লোকও প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাবে।

এবার হাত তুলে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও মুকুটনাথ। এত উত্তেজনা তোমার শরীরের পক্ষে ভাল না–বহোত বুরা। যা বলার আস্তে আস্তে বল। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখতে হয়।'

কুলগুরুর কথায় কিছুটা কাজ হয়। গজ গজ করতে করতে আবার বসে পড়েন মুকুটনাথ।

বিছানার সঙ্গে প্রায় লেপটে মহেশ্বরীর কঙ্কালসার শরীর পড়ে আছে। এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েই ছিলেন তিনি। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে তীব্র শ্লেষের গলায় বলে উঠলেন, 'বানা, মেয়েকে মেমসাব বানা। যখনই মেয়েকে দিল্লী পাঠালি তখনই জানি, এরকম কিছু একটা ঘটবে। পাঠাতে বারণ করেছিলাম, কিন্তু তোরা আমার কথা কানে তুললি না।'

সেই সাত আট বছর বয়সে দিল্লীর কনভেন্টে নিয়ে গিয়ে যখন তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেই সময় আদৌ এ জাতীয় কথা মহেশ্বরী বলেছিলেন কিনা কিরণ মনে করতে পারে না। সে চোখের কোণ দিয়ে একবার ঠাকুমাকে দেখে নেয়।

আগের তুলনায় গলা অনেকটা নামিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'হাঁ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।' বলেই সোজাসুজি কিরণের চোখের দিকে তাকান, 'প্রভাকর কে?'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা খেলে যায় কিরণের। সে বুঝতে পারে, এতক্ষণ যা চলছিল সেটা ভূমিকা মাত্র। এবার আসল যুদ্ধটা শুরু হবে।

এত আকস্মিকভাবে মুকুটনাথ প্রশ্নটা করেছেন, যে এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিরণ। কী উত্তর দেবে যখন সে ভাবছে সেইসময় রুক্ষ ভঙ্গিতে আবার মুকুটনাথ বলেন, 'চুপ করে রইলি কেন? বল–'

কিরণ বুঝতে পারে, প্রিন্সিপ্যাল নিশ্চয়ই প্রভাকরের কথা জানিয়ে দিয়েছে। উত্তেজনাশূন্য মুখে বলে, 'একজন প্রফেসর।'

'তোদের কলেজের?'

'না। আমাদের কলেজের সবাই মহিলা প্রফেসর।'

'তবে?'

'অন্য কলেজের।'

'তার সঙ্গে তুই দিল্লীর বস্তিতে আর চারপাশের গাঁওগুলোতে ঘুরে বেড়াস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমরা সোসাল ওয়ার্ক করি।'

'সেটা কী?'

কী ধরনের কাজ তাদের অর্গানাইজেশন করে থাকে, সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় কিরণ।

দাঁতে দাঁত চেপে মুকুটনাথ বলেন, 'আমি কি তোকে সোসাল ওয়ার্কার হওয়ার জন্য দিল্লী পাঠিয়েছিলাম?'

কিরণ উত্তর দেয় না।

মুকুটনাথ কিন্তু কিরণকে ছাড়েন না। চাপা তীব্র গলায় বলেন, 'মুখ বুজে আছিস কেন? বাতা-বাতা। আভী, রাইট নাউ।'

কিরণ বলে, 'না। তুমি আমাকে মেমসাহেব বানাবার জন্যে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু–'

'কী?'

'প্রভাকরের সঙ্গে মেশার পর আমার মনে হয়েছে সোসাইটির ব্যাপারে আমার কিছু দায়িত্ব আছে।'

(চলবে)
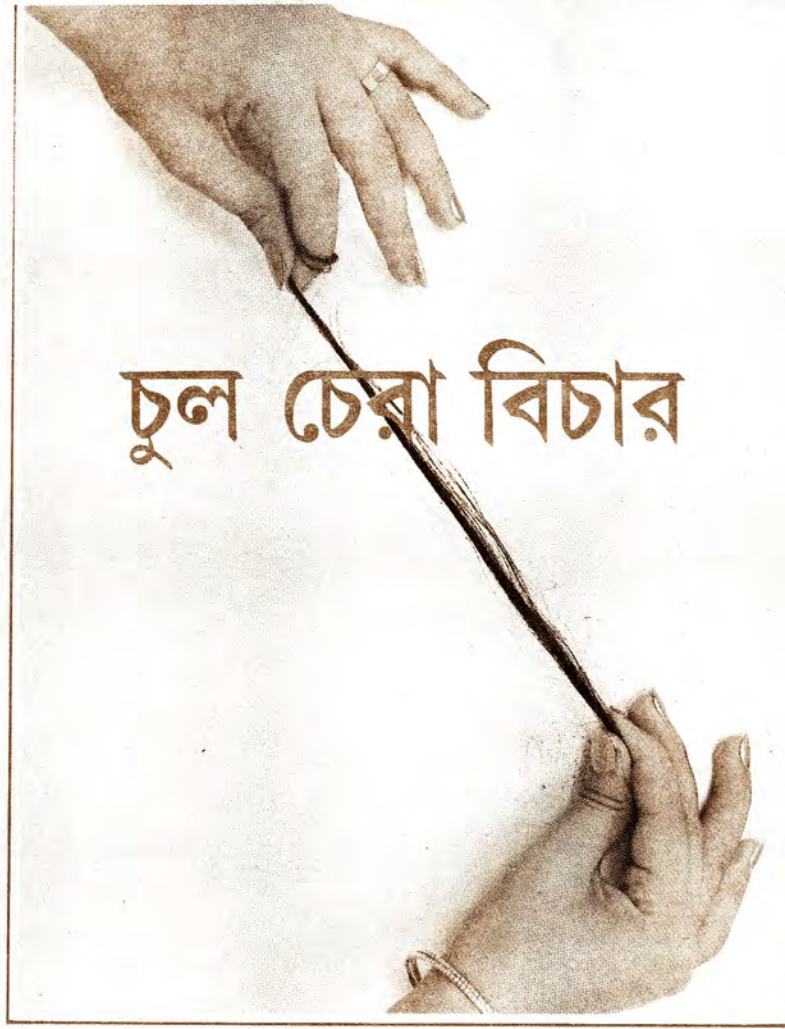
চুলের স্বাস্থ্য

মাথার চামড়ার নিচে গ্রন্থি থেকে তেল তৈরী হয় চুলের আহার যোগাতে। সে আহারে যখন ঘাটতি হয় তখনই বিপদ। চুল শুকনো ভঙ্গুর ও জৌলুসহীন হয়ে ওঠে। লম্বা চুলের ডগা চিরে যায়।
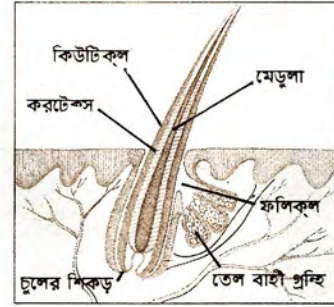
চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে ক্লিও পাট্রার আমল থেকে ক্যান্থারিস বিটল'এর রস ব্যবহার হয়ে আসছে। চুলের গোড়ায় ক্যান্থারাইডিন সযত্নে ম্যাসাজ করলে দেখবেন 'কিউটিক্‌ল' মসৃণ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, আরও ভিতরের করটেক্স' এ রঙ কোষের অভাব পূরণ করবে। চুলে পাক ধরবে না সহজে।

চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে আজও

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

বেঙ্গল কেমিক্যাল

(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

ARTIG 394

ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ : নতুনদের সম্ভাবনা
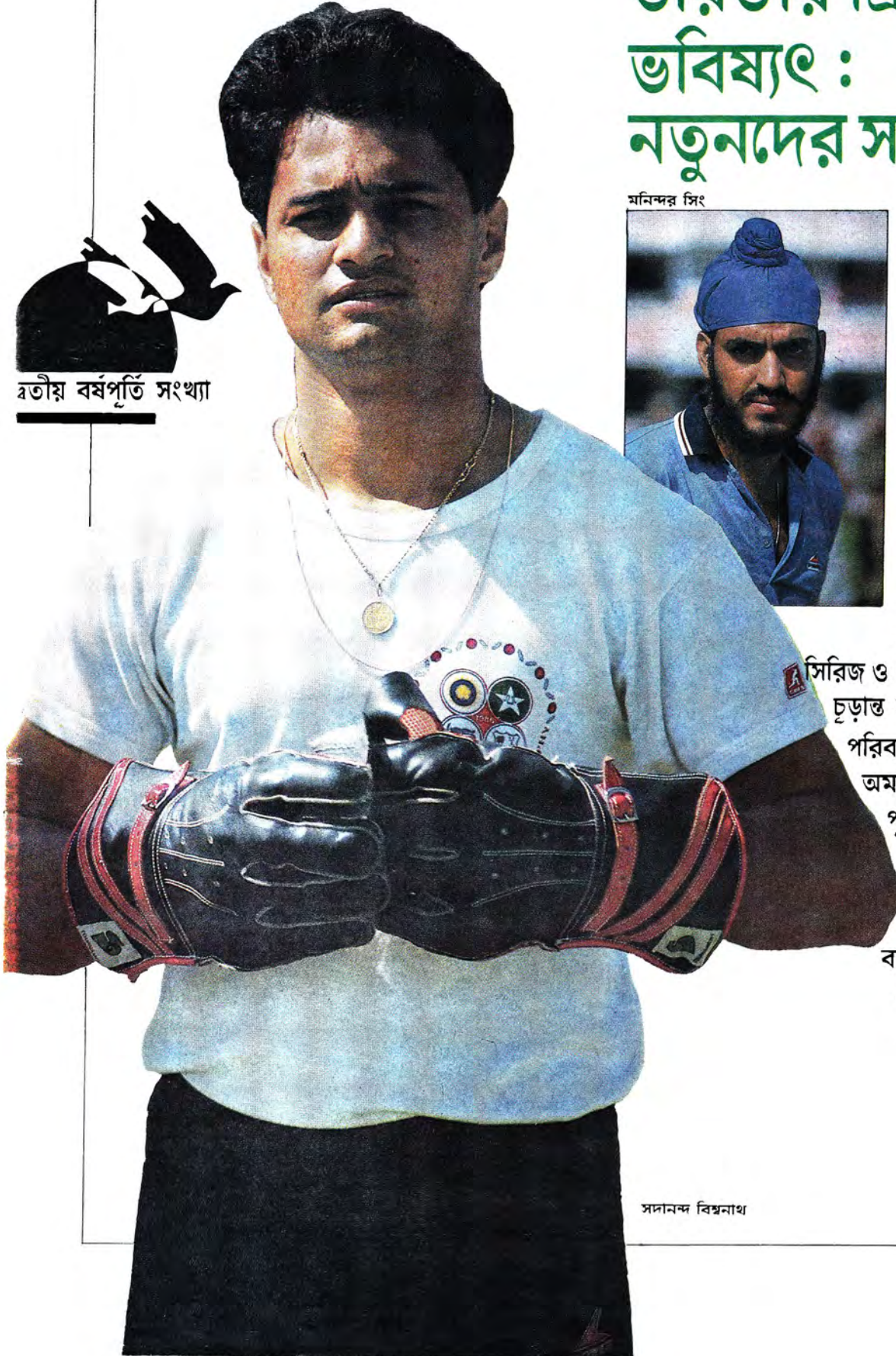
মনিন্দর সিং

কিরণ মোর
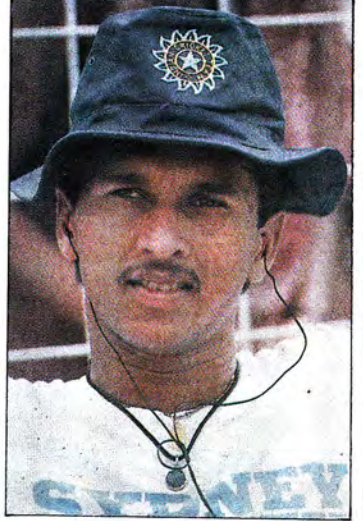
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ ও আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচে চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ ভারতীয় ক্রিকেটে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গাভাসকার, অমরনাথ, বেঙ্গসরকার-এঁর জায়গা পূরণ করার সম্ভাবনা কাদের? ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে শ্রীকান্তের উপযুক্ত সহযোদ্ধা কি নবাগতদের মধ্য থেকেই বাছা হবে? অরুণলাল, সিধু, নরেন্দ্র হিরোয়ানি ও সঞ্জয় মঞ্জরেকারের ভবিষ্যৎ কি? আলোকপাত করেছেন বিবেক আনন্দ।

সদানন্দ বিশ্বনাথ

ত বছরের ক্রিকেট মরশুম ভারতীয় ক্রিকেট থেকে দুটি জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে গেল–বিশ্বকাপ জয়ীর সম্মান আর সুনীল গাভাসকারকে। রিলায়েন্স কাপের সেমি ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের হাতে পরাজয়ে যদি বলা হয় ভারতীয় ক্রিকেট থেকে বিশ্বজয়ীর মুকুট কেড়ে নেওয়া হলো তো গাভাসকারের অবসর নেওয়া ভারতীয় ক্রিকেটের প্রায় অঙ্গচ্ছেদের সামিল। চার বছর বাদে আবার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এক সুযোগ আসবে, কিন্তু আর একটা গাভাসকার আমরা কবে পাবো কে জানে!

গাভাসকারের বিদায়ের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা যুগের অবসান হলো। গত ১৭ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি।

শিবরামকৃষ্ণণ

লালচাঁদ রাজপুত

তাঁর যোগ্য সহযোগী ওপেনিং ব্যাটসম্যান খুঁজে বের করতে গিয়ে নতুন পুরনো কত রকম মুখকেই না দেখেছি আমরা আর এখন তো সেই গাভাসকার বিদায় নেওয়ায় ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান খোঁজার কাজ চলতেই থাকবে। অনেকে বলেন, কোন ক্রিকেটারই দলের জন্য অপরিহার্য নয় কারো জায়গা খালি থাকে না কিন্তু কোন একটি বিশেষ খেলোয়াড়ের অবসর গ্রহণের পর যে দল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা তো দেখা গেছে গ্রেগ চ্যাপেল যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া, অথবা ক্লাইভ লয়েড খেলা ছাড়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে। বিশ্বকাপের অব্যবহিত পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নাজেহাল হওয়া কি সেই কথা প্রমাণ করতে চলেছে আর একবার?

দেখে শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শুধু গাভাসকার নয়, অন্যান্য কয়েকজন যাদের শক্ত কাঠের ওপর ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য অসাফল্যের বোঝা চাপানো ছিল অনেকদিন তাদের প্রতিভাও অস্তাচলগামী। কপিল দেব, মহিন্দর অমরনাথ, দিলীপ বেঙ্গসরকারের জায়গা নেওয়ার জন্য নতুন খেলোয়াড়দের তৈরি হতে হবে। আরও বেশি করে সুযোগ দেওয়া দরকার নবজোত সিং সিধু, সঞ্জয় মঞ্জেরেকর, নরেন্দ্র হিরোয়ানি ও আর্শাদ আয়ুবের মত খেলোয়াড়দের। আনকোরা নতুনদের নিয়ে গড়া বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া টীমই তো জিতে নিয়ে গেল বিশ্বকাপ। আর বিশ্বকাপে পরাজয়, পাকিস্তান আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে নিজের মাটিতে সিরিজ খোয়ানোর পর ভারতীয় ক্রিকেটেরতো হারানোর আর কিছুই নেই।

নবজোত সিং সিধু ভারতীয় ক্রিকেটে নবীন ব্যাটসম্যানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। আগামী বছরগুলিতে ভারতীয় দলের ব্যাটিং–এর

আজাহার উদ্দিন ও রাজু কুলকার্নি

অরুণলাল

প্রধান দায়িত্ব হয়তো তাকেই বহন করতে হবে। সিধুকে অবশ্য পুরোপুরি নবাগত বলা যায় না। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতীয় দলের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিল সে কিন্তু আশানুরূপ ফল না দেখাতে পারায় বাদ দেওয়া হয় ওকে। আর এরপর কয়েক বছরের নিভৃত সাধনার পর আবার দেখা গেল ওকে রিলায়েন্স বিশ্বকাপে পরপর চারটি ম্যাচ এ ৫০–এর বেশি রান করতে। সারা পৃথিবী স্বীকার করল 'বিশ্বকাপের আবিষ্কার সিধু।' বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে রান সংগ্রহে

রমণ লাম্বা

সিধু ছিল দ্বিতীয়। সুনীল গাভাসকারের সংগ্রহ ৬টি ম্যাচে ৩০০ রান আর সিধুর ৫টি ম্যাচে ২৭৬ রান। নবজ্যোত সিং সিধু মারকুটে ব্যাটসম্যান নয়–প্রয়োজন মত রক্ষণাত্মক ব্যাটিংও করতে জানে। কিন্তু মনে হয় যেন ৫০–এর গণ্ডী পার হওয়ার পরই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সিধু, রিলায়েন্স কাপে বার বার দেখা গেছে অর্ধশতক হওয়ার পরই বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে আউট হয়ে ফিরে এসেছে প্যাভিলিয়নে। স্পিনবলের বিপক্ষে যেমনটি, পেস বলে এখনও ঠিক সড়গড় নয় নবজ্যোত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত সফরের সময় তার দীর্ঘ অসুস্থতা অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে। ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত অনেকে সন্দেহ করছেন জীবনের প্রথমেই জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে সিধুকে নাজেহাল হতে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলারদের সামনে। আর তার ফলেই তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষ হয়ে গেছিল চার বছরের জন্য। এবার নাকি সে জন্যই সে ইচ্ছে করেই খেলতে রাজী হচ্ছে না। অবশ্য এ ধরনের অভিযোগ বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তি নেই। এটা সত্যি জীবনের প্রথমেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের ভীষণ দ্রুতগতির বলের মুখোমুখি হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল সে। কিন্তু রিলায়েন্স কাপে দেখা গেছে সিধুর ব্যাটিং–এর টেকনিক ও টেম্পারমেন্টের অনেক উন্নতি হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক হল সঞ্জয় মঞ্জরেকরের। সাম্প্রতিক কালে রনজী ট্রফি-দলীপ ট্রফির খেলাগুলিতে

ডাবলু ডি· রমণ (দক্ষিণাঞ্চল)-এর উদিত ব্যাট্‌সম্যান

বি· অরুণ

মঞ্জরেকরের ব্যাটিং দেখে বোঝাই যাচ্ছিল জাতীয় দলের প্রবেশপথ তার সামনে বেশিদিন বন্ধ থাকবে না। পিতা এক কালের প্রখ্যাত ক্রিকেটার বিজয় মঞ্জরেকর এদেশের সফলতম ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন। বিশেষত ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলারদের বিপক্ষে তার রেকর্ড খুব ভালো তাই হয়ত নির্বাচকরা আশা করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নবাগতদের মধ্যে সঞ্জয় মঞ্জরেকরের সফল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। জীবনের প্রথম টেস্টেই আহত হলো সঞ্জয় উইনস্টন ডেভিসের বলে আর তার পরের কয়েকটি ম্যাচের জন্য বাতিল হয়ে গেল দল থেকে।

সঞ্জয়ের পক্ষে তার অভিষেকেই এই বিপর্যয় নি:সন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এর ফলে যে ওর মনোবল ভেঙ্গে যায় নি তার প্রমাণ দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের ম্যাচে। যদিও প্রথম প্রথম আশামতন ব্যাটিং করতে পারে নি, তবুও আঞ্চলিক খেলাগুলিতে ওর রেকর্ড দেখে আশা করা যায় আগামী দিনে টেস্ট ও একদিবসীয় দুরকম ম্যাচেই সঞ্জয় মঞ্জরেকরকে ব্যাট হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের ঘাঁটি সামলাতে দেখা যাবে।

ইদানীং বলা যাচ্ছিল ব্যাটিং লাইন-আপে ভারতীয় ক্রিকেট দল দুনিয়ার সেরা। এ দলে ১০ জন ক্রিকেটারই ভালো ব্যাটিং করতে পারে কিন্তু রিলায়েন্স বিশ্বকাপ ও তার পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ব্যাটিং কাগজে কলমে যত শক্তিশালী মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। উইকেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকার মত লোকের সঙ্গে সঙ্গে মনোবলেরও বড় অভাব এখানে। এক দিবসীয় ম্যাচগুলিতে দেখা যাচ্ছে নির্দ্ধারিত ৪৫ অথবা ৫০ ওভার টিকেই থাকতে পারছে না ভারতীয়রা, রান করা তো দূরের কথা। এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত যখন দেশের যোগ্য-অযোগ্য সব রকম বোলারকেই একবার দুবার করে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল কেউ যদি টিকে যায় এই ভেবে তখন ভালো ভালো ব্যাটসম্যানদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে যেন দলে ব্যাটসম্যানদের জায়গা রিজার্ভ। এখন শুরু হয়েছে ব্যাটসম্যান খোঁজা। মহীন্দর অমরনাথ এমন কি খরচের খাতা থেকে অংশুমান গাইকোয়াড়কে পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা হয়েছে দলে। অরুণলালও সুযোগ পেল ভারতীয় দলের ইনিংসের সূচনা করার গাভাসকার অবসর নেওয়ার পর। কিন্তু সফল হল কে?

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল গঠনের সময় নির্বাচকরা একজন অফ স্পিনার খুঁজছিলেন। পছন্দের পাল্লা শিবলাল যাদবের চেয়ে বেশি ঝুঁকল হায়দ্রাবাদেরই আর এক অফ স্পিনার আর্শাদ আয়ুবের দিকে। কারণ আয়ুব যাদবের চেয়ে ভালো ব্যাটসম্যান। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে রান করার দায়িত্ব নিতে পারবে সে। নির্বাচকদের হিসেব ভুল প্রমাণিত হয় নি। বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে হারতে বসেছে তখন
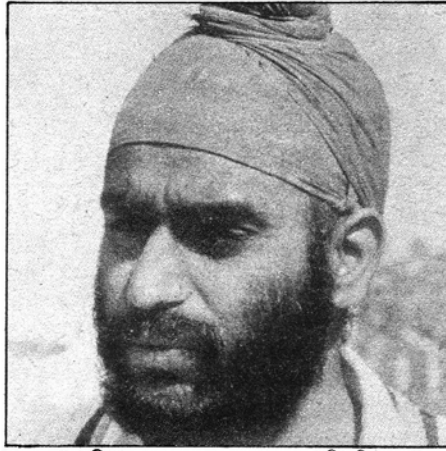
নবজ্যোত সিধু ছবি বিমল সাক্সেনা

বেঙ্গসরকার-আয়ুব জুটি দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচায়। সেবার আয়ুব এক ঘন্টা আট মিনিট ব্যাট করেছিল প্যাটারসনের ভয়ংকর বোলিং-এর সামনে। জীবনের প্রথম সিরিজে অভিজ্ঞতা কম হওয়া সত্ত্বেও আর্শাদের বোলিং সবার নজর কেড়েছে। এখনকার কেতাবিহীন একদিবসীয় ক্রিকেটের যুগে বিশুদ্ধ বোলারের চেয়ে অলরাউন্ডারের প্রয়োজন বেশি হয় আর সেক্ষেত্রে আর্শাদ আয়ুব তার সমগোত্রীয় অন্যান্য অফ স্পিনারদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

প্রসন্ন-বেদী-চন্দ্রশেখর-ভেঙ্কটরাঘবনের যুগ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের বোলিং-এ যে শূন্যতা এসেছে তা আর পূরণ হয় নি। বিশেষত স্পিন বিভাগে যে মনিন্দর সিং-কে দলের প্রধান অস্ত্র বলা হয় তাকে মাঝে মাঝেই দেখা যায় পিচ থেকে সাহায্য পেয়েও ভালো বল করতে পারছে না। গত পাকিস্তান সিরিজে ব্যাঙ্গালোরের শেষ টেস্টে যখন দেখা গেল পাকিস্তানী স্পিনাররা ভয়ংকর টার্নিং উইকেটকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের একের পর এক ফিরিয়ে দিচ্ছে তখন মনিন্দর সিংও রবি শাস্ত্রী অতিরিক্ত স্পিন করতে গিয়ে অজস্র রাণ দিয়ে দলকেই হারিয়ে দিল। অবশ্য রবি শাস্ত্রী বিপক্ষের ব্যাটসম্যানকে আউট করার চেয়ে তাকে বেঁধে রাখতে বেশি দক্ষ।

মাঝে মাঝে সফল আবার কখনও কখনও ব্যর্থ হয়েও মনিন্দর আর রবি বাঁহাতি স্পিন বোলার হিসাবে দলে নিজেদের জায়গা সুরক্ষিত করে রেখেছে। কিন্তু লেগ স্পিনার আর অফ স্পিনার খোঁজার কাজ এখনো শেষ হয়নি নির্বাচকদের। অনেক আশা জাগিয়ে এসেছিল শিবরামকৃষ্ণন। কিন্তু সেই যে সে ফর্ম হারালো তা আর ফিরে এলো না। অনেকে বলেন এমন কি শিবা নিজেও স্বীকার করেন যে তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যখন গাভাসকার অধিনায়ক ছিলেন। এরপর কপিল দেব দলনেতা হওয়ার পর শিবার ভালো পারফরম্যান্স দেখা যায় নি। তবুও শিবাকে সুযোগ কম দেওয়া হয়েছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না। গত মরশুমে দেশের বিভিন্ন ট্রফির খেলার লেগ স্পিনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছে মধ্যপ্রদেশের হরি হিরাওয়ানি। একটি দুর্বল রাজ্যের হয়ে খেলা সত্ত্বেও সে নির্বাচকদের নজর কেড়েছে বেশ কয়েকবার এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নিয়ে। রিলায়েন্স কাপে শিবরামকৃষ্ণন ব্যর্থ হওয়ার পর নির্বাচকরা যে হরিকে একবার সুযোগ দেবেন নিশ্চিত।

অফ স্পিনে কীর্তি আজাদ, গোপাল শর্মা, শিবলাল ও শেষে আর্শাদ যেমন আসা-যাওয়া করেছে ভারতীয় দলে অথবা লেগ স্পিনার শিবা যেমন কখনও ডাক পেয়েছে আর কখনও বা দ্বাদশ ব্যক্তি হয়ে ফিল্ডিং করেই সন্তুষ্ট থেকেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে বোলার নিয়ে এদেশের নির্বাচকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেইছে। কিন্তু যে ধরনের বোলার নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে তা হলো পেস বোলার। মদনলাল, রজার বিনী, বলবিন্দর সিং সান্ধু, ভারতী অরুণ, কুলকার্নি-কত জনকেই না দেখা গেছে গত কয়েক বছরে কিন্তু কপিল দেবের কাছাকাছি কেউ এগিয়ে আসতে পারে নি। চেতন শর্মা এদের মধ্যে একমাত্র বোলার যে বলের গতির জন্য ভারতীয় দলে মোটামুটি একটি স্থায়ী জায়গা পেয়েছে। কপিল চেতন শর্মাকে বলেন 'পকেট সাইজের ডায়নামো'। এদেশের দ্রুততম বোলার চেতন শর্মা। তবে বলে গতি যতটা লেংথ ততটা ভালো না। বলের কাজও ভাল নয়। ক্রমশ: উন্নতি করছে চেতন; ইদানীং দেখা যাচ্ছে সফলতার দিকে তুলনা করলে চেতন কপিল দেবের চেয়েও বেশি উইকেট পাচ্ছে। আগামী দিনে কপিল দেবের অনুপস্থিতিতে চেতন শর্মাকে ভারতীয় দলের আক্রমণ শুরু করতে হবে।

কপিল ও চেতন ছাড়া দলে যদি কোন তৃতীয় পেস বোলার নেওয়া হয় তো সে জায়গায় স্থান পাচ্ছে মনোজ প্রভাকর। প্রভাকর অনেকটা বিনি বা মদনলালের মত বোলার। গতি ততটা নেই কিন্তু উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে বল ভালো সুইং করায়। ব্যাটিং ভালো করে। একদিবসীয় ম্যাচে একটি সেঞ্চুরিও আছে ওর দখলে। টেস্টের চেয়ে এক দিবসীয় ম্যাচে প্রভাকরের বোলিং বেশি উপযোগী। নতুন যে পেস বোলার অনেকের নজর টেনেছে সে হলো সঞ্জীব শর্মা। তৃতীয় পেসারের জায়গায় সঞ্জীবকে লড়তে হবে মনোজের সাথে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাওয়ার জন্য।

বোলিং ব্যাটিং দুদিকেই বেশ কিছু প্রতিভাবান ক্রিকেটার উঠে আসছে। উইকেট কিপিং-এও তরুণ কিরণ মোরে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে দলে। সময়ে ঠিক মত সুযোগ আর উৎসাহ পেলে নবাগত প্রতিভাগুলি বিকশিত হতে পারবে। একবার ব্যর্থ হলেই বোর্ড তাকে বাতিল করলে অথবা নতুনদের অভিজ্ঞতা অর্জনের একেবারেই সুযোগ না দিলে ক্ষতি হবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নির্বাচকদের দূরদৃষ্টি আর সাহসের উপর।

ছবি: বিন্দু অরোরা

৬৫ পৃষ্ঠার পর

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগামের পক্ষে জনগণের সহানুভূতি লাভ করে এবং কাজাগাম বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে। এম জি আর হাসপাতাল থেকেই তাঁর মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন এবং প্রায় ২৩,০০০ ভোটে বিজয়ী হন।

১৯৬৯-এ তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাই হঠাৎ পরলোকগমন করেন–এম জি আর যাঁকে নিজের গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন (এম জি আর এর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে আন্নাদুরাই কবরের পাশেই সমাহিত করা হয়)। বস্তুত আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে করুণানিধি এবং বি আর নেদুনচেরিয়ান–এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এম জি আর করুণানিধিকে সমর্থন জানান। করুণানিধি মুখ্যমন্ত্রীর পদ পাওয়ার পর এম জি আর–কে পার্টির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৭১–এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে এম জি আর–এর প্রচারাভিযান তামিল জনগণের মনে নতুন আশা সঞ্চার করে এবং কামরাজের নেতৃত্ব কংগ্রেস (আ) মাত্র ১৬টি আসনে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। ২৬৪ সদস্য বিশিষ্ট তামিল বিধানসভায় দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম ১৮০টি আসন দখল করে। এম জি আর–এর সমর্থকেরা তাঁকে ক্যাবিনেটে নেওয়ার জন্য করুণানিধির কাছে সুপারিশ জানান। কিন্তু করুণানিধি' শর্ত আরোপ করেন যে, তাঁকে রাজনীতির কিংবা চিত্রজগৎ যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এম জি আর চিত্রজগৎ থেকে সরে আসতে অসম্মত হন। এখান থেকেই এই দুই নেতার মধ্যে মত বিরোধের সূত্রপাত। এরই মাঝে এম জি আর পার্টির সব সদস্যকে তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তির একটি তালিকা দিতে বলেন–যার দ্বারা দ্রষ্টাচার দমন করা সম্ভব হবে। কিন্তু পার্টি হাইকমাণ্ড এটিকে পার্টি বিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য করেন এবং তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

কিন্তু মনে হয় করুণানিধি ঠিক এম জি আরের জনসমর্থন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না কিংবা বিধান-সভায় নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বড় বেশী আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। করুণানিধির এই পদক্ষেপে অপমানিত এম জি আর এটিকে প্রেস্টিজ ইস্যু করে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নেমে আসেন। ১৯৭২–এ তিনি তাঁর গুরু আন্নাদুরাইয়ের নামে 'আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম' নামের একটি নতুন দল গঠন করেন। তিনি দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম–এর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একটি চার্জ–শীট গঠন করে প্রচুর জনসমর্থন নিয়ে তা রাজ্যপালের কাছে পেশ করার জন্য যান। কিন্তু রাজ্যপাল এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালে তিনি তা তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন এবং নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

এর মাঝে ১৯৭৩ সালে আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগামের সামনে আসে চরম পরীক্ষার মুহূর্ত–এবং এতে তাঁরা ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন। ডিন্ডিগুল লোকসভা উপ-নির্বাচনে আন্না দ্রাবিড় প্রার্থী কংগ্রেস–(আ)র চেয়ে প্রায় দেড় লক্ষ

এম জি আর-এর পর

ডিসেম্বরের সেই দিনটিতে তখনও ভোরের আলো ঠিকমত ফোটেনি–তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল এস এল খুরানা তাঁর লিমুজিনে চড়ে সরাসরি এসে পৌছলেন এম জি আর–এর বাসভবনে। এবং তারপরই হটলাইনের মারফৎ যোগাযোগ করলেন নতুন দিল্লির ৫ রেস কোর্স রোড–এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর বাসভবনের সঙ্গে। যদিও তাঁদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেউই বিশেষ অবগত ছিলেন না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই খবরটা চারিদিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে যে, দিল্লি তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেটের দু'নম্বর সদস্য ভি আর নেদুনচেরিয়ান–কে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। মন্ত্রী পরিষদ এবং রাজ্য বিধানসভার অনেক সদস্য ততক্ষণে পৌছে গেছেন এম জি আর বাসভবনে। ঠিক ৭টা ৪৫ মিনিটে নেদুনচেরিয়ান–এর নেতৃত্ব পুরনো ক্যাবিনেট–এর কোনরকম দলবদল ছাড়াই নতুন মন্ত্রীসভা রাজভবনে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

দীর্ঘ অসুস্থতা সত্ত্বেও এম জি আরও কিন্তু তাঁর উত্তরাধীকারী সম্পর্কে কখনও কোনরকম স্পষ্ট ঘোষণা করেন নি। এক সময় তিনি যখন চিত্রজগতে তাঁর বহুদিনের সহযোগী নায়িকা জয়ললিতাকে রাজনীতির আসরে নিয়ে আসেন তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে তিনি তাঁকেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৈরি করতে চান। কিন্তু প্রবীণ এ ডি এম কে সদস্যরা জয়ললিতার এই হঠাৎ রাজনৈতিক প্রভাব মেনে নেন নি। তখন থেকেই এ ডি এম কে সদস্যদের মধ্যে একটা বিরোধী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এম জি আর–এর জীবিতকালে কেউই প্রকাশ্য বিরোধীতায় নামতে সাহস পাননি। এম জি আর–এর মৃত্যুর পর ৩১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নে এ ডি এম কে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় প্রকাশ্যেই। একদিকে এম জি আর–পত্নী জানকী আর এম বিরপ্পন সহ বেশ কিছু মন্ত্রীর সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করেন। অপরদিকে এগিয়ে আসেন তামিলনাড়ুর খাদ্যমন্ত্রী এস রামচন্দ্রনের অনুগামী এ ডি এম কে সদস্যদের সমর্থনে জয়ললিতা। শুরু হয় এম এল এ ভাঙানোর খেলা। অবশেষে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২ জানুয়ারী ১৯৮৮–তে রাজ্যপাল এস খল খুরানা ভি এন জানকির পক্ষে ১৩১ সদস্য বিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভার ৯৭ জন সদস্যের সমর্থন মেনে নিয়ে তাঁকেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন।

অবশ্য রাজ্যপালের এই ঘোষণার সঙ্গেই কিন্তু ক্ষমতাদখলের এই লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। এম জি রামচন্দ্রনের মৃত্যুর পর দুই নারীর দ্বন্দ্ব এখন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে।

বেশী ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। ১৯৭৪–এ কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীতে এ ডি এম কে এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আঁতাত জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

১৯৭৬ সালে রাজন হত্যা ও অন্যান্য অভিযোগে কেন্দ্র করুণানিধি সরকারকে খারিজ করে দেন। ১৯৭৭–এর লোকসভা নির্বাচনে এ ডি এম কে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে নির্বাচন লড়ে এবং প্রবল ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া সত্ত্বেও বিপুলভাবে জয়ী হয়। পরে এই আঁতাত ভেঙে গেলেও বিধানসভা নির্বাচনে তারা ২৬৪টি আসনের মধ্যে ১৩০টি আসনে জয়লাভ করে এবং এম জি আর–এর নেতৃত্বে প্রথম এ ডি এম কে সরকার গঠিত হয়। ১৯৮০–র মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে এ ডি এম কে জনতা পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে এবং এই প্রথম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। রাজ্যের ৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি আসনে তারা জয়ী হয়। ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার পর জনসমর্থন হারানোর অভিযোগে এম জি আর সরকারকে বরখাস্ত করেন। এম জি আর অভিযোগ করেন যে কেন্দ্র তাঁর প্রতি অবিচার করেছে। জনগণের সহানুভূতি তাঁর পক্ষে যায় এবং তিনি আবার জনসমর্থন নিয়ে বিধানসভায় ফিরে আসেন।

এ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। এম জি আর এবং এ ডি এম কে–র ভীত তামিলনাড়ুর মাটিতে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ বিপর্যয়। এম জি আর হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। ১৯৮৪–র ৫ অকটোবর তাঁকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল। আরও অবনতি হওয়ায় ৫ নভেম্বর তাঁকে এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি বিশেষ বিমানে নিউইয়র্ক নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর হৃদযন্ত্র বদল করা হয়। এবং তিনি মোটামুটি হাঁটা চলার উপযোগী হয়ে ওঠেন।

এরই মাঝে ঘোষিত হয় নির্বাচন। এম জি আর হাসপাতালের শয্যা থেকেই মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় বিরোধী–পক্ষ যখন তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন এ ডি এম কে–র কর্মকর্তারা এম জি আর–এর ভিডিও ফিল্ম তৈরী করে বিভিন্ন জায়গায় তা প্রদর্শন করেন। আপামর জনগণের সহানুভূতি তাঁর উপর বর্ষিত হয়। যার ফলস্বরূপ এ ডি এম কে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের আঁতাত আবার অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে। এবার এ ডি এম কে ১৩৩টি আসনে জয়ী হয়। ইন্দিরা কংগ্রেস পায় ৬২ টি আসন। আর ডি এম কে মাত্র ২২টি আসনে জয়লাভ করে। এম জি আর ৪ ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ আসেন এবং ১০ ফেব্রুয়ারী পর পর তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে তিনি বিভিন্ন জনসভায় অংশ নিতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্ভবত এই ধকল সহ্য করার উপযোগী ছিল না। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ভোর তিনটের সময় তিনি আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত এক দশক ধরে এম জি আর তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর পর্বত প্রমাণ ব্যক্তিত্বের সামনে বিরোধী পক্ষ এবং বিক্ষুব্ধ এ ডি এম কে সদস্যদের যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফলে যায়। তাঁর দশ বছরের এই শাসনকালে তামিলনাড়ু ছিল রাজনৈতিকভাবে বেশ শান্ত। একটা সার্বিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল রাজ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। যার কৃতিত্ব অনেকটাই এম জি আর–এর। অবশ্য সত্যিকারের 'রামরাজ্য' বলতে যা বোঝায়, এম জি আর–এর তামিলনাড়ু কিন্তু কখনই তা ছিল না। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সরকারী সংস্থায় অচলাবস্থা–এধরনের বিভিন্ন অভিযোগে এম জি আরের সরকার বিভিন্ন সময় বহুবার অভিযুক্ত হয়েছে। দশ বছর আগে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে রাজ্য ছিল তৃতীয় স্থানে, আজ সেই তামিলনাড়ুর স্থান নেমে এসেছে ছ'নম্বরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এম জি আর–এর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি এতটুকু কলুষিত হয় নি। তামিল জনগোষ্ঠীর কাছে আজও তিনি 'পুনামনা চেনিল' (সোনার হৃদয় সম্পন্ন মানুষ)। ◉

৬৬ পৃষ্ঠার পর

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। দিল্লির মসনদে তখন ক্রমান্বয়ে হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর দীপ্যমান। ঠিক সেই সময়ে কামতাবেহার রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন পরাক্রমশালী শিববংশীয় রাজা মল্লদেব বা নরনারায়ণ। ১৫৩৩ থেকে ১৫৮৭ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে কামতাবেহার রাজ্যের সীমানা দাঁড়িয়েছিল পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশের সীমানা থেকে পশ্চিমে মিথিলার সীমানা পর্যন্ত। উত্তরে তিব্বত সীমান্ত থেকে দক্ষিণে মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত।

সেই সমসাময়িকতায় বর্তমান আসামের নওগাঁ জেলার বরভোয়া গ্রামে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীমন্ত শংকরদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কুসুমবর ভুঁইয়া। এই মহাপুরুষ আনুমানিক ২০ বছর বয়স থেকে গোটা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। দিল্লির মসনদে তখন ক্রমান্বয়ে হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর দীপ্যমান। ঠিক সেই সময়ে কামতাবেহার রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন পরাক্রমশালী শিববংশীয় রাজা মল্লদেব বা নরনারায়ণ।

সত্ত্বাধিকারী ফটিক হাজারিকা

মন্দিরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত

আসামে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার শুরু করেন। তাঁর 'এক শরণ হরিমান ধর্ম' এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল–'তপজপ যাগযজ্ঞ সবে বিড়ম্বন/কেবল ভক্তিতুষ্ট হোন্ত ভগবান।'

গোটা আসামে যখন শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে, কৃষ্ণনামের বন্যায় যখন নড়ে উঠল শক্তিধর্মের ভিত, তখন অনিবার্যভাবেই শুরু হল ধর্মীয় সংঘাত।

রক্ষণশীল বেদপন্থীরা কামতাবেহার রাজ্যের মহারাজ নরনারায়ণের দরবারে অভিযোগ আনলেন শংকরদেবের ধর্মীয় অপকীর্তির। রাজার আদেশে শিষ্য মাধবদেব সহ শংকরদেবকে বেঁধে আনা হল এবং নিক্ষেপ করা হল কারাগারে। কিন্তু বিচক্ষণ মহারাজ অল্প দিনেই বুঝতে পারলেন

বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাটক অভিনয়ের নজির হিসেবে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর দিনটি স্বীকৃত। একটি বিদেশি লেখার অনুবাদ সেদিন মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু এই বাংলার বুকেই এই ঘটনার আড়াইশ বছর আগে অভিনীত হয়েছিল, বাংলা নাটক।

শ্রীমন্ত শংকরদেব যথার্থই একজন মহাপুরুষ। তাই শংকরদেবের কাছে তাঁর কৃতকর্মের ধৃষ্টতা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি। বর্তমান কোচবিহার শহর থেকে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠল শ্রীমন্ত শংকরদেবের মঠ।

এই সময় বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশের রংপুরে শংকরদেবের ধর্ম মতের প্রভূত প্রসারলাভ ঘটে। আর এই প্রসারের পেছনে ছিল মহারাজ নরনারায়ণের বিশিষ্ট ভূমিকা।

ধর্মপ্রচার ছাড়াও শংকরদেব নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর লেখা ধর্মগ্রন্থ এবং নাটকের সংখ্যা চল্লিশটির উপর। উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ নরনারায়ণের আসাম রাজকে লেখা তাঁর চিঠিটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু শংকরদেব সৃষ্ট তৎকালীন কামতাবেহারে মঞ্চাভিনয় আজকের বাংলার সীমারেখায় প্রথম নাট্যাভিনয় হিসেবে অবশ্যই নির্দেশ করা চলে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাটক অভিনয়ের নজির হিসেবে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর দিনটি স্বীকৃত। একটি বিদেশি লেখার অনুবাদ সেদিন মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু এই বাংলার বুকেই এই ঘটনার আড়াইশ বছর আগে অভিনীত হয়েছিল বাংলা নাটক।

বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবর্তক, বাংলা মঞ্চাভিনয়ের পথিকৃত শ্রীমন্ত শংকরদেব ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মধুপুর আবাসেই দেহত্যাগ করেন।

সেই ষোড়শ শতাব্দিতে মন্দিরের যে গঠন ছিল, তা রাজবংশের বিভিন্ন মহারাজের তত্ত্বাবধানে

ক্রমশ উন্নয়নমুখী হতে থাকে। কোচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ, আসাম সরকার ও অসমীয়া ভক্তদের আর্থিক সাহায্য তথা ব্যবস্থাপনায় ১৯৬৪ খৃঃ বর্তমানের মন্দিরটির রূপায়ণ ঘটে। অসমীয়া ও রাজবংশদের পবিত্র তীর্থভূমি মধুপুর ধামের মূল মন্দিরটির উচ্চতা ১৩৫ ফুট। বৃহদাকার এই মন্দিরটির মধ্যে রাধাবিহীন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ও আলাদা করে শংকরদেবের প্রতিকৃতি রাখা আছে। তাছাড়া শংকরদেবের ব্যবহৃত বহু দ্রব্যাদিও এখানে সংরক্ষিত আছে।

মোট ১৬ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মধুপুর ধামটি উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। মূল মন্দির ছাড়াও আছে

জেলা কংগ্রেস (ই) সভাপতি প্রসেনজিত বর্মন

মোট ১০টি ঘর। তার মধ্যে ৬টিতে যাত্রী নিবাস। ৫০০ লোক থাকার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে বলে সত্ত্বাধিকারী জানিয়েছেন। সত্ত্বাধিকারী আরও জানান ভারতে শতাধিক শংকরদেবের মন্দিরের মধ্যে মধুপুর ধাম শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান ধাম।

এবারে ফিরে আসি সেইসব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে, যেসব প্রশ্ন এই ভূখণ্ডের জনসাধারণের মনে এনে দিয়েছে ভীতি। কেন পূর্বাঞ্চলের বৈষ্ণবতীর্থ মধুপুর ধামের নামে আতংকগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? কেনই বা উত্তরবঙ্গের সনাতন সংস্কৃতির চর্চা স্নায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর?

আসামের বর্তমান সরকার মূলত বাঙালি বিতাড়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শাসনক্ষমতা কায়েম করেছে। ফলে অসমীয়া সমাজের প্রতি এ রাজ্যের বাঙালিদের ধারণা মোটেই সুখকর নয়। ঐতিহাসিক কারণেই শংকরদেবের মন্দির আসামের তীর্থভূমি পরিণত হওয়ায় ব্যাপক অসমীয়া জনগণের উপস্থিতি বিভিন্ন উৎসবে ঘটে। অধিকন্তু উত্তরবঙ্গেও ইতিমধ্যেই কামতাপুরের দাবি উঠেছে। কামতাবেহার রাজ্যের স্মৃতি-বিজড়িত ভূখণ্ডকে 'কামতাপুর রাজ্য' বলে স্বীকৃতির দাবিও রীতিমত জোরদার হয়ে উঠেছে 'উত্তরখণ্ড' দলের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, এই ভূখণ্ডে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতিও

মন্দির সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ অবশ্য স্পষ্টই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, 'আসাম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তর মন্দির পরিদর্শন মোটেই কোন সন্দেহজনক ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। কারণ তিনি আমাদের জানিয়েই এসেছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আসেননি। এবং প্রশাসনিক দিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল।' উত্তরখণ্ডীরা ওই মন্দিরের ইমেজকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে কমলবাবুর জানা নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গোটা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছে কংগ্রেস দল। উত্তরখণ্ড দলকেও কংগ্রেসরাই মদত দিচ্ছে, প্রফুল্ল মহন্ত নয়।

তীব্র কটাক্ষ ফেলেছে 'কামতাপুরী'রা। এবং তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে কামতাপুরবাসী হিন্দু-মুসলমানরা বাঙালি নয়, কামতাপুরী। আবার এই বক্তব্যেরই অবিকল প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিবেদকের কাছে সত্ত্বাধিকারী ফটিক হাজারিকার বক্তব্যে। তাঁর মতে রাজবংশীরা বাঙালিও নয়, আবার অসমীয়াও নয়। তারা কামতাপুরী। স্বভাবতই শংকরদেবের মন্দিরকে কেন্দ্র করে অসমীয়া রাজবংশী সম্প্রীতি অনেককে সন্দেহ-প্রবণ করে তুলেছে।

এছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানী আন্দোলন স্বর্ণ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যেভাবে সন্ত্রাসের চরম শীর্ষে বিচরণ করছে, সে অভিজ্ঞতার নিরিখে
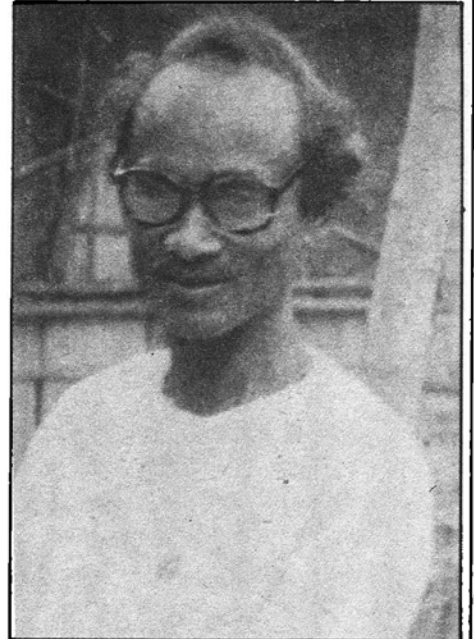
উত্তরখণ্ড নেতা প্রভাস শাস্ত্রী

মধুপুর ধামের ক্রমিক সমৃদ্ধি যে সন্দেহজনক হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

মন্দির সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ অবশ্য স্পষ্টই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, 'আসাম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহন্তর মন্দির পরিদর্শন মোটেই কোন সন্দেহজনক ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। কারণ তিনি আমাদের জানিয়েই এসেছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আসেননি। এবং প্রশাসনিক দিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল।' উত্তরখণ্ডীরা ওই মন্দিরের ইমেজকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে কমলবাবুর জানা নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গোটা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছে কংগ্রেস দল। উত্তরখণ্ড দলকেও কংগ্রেসরাই মদত দিচ্ছে, প্রফুল্ল মোহন্ত নয়।

প্রফুল্ল মোহন্তর মন্দির পরিদর্শন ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য, কোচবিহার জেলা কংগ্রেস

সভাপতি ও মধুপুর সত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য প্রসেনজিৎ বর্মন জানান, ভক্ত হিসেবেই আসামের মন্ত্রীরা মধুপুরে আসেন। প্রফুল্ল মোহন্তও এসেছিলেন মূলত শংকরদেবের ভক্ত হিসেবেই। এর আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীও বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। মহেন্দ্র-বাবুও মন্দিরের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, এবং তা ভক্ত হিসেবেই।

তাছাড়া আসাম রাজনীতিতে শংকরদেব একটি ইমোশনাল ফ্যাক্টর। কারণ আসাম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শংকরপন্থায় শ্রদ্ধাশীল। কাজেই রাজনীতিসচেতন লোকেরা এই ইমোশানকে কাজে লাগাতে ছুটে আসবেনই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে বহু আবেদন করা সত্ত্বেও কোনরকম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে সত্ত্বাধিকারী জানিয়েছেন। এই মন্দিরের উন্নতির জন্য তিনি আসামবাসী, আসাম সরকার এবং রাজবংশীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মধুপুর সত্রে শ্রী পঞ্চমী থেকে এগারো দিন ব্যাপী উৎসবকে তিনি মূলত রাজবংশী উৎসব বলে উল্লেখ করেন। এই উৎসবে আসাম ভক্তরা কদাচিৎ যোগ দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন আনুমানিক পাঁচ দশ হাজার ভক্তের সমাগমে এগারো দিন ধরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় মধুপুর ধামে।

শংকরদেবের ইমেজকে উত্তরখণ্ডীরা ব্যবহার করছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে প্রসেনজিৎ বাবুর বক্তব্য, 'কোন বিভেদপন্থী দল যদি এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয় তবে তা আমরা কোনমতেই সার্থক হতে দেব না। এবং এই বিভেদপন্থীদেরই একটা অংশ রাজবংশীরা বাঙালি নয় বলে যে প্রচার চালাচ্ছে, এখানেও আমি একমত নই। আমি মনে করি, রাজবংশীরা ষোলআনাই বাঙালি। এবং কামতাপুরী ভাষা বাংলা ভাষারই একটা আঞ্চলিক রূপ।'

উত্তরখণ্ড দলের শপথগ্রহণ

রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব প্রসেনজিতবাবু রাজবংশীদের বাঙালি বলে অভিমত দিলেও ইতিহাস সচেতন অনেক রাজবংশীই কিন্তু নিজেদের বাঙালি বলে ভাবতে চান না। এবং এই সুরে সুর মিলিয়েছে 'উত্তরখণ্ড দল' প্রভাবিত কতিপয় স্থানীয় মুসলমানও। শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যেও দেখা গেছে 'অবাঙালি সংক্রামণ' অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে ইদানিং। এবং তা বাড়ছে কোন ইতিহাস-আপেক্ষিক সূত্র ধরে নয়। তথাকথিত কিছু ছুৎমার্গী বাঙালির অবজ্ঞাজনক আচরণে।

যেভাবেই হোক না কেন, সমস্যা জর্জরিত এই মাটিতে অবাঙালি বোধ যতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, ততই বাড়বে উত্তরখণ্ড দলের সুবিধাগুলি। সেদিক থেকে শংকরদেবের মন্দির উত্তরখণ্ড দলের সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য উত্তরখণ্ড দলের সঙ্গে শংকরদেবের মন্দিরের রাজনৈতিক যোগাযোগের কোন প্রামাণ্য তথ্য প্রতিবেদক খুঁজে পায়নি।

তবে ধর্মীয় গোঁড়ামীকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করায় উত্তরখণ্ড দল একান্ত বিশ্বাসী। দলের খ্যাতিমান নেতা প্রভাস শাস্ত্রী নিজেই একজন তন্ত্র সাধক। তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন ক্রিয়া কৌশলের মধ্য দিয়ে নাকি কেটেছে তাঁর জীবনের অনেকটা সময়। এখনও রাজনীতির ফাঁক ফোকরে জবাফুল সাজিয়ে চলে তাঁর তান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাছাড়া উত্তরখণ্ড দলের সদস্যভুক্তির পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যযুগীয় ব্যাপার স্যাপার অনায়াসেই মনে করিয়ে দেবে বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে। হিন্দুদের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে মন্দিরে, মুসলমান-দের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে মসজিদে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। উপবাসী স্নানসিক্ত শপথগ্রহণকারীরা উপস্থিত হয়ে শাণিত অস্ত্রে ডানহাতের অনামিকা কেটে কপালে রক্ততিলক ধারণ করে কোরাণ বা গীতা ছুঁয়ে কামতাপুরের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করার শপথ নিয়ে থাকেন।

উত্তরখণ্ড দলের এইসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উগ্রতার জন্য এবং বেশ কিছু নেতা ভক্ত হিসেবে শংকরদেবের মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার শংকরদেবের মন্দির সম্বন্ধে অনেকেই যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে পড়েছেন ইদানিং।

ধর্মীয় গোঁড়ামীকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করায় উত্তরখণ্ড দল একান্ত বিশ্বাসী। দলের খ্যাতিমান নেতা প্রভাস শাস্ত্রী নিজেই একজন তন্ত্র সাধক। তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন ক্রিয়া কৌশলের মধ্য দিয়ে নাকি কেটেছে তাঁর জীবনের অনেকটা সময়। এখনও রাজনীতির ফাঁক ফোকরে জবাফুল সাজিয়ে চলে তাঁর তান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাছাড়া উত্তরখণ্ড দলের সদস্যভুক্তির পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যযুগীয় ব্যাপার স্যাপার অনায়াসেই মনে করিয়ে দেবে বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে।

-মধুপুরধাম থেকে তাপস বসুনীয়া

Lic. NO. AD-212 ALOKPAAT
NO. U/AD-1 February 1988
86
RNI NO. 42171/86
Rs. 6.00 Per Copy